# অনীক

মার্চ ২০১৩ ❑ বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ৯
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী
যোগাযোগ : প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় : ১১, রাজা রামমোহন সরণী,কলকাতা ৭০০ ০০৯
মঙ্গল ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা
সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

## দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে

দীপুদা/রতন খাসনবিশ ৭
দীপংকর চক্রবর্তীকে মনে রেখে/সুদেষ্ণা চক্রবর্তী ১১
দীপংকর চক্রবর্তী— এক প্রবাহ/প্রণব দে ১৩
আমাদের দীপংকরদা/সুমিতা ১৪
দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে/নারায়ণ সরকার ১৬
দীপংকর চক্রবর্তী— 'পুনশ্চ' পর্বের প্রেক্ষিতে/সোমনাথ চক্রবর্তী ১৯
দীপংকরদাকে যেমন দেখেছি/সুকান্ত রাহা ২১
মৃত্যু-হীন প্রাণ/অপরেশ চট্টোপাধ্যায় ২৪
সাংবাদিকতার আলোকে দীপংকর চক্রবর্তী/সাবিত্রী প্রসাদ গুপ্ত ২৬
দীপংকর চক্রবর্তী, কান্দী ও আমরা/শুচিব্রত সেন ২৮
শিক্ষক দীপংকর চক্রবর্তী/শক্তিনাথ ঝা ২৯
স্যারের স্যার/প্রতাপ মিত্র ৩০
দীপংকরদা/অশোক দাশগুপ্ত ৩২
অন্য মনের মানুষ/সমর নাগ ৩৩
দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে/হিরণ্ময় ধর ৩৫
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিরলস যোদ্ধা/সন্তোষ রাণা ৩৬
আদ্যোপান্ত এক রাজনৈতিক চরিত্র/প্রশান্ত রায় ৩৭
কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে.../অসীম চট্টোপাধ্যায় ৩৯
মার্কসীয় তত্ত্বচর্চার বিশিষ্ট সূত্রধরকে মনে রেখে/অরিন্দম সেন ৪০
কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে/প্রদীপ সিংহ ঠাকুর ৪১
সময়ের প্রেক্ষিতে অপরিবর্তিত দীপংকরদা/অপরাজিতা মুখার্জী ৪৩
দীপংকরদার স্মরণে/অমিতাভ ভট্টাচার্য ৪৫
দীপঙ্কর/সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬
দীপংকরদা: চমৎকার এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবী/বার্নার্ড ডি'মেলো ৪৬
কাজটা ঠিক করোনি বস্/শুভেন্দু দাশগুপ্ত ৪৭
দীপংকরদা/গৌতম নাভলাখা ৪৭
দীপংকরদা বেঁচে থাকবেন/ নব দত্ত ৪৮
অধিকার আন্দোলন ও দীপংকরদা/অমিতদ্যুতি কুমার ৪৯
দীপংকরদাকে আরও বড় ফোরামে.../দেবাশিস ভট্টাচার্য ৫৩
দীপশিখা দীপংকর/অনিল আচার্য ৫৬
একজন দীপংকর চক্রবর্তী/তিমির বসু ৫৭
দীপংকর চক্রবর্তী/সুভাষ আয়কাত ৫৮
দীপংকরদা/সরোজকান্তি দাস ৫৮
দীপংকরদাকে স্মরণ করে/সন্দীপ দত্ত ৫৯
লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী/প্রেমাংশু দাশগুপ্ত ৬০
দীপংকরদা, ওয়াং হাই ও আমি/বাসুদেব ঘটক ৬৩
পিবিএস-এর স্থপতি দীপংকর চক্রবর্তী/শিবানী মুখার্জী ৬৪
অগ্রজ বন্ধু দীপংকর চক্রবর্তী/সব্যসাচী দেব ৬৫
প্রিয় অগ্রজ প্রিয় সম্পাদক/অমর মিত্র ৬৭
দীপংকর চক্রবর্তী : চল্লিশ বছরের চেনাজানা/সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯
দীপংকরদার অনীক/মীনাক্ষী সেন ৭১
অধার্মিক দীপুদা! /অরূপশংকর মৈত্র ৭২
দীপংকর চক্রবর্তী ঃ স্মরণে ও মননে/মনোহরমৌলি বিশ্বাস ৭৩
মৃত্যুও হার মানে/কুমার রাণা ৭৪
মানুষটা যাদুকর/মালবিকা মিত্র ৭৫
ঝড়ের পাখি/পার্থ সারথি ৭৬
তাঁর কথা বারবার মনে পড়বে/বিশ্বজিত সেন ৭৮
ব্যক্তির ভূমিকা ও দীপংকরদা/বিশ্বজিৎ রায় ৭৯
মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা.../গিয়াসুদ্দিন ৮২
অনীক তো কোন রাজনৈতিক দল নয়.../অরূপ মুখোপাধ্যায় ৮৪
দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে/বদরুদ্দীন উমর ৮৭
বাংলাদেশের বন্ধুরা আপনাকে মনে রাখবে/ওমর তারেক চৌধুরী ৮৮
দীপংকরদার কথা/আনু মুহাম্মদ ৯১
আমার আজীবন বন্ধু— মরণের পরেও প্রেরণা/মীরা চক্রবর্তী ৯২

## শোকবার্তা ৬, ১৮

মহাশ্বেতা দেবী/অশোক মিত্র/শঙ্খ ঘোষ/সুনন্দ সান্যাল

## পত্রপত্রিকা থেকে

The unsung revolutionary/Sunanda K Datta-Ray ১০০

## কবিতা

শ্রমণ ভাই দীপংকর চক্রবর্তীর প্রয়াণে/তরুণ সান্যাল ৩
দীপঙ্করদা স্মরণে/অচিন্ত্য সুরাল ৩
ব্যূহ/সুমন রায় ৩
নতুন সূর্যের আহ্বান/সৃজন সেন ৪
মানুয়েরই গান/মৃণ্ময় চক্রবর্তী ৫
আরও একজন মানুষ/বিপুল চক্রবর্তী ৫
আর দেখব না/তাপস চক্রবর্তী ৫

## দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা

মাও সে তুঙের কবিতা (অনুবাদ) ৯৫
শেষ ভাষণ ৯৬
ভারতের সিকিম গ্রাস ৯৯
ঝড় আসছে! ১০১
'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে ১০৪
বর্গের লড়াই বনাম বর্ণের লড়াই ১০৯
কৃষ্ণনাথ কলেজ : স্মৃতিতে মননে, চেতনায় ১১৩
অনীক-এ প্রকাশিত লেখার তালিকা ১১৮

প্রচ্ছদ : মিন্টু দত্ত

**সম্পাদকীয়**

# দীপংকর চক্রবর্তী ও সমসময়

দীপংকর চক্রবর্তী চলে গেছেন। পেছনে রেখে গেছেন এক দীর্ঘ ইতিহাস। যে ইতিহাস পশ্চিমবাংলার গত পঞ্চাশ বছরের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে, ফলিত মার্কসবাদের তাত্ত্বিক চর্চার সঙ্গে, লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে, নানা ধরনের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও বিশেষ করে অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সংহতি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুধু সম্পৃক্তই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে বাদ দিয়ে এই আন্দোলনগুলির ইতিহাস একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকবে। দীপংকর চক্রবর্তীর জীবনালেখ্য তাই পশ্চিমবঙ্গের গত পঞ্চাশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলনের, অধিকার আন্দোলনের, বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ও চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস।

আমাদের বর্তমান সংখ্যাটি তাই দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণ সংখ্যা। এটি অনীক-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের প্রতি, পাঁচ দশক ধরে অনীক-এর প্রাণপুরুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলীই শুধু নয়, দীপংকর চক্রবর্তীর বিভিন্ন দিকের আলোচনার প্রতি, ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন।

এই দুরূহ কাজটি আমরা কতটা সম্পন্ন করতে পারলাম  তা বলবেন পাঠক, বলবে ভাবীকাল। কিন্তু এই কাজে আমরা সবার কাছে যে সাড়া পেয়েছি, যে সহযোগিতা পেয়েছি তা আমাদের অভিভূত করেছে।

বর্তমান সংখ্যাটিতে আমরা চেয়েছিলাম দীপংকরদার রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটা লেখচিত্র তুলে ধরার সাথে সাথে সমসময়ের চোখে তাঁর বিশ্লেষণ তুলে ধরতে। পাশাপাশি দীপংকরদার যে বিভিন্ন ধরনের লেখা আছে তার একটা প্রতিনিধিত্বকারী সংকলন তুলে ধরতে।

এমন সংখ্যা প্রকাশের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যাশিত এবং প্রতিশ্রুত লেখার অপ্রতুলতা। আমাদের ক্ষেত্রে চিত্রটা হয়েছে ঠিক এর বিপরীত। লেখক-পাঠকদের কাছ থেকে এই কাজে আমরা যে অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি তাতে সব লেখা প্রকাশ করতে গেলে আড়াইশো পাতার একটি সংখ্যা করতে হয়। বাস্তব অসুবিধার কারণে সেটা সম্ভব নয়।

ফলে আমাদের পূর্ব-পরিকল্পনাকে খানিক ছাঁটকাট করতে হলো। কিছু লেখা স্থানাভাবে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। লেখক এবং পাঠকরা আমাদের এই অপারগতা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় আমরা এগুলি প্রকাশ করবো। পাশাপাশি, দীপংকরদার বিভিন্ন ধরনের লেখার প্রতিনিধিত্বমূলক যেসব নিবন্ধ আমরা প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করবো ভেবেছিলাম, তারও অনেকগুলিই একই কারণে এই সংখ্যায় বাদ দিতে হলো। বাদ পড়লো তাঁর লেখা গল্প-নাটক। তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের পুনর্মুদ্রন। তবে তাঁর শেষ ভাষণ আমরা প্রকাশ করেছি, যার বিষয়বস্তু মার্কসবাদ ও ভারতে বামপন্থা। দীপংকরদার গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলিও আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে পুনর্মুদ্রণ করবো বলে স্থির করেছি।

লেখাগুলি সাজানোর ক্রম নিয়েও আমাদের চিন্তা ছিল যাতে ওঁর জীবনের বিভিন্ন সময়কাল, বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মগুলি এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণগুলিকে পরপর আনা যায়। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। মানুষ, বিশেষ করে আমাদের কাছের মানুষরা তো বহুমাত্রিক। তাই কোথাও লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদক লিখেছেন 'বিপ্লবের গান' নিয়ে, কোথাও বহরমপুরের অনীক কর্মী লিখেছেন বহরমপুরে তাঁর বিবিধ কাজকর্ম নিয়ে। সব মিলিয়ে কিন্তু দীপংকরদাকে, তাঁর বহুমাত্রিকতাকে, তাঁর মতাদর্শগত দৃঢ়তাকে, তাঁর গভীর গণতান্ত্রিক বোধকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁদের লেখায়। এঁদের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

অনেক বন্ধু শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় শোকসভা হয়েছে। অনেক পত্রিকায় তাঁর স্মরণে লেখা বেরিয়েছে: ফ্রন্টিয়ার, ইপিডব্লু, মেইনস্ট্রিম, আজকের দেশব্রতী, অ্যানালিটিক্যাল মান্থলি রিভিউ, এমআরজিন, সংবাদ মন্থন, দেশকাল ভাবনা ইত্যাদি। শোকসংবাদ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা: আজকাল, গণশক্তি, এই সময়, একদিন, দি স্টেট্‌সম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা। এগুলি সংকলনের ভাবনা ছিল আমাদের, স্থানাভাবে পারলাম না।

এর চেয়েও বড় কথা, এই একমাসে দেশে, বিশ্বে ঘটে গেছে অনেকগুলি বড় বড় ঘটনা। বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়ায় জামাত-এর তাণ্ডব। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এক প্রধান নায়ক, উগো চ্যাভেজের জীবনাবসান ঘটেছে, ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে আফজল গুরুকে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর লেখা তৈরি করেও তা আমরা এ সংখ্যায় দিতে পারলাম না। পরবর্তী সংখ্যায় এগুলি প্রকাশ করা হবে।

দীপংকরদা নেই। কিন্তু অনীক-এর অঙ্গীকার, দুঃসাধ্য হলেও *অনীক* তার আরব্ধ কাজ করে যাবে বন্ধুদের সাথে নিয়ে।

লেখকদের কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে প্রেসের বন্ধুদের। শুধু আমাদের নিয়মিত মুদ্রক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স ইন্ডিয়া ও অপ্রতিমা প্রেসের বন্ধুদেরও। এঁদের ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে এই সংখ্যা বার করা কোনোমতেই সম্ভবপর ছিল না।

## শ্রমণ ভাই দীপংকর চক্রবর্তীর প্রয়াণে

**তরুণ সান্যাল**

জন্মভূমি-মাতৃভাষা অবশ্য বিধাতা, কুরুসভায় যেন কুন্তী মাতা,
কিন্তু যা পঠনে-বিশ্বগঠনে বা মানবভুবনে দেখতে হয়—
নদী-সমুদ্রের-খনি গোপনের ক্ষুদ্র মানুষের প্রীতি পরিত্রাতা—
'যুক্ত করো', 'বন্ধ মুক্ত করো', রবীন্দ্রনাথের যা মৃত্যুরও সঞ্চয়।

যা গড়ছিলে জনারণ্যে বৃক্ষ যূথ, মাটির শিবিরে যা প্রবীণ,
চাষী লাঙলের ঢঙে, বহু কৃষকের সঙ্গে শ্রমবিশ্বে,
শ্রমণ
সে-ই বুদ্ধ, সে-ই ধর্ম, সে-ই সংঘ, সে-ই অবতার-খ্রিষ্ট-জিন,
দূর আলোকবর্ষ বর্ষে, তবু করেছো তত্ত্বে সত্যে মানস ভ্রমণ।

সংঘর্ষে সংগ্রামে চলে জীবনের দ্বন্দ্ব ছন্দে বন্ধুতা বন্ধন
ভাই রে, তুই কনিষ্ঠ তো, জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃত্যু শুনে,
ভাবতে থাকি অনীকিনী রথরথী, শ্রেণীযুদ্ধে নেই মধুসূদন,
পাণ্ডবের পাঁচটি ব্যূহ, জতুগৃহ, পরিবর্তনের আঁচে, ছাই নাচে আগুনে।

জানি আছে পাশুপত, দীপঙ্কর, মেধাস্থলে জবা কুসুমে রক্তিম উৎসব,
দেখতে চাই পতাকায় পতাকায় রণচণ্ডী, আনন্দ-বিপ্লব।।

৭/৩/২০১৩

## ব্যূহ

**সুমন রায়**

তোমার স্পর্ধা আর সাহসে ভর করে
শীত-রোদ-বর্ষায় আমরা কখনো
মিছিলে ভাঙ্গিনি বরং স্ট্যাকাটো শব্দ
আর মুখর স্লোগান হাত গ্রেনেডের উপমায়
উড়ে গিয়ে নানা রং স্তাবক যাজক শাসকের
তেল চকচকে মুখে আগুন ধরেছি রোজদিন
তোমার খবর পেয়ে অসুখী কলোনী মোড়
উপোস রোজার পর ভাত চড়িয়েছে, আলোচাল
ছন্ন বিকেল জুড়ে সেই গন্ধ অপার
'নো পাসারণ!' তোমার চিৎকার শুনে
হিংস্র অক্ষৌহিণী জমি ধরে নিয়ে বেসামাল
ব্যূহ অক্ষত, এসো কাল সন্ধ্যায় অনীক মিটিং...

## দীপঙ্করদা স্মরণে

**অচিন্ত্য সুরাল**

গামছায় হাত মুছতে মুছতে যে চাকর সে বলল,
একটু আগেই বজ্জাত মনিবটাকে ছাড়িয়ে দিলাম।
হাতুড়িটা নামিয়ে রাস্তায় একদলা থুতু ফেলে শ্রমিক বলল,
হারামি মালিকটাকে ছাঁটাই করে আসতে গিয়ে
একটু দেরি হয়ে গেল। একটা বিড়ি ধরিয়ে
কোমরে কাস্তেগোঁজা বর্গাদার বলল,
যা চলছিল, শালা জোতদারকে না তাড়িয়ে পারলাম না।
ফাইলের পাতাগুলো টুকরো করে কেরানি বলল,
খচ্চর সাহেবকে শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করেই দিলাম হে।

যখন এইসব শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া চলছে
তখন সামনের মোড়ের পথসভায় মন্ত্রী মঞ্চে উঠতেই
একটা আপাদমস্তক মানুষ তাকে কলার ধরে টেনে
মাটিতে নিজের পাশে বসিয়ে দিল।
মানবাধিকার চেতনার এক অগ্রপথিক,
যে এতক্ষণ একটু তফাতে একটা টুলের উপর বসে
পত্রিকার প্রুফ দেখছিল আর এইসব শুনছিল—
সব কাগজ হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সে হঠাৎ স্লোগানের বদলে
গান গেয়ে উঠলো— 'ডিঙা ভাসাও সাগরে সাথি রে'....

অমনি উল্টোদিকের স্কুলে—
রাস্তার গোলমাল আর মাইকের জ্বালায়
যার দরজা-জানলা এতক্ষণ বন্ধ ছিল-
কে যেন ঘন্টা বাজিয়ে দিল আর
ছেলেমেয়ের দল ছুটি ছুটি বলে আকাশ কাঁপিয়ে
বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়; সুনামির মত তাদের উল্লাস
সমস্ত অনিয়ম আর বেনিয়মের ছুটি ঘোষণা করে দিল
মন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ মাইকে তখন শোনা যাচ্ছে
'জাগায়ে মাতন ঢেউয়ের নাচন মরণ বাঁচন একাকার'...

## নতুন সূর্যের আহ্বান

**সৃজন সেন**

স্মরণসভা মঞ্চের পশ্চাৎপট জুড়ে
কালো সমুদ্র
ডান কোণে অস্তমিত সূর্যের হলুদ রশ্মিচ্ছটা ছড়িয়ে
সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু
স্মরণসভায় সমবেত শোকস্নাত মানুষজনের দিকে
পেছন ফিরে
তুমি এগিয়ে চলেছ অস্তমিত সেই সূর্যের দিকে
— নিঃসঙ্গ, নীরব,
একটু পরেই, মনে হচ্ছিল, গভীর সমুদ্রে ডুব দেবে তুমি
হারিয়ে যাবে চিরকালের মত।

মঞ্চের ডান পাশে
ফুলের ভার বহন করে
গালে হাত দিয়ে বসে থাকা তোমার সেই ছবিটা।
পাশে একটি ডাণ্ডা, মাথায় একটি লাল কাপড় জড়িয়ে
স্মরণসভার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
কোন প্রতীক চিহ্ন না থাকার সেই লাল কাপড়টা যেন
লাল পতাকা হওয়ার গৌরব হারিয়ে
মাথা নীচু করে ঝিমুচ্ছিলো।

তোমার এই একাকিত্ব
অন্ধকার সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার তাড়না
আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না।
আমার সঙ্গে তোমার সে তর্কটার কোন মীমাংসা
না করে কোথায় চলে যাচ্ছ তুমি?
তুমি বলেছিলে : 'আমার এখন ওয়ান পয়েন্ট এজেন্ডা,
এদের হটাতেই হবে।
নইলে গোটা রাজ্যটা নন্দীগ্রাম হয়ে যাবে।'
আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম
নকশালবাড়ির বিপ্লবী পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষী সংগ্রামের
ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুষ্ট সেই আহ্বান—
'মন্ত্রী বদলে কিছু আসে যায় না।
প্রয়োজন...'
আমার কথাটা শেষ না করতে দিয়েই
তুমি বলে উঠেছিলে—
'বর্তমানের বাস্তবতায় ঐ মন্ত্রী বদলটাই
ভীষণ জরুরি।'
আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'বর্তমানটাই সব?
ভবিষ্যৎ-এর কোন ভাবনা নেই?'
জবাবে তুমি বলেছিলে : 'বর্তমানে এদের তো তাড়াই
তারপর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা করা যাবে।'
আমি বলেছিলাম : 'শাসকশ্রেণী ইতিহাসে কোন দিন
একরূপে শাসন করে না,
এক প্রয়োজনে যে হয় হিটলার, অন্য প্রয়োজনে সে হয়ে ওঠে
মাদার টেরেসা।'
তুমি আমাকে আশ্বস্ত করে বল্লে—
'মাদার যদি হিটলার হয়ে ওঠে
আবার আমরা লড়াইয়ের ময়দানে নামবো,
হয়তো অন্যরূপে, অন্যভাবে...'

স্মরণসভার মঞ্চের মাঝখানে সারিবদ্ধভাবে বসে থাকা
সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে
তোমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রীতিমাফিক
সবাইকে এক মিনিট উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করা হোল,
নিয়মমাফিক আমরাও উঠে দাঁড়ালাম,
(এক মিনিট যে কত দীর্ঘ হতে পারে
এ সময়েই একমাত্র তা উপলব্ধি করা যায়!)
মুখ্যসভাপতি আমাদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে
নিয়মমাফিক পঞ্চান্ন সেকেন্ড অতিক্রম হবার আগেই
এক মিনিটের নীরবতার সমাপ্তি ঘোষণা করে
আমাদের বসতে বললেন,
আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!

তারপর তোমার স্মৃতির উদ্দেশে ভাষণ
কেবল ভাষণ...

আমি ভাষণ শুনছিলাম
হাততালি দিচ্ছিলাম,
ভাষণ শুনছিলাম ...
এক সময় মঞ্চের পশ্চাৎপটে সমুদ্রাভিমুখী তোমার ছবিটার
দিকে তাকিয়ে
আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম—
আমি দেখলাম— তুমি ঘুরে দাঁড়িয়েছ!
তুমি শ্রোতা ও দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসছো!

কাস্তে হাতুড়ি চিহ্ন বর্জিত লাল পতাকাটাকে
ডান্ডা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
তুমি মাইকের সামনে এগিয়ে এলে!
তুমি যেন রাগে ফুঁসছো
মাইকের দণ্ডটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরলে তুমি,
তোমার সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে
সভাকে কাঁপিয়ে তুমি বলে উঠলে—
প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিহীন মায়াবী গণতন্ত্রের
আসুন, আমরা অন্তিম দিন ঘোষণা করি,
সম্পন্ন মানুষকে তুষ্ট করার এই গণতন্ত্রকে
দু'পায়ে মাড়িয়ে
মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ সংকল্প সাধনে
আসুন আমরা শুরু করি নতুন এক সূর্য অভিযান,
ডান দিকে হেলে নয়, 'বাম' দিকে হেলেও নয়।
সূর্যের দিকে চোখ রেখে
আসুন আমরা কদমে কদমে এগিয়ে যাই...'

চমক ভাঙ্গলো।
স্মরণসভার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন
মুখ্য সভাপতি,
ইন্টারন্যাশনাল গান শুরু হলো
আমরা উঠে দাঁড়ালাম,
মঞ্চের পেছনে নজর যেতেই দেখলাম—
সমুদ্রের দিকে অস্তমুখী সেই সূর্যটা
কখন যেন মাঝ আকাশে উঠে এসেছে—

এক নতুন দীপংকর সূর্য
আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

## মানুষেরই গান

**মৃণ্ময় চক্রবর্তী**

পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়
দিগন্ত ছোঁয়া গেলে
দিগন্ত উঁকি মারে ফের
খুঁজে নিই যত কিছু আলো ও হৃদয়
তাই, যতটুকু বিগত জন্মের।

## আরও একজন মানুষ

**বিপুল চক্রবর্তী**

পাহাড়ের সবশেষ চুড়োয় উঠে
একজন মানুষ
আকাশ ছুঁতে চায়
চেষ্টা করে, ভীষণ লাফায়
তবু পারে না

মানুষের মাঝখানে, এ মাটিতে দাঁড়িয়ে
আরও একজন মানুষ
আকাশ ছুঁয়ে থাকে
প্রতিদিন

## আর দেখব না

**তাপস চক্রবর্তী**

আর দেখব না সেই মানুষটিকে
আসলে দেখতে পাব না
মোটা ফ্রেমের পুরু কাচ
চশমার নিচে উজ্জ্বল চোখ
দৃঢ়প্রত্যয় ভারি কণ্ঠ।

প্রতিটি শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ
আমাকে ভাবায় ভাবে বহুজন
তোমাকে দেখেছি বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে
পড়ে যৌবনে 'বিপ্লবের গান'
ছুঁতে চেয়েছি ওয়াং হাই কে।

'পুনশ্চ' থেকে 'অনীক'-এর পথ
বিছানো ছিল না পাপড়িতে
৭২-র মৃত্যু উপত্যকা পেরিয়ে
নিরলস মানবাধিকার চর্চায় মগ্ন
বুকে ভয়হীন সমাজের স্বপ্ন

শ্রেণী সংগ্রামের ভরা চেতনার
শাণিত কলম দিয়েছ অনেক
ঘুমাও স্বপ্ন বুকে নিয়ে
জাগতে দাও অন্ধকার রাতে
পৌঁছাব রাত প্রভাতের গানে।

## মহাশ্বেতা দেবী-র শোক বার্তা

দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পর্ক কয়েক জন্মের। দীপংকর বহরমপুরের ছেলে - আমার ভাইয়ের সহপাঠী - অনীক - একশো-দুশো হিসেব ছাড়া কারণ। দীপংকর ভেবে দেখল না, ও না পারলে, ''আমাদের'' যাদের ও রেখে গেল, তারা বাঁচব কি করে?

আমি ওর ওপর রেগে গেছি।

রেগে গেছি, রেগে থাকব, এ রকম দীপংকুঁড়ে আচরণ কেউ করে? খেলা ভেঙে পালায় কেউ? রেগে যাচ্ছি ওর ওপর, আর খুঁজছি ওকে।

কী আর বলব!

তবু দীপংকর!

**মহাশ্বেতাদি**

## অশোক মিত্র-র শোক বার্তা

অপরাধ বোধ হয়। আমরা যারা বার্ধক্যের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছি, সমাজকে দেওয়ার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তারা টিকে থাকি। অথচ 'অনীক' পত্রিকা অর্দ্ধশতাব্দী ধরে যে মানুষটি অদম্য প্রতিজ্ঞায় ও আদর্শে দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিচালনা করে গেছেন, সেই দীপংকর চক্রবর্তীকে চলে যেতে হলো। এ সমস্ত উট্‌কো নিয়মকানুনের ওপর আমাদের হাত নেই, কিন্তু তা বলে অনুশোচনা থেমে থাকে না। দীপংকর চক্রবর্তী একেবারে তরুণ বয়স থেকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সে প্রজ্ঞাকে ব্যাপ্ততর স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন। অনেক রকম ব্যক্তিগত সংকট সামলাতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু লক্ষ্যে স্থির থেকে দশকের পর দশক এগিয়ে গেলেও তিনি বিশ্লিষ্ট হননি। নিজের মত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থেকেছেন। এখন যাঁরা আমাদের আবেগের সঙ্গে নেই, সেই অপরের মতামতগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে তাঁর দিক থেকে কোনও দিন অসুবিধা দেখা দেয়নি।

এই কারণে 'অনীক' অনেকদিন ধরে বেঁচে আছে, টিকে গেছে। আমরা যে অসমঞ্জস অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি, তা সহসা ফুরোবে না, ফুরোবার নয়। সেই লড়াই-এর অন্তর্স্থিত লক্ষ্য, আবেগ, গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণ নিয়ে আলোচনা বিশ্লেষণ-এর পরিসরও হঠাৎ উধাও হবে না। 'অনীক'-কে তাই টিকিয়ে রাখা, প্রসারিত রূপ দেওয়ার প্রয়োজন। এই একান্ত প্রিয়জনের তাগিদ মেটাতে সুহৃদজন, যাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, তাঁরা দীপংকর চক্রবর্তীর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও প্রতিজ্ঞাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণে রাখবেন, এটুকুই আমার বিনীত প্রার্থনা। ৭/২/২০১৩

## দীপংকর

**শঙ্খ ঘোষ**

বেশ ভারী রকমের একটা উদ্‌বেগের সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলছি এখন। আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং প্রাদেশিক— সমস্ত স্তরেই আমাদের আজ গ্রাস করছে ভয়াবহতা। এই সময়টায় কেবলই মনে পড়ে সেইসব অল্পসংখ্যক মানুষজনের কথা, যাঁরা তাঁদের চিন্তা দিয়ে কাজ দিয়ে এই ভয়ংকরের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধচেতনা জাগিয়ে রাখেন অনুক্ষণ, যাঁদের দিকে তাকালে এই নিরাশার মধ্যেই খানিকটা ভরসা জাগে মনে। সেইরকম একজন মানুষ ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আজ আমরা স্তব্ধ হয়ে আছি। একটা মফস্বল শহর থেকে যে-লড়াই তিনি শুরু করেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, যে লড়াইয়ের একটা মস্ত বড়ো হাতিয়ার ছিল তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের 'অনীক' নামে ক্ষুরধার পত্রিকাটি, অনেকরকম সময়বদলের পরেও অটুট এবং ধারাবাহিক থেকে গিয়েছিল তাঁর সেই লড়াই। কতজনের কতরকমের বদল হলো এর মধ্যে, কিন্তু দীপংকর স্থির রয়ে গেলেন তাঁর প্রত্যয়ে, বিশ্বাসী রয়ে গেলেন তাঁর কাজে, স্বচ্ছ রয়ে গেলেন তাঁর উচ্চারণে। ঠিক এই সময়টায় তাঁর এই চলে যাওয়া আমাদের সকলেরই পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক এক ক্ষতি, আমার পক্ষে তা এক ব্যক্তিগত ক্ষতিও বটে। তবু, তাঁর ভাবনা এবং কাজের অনুসৃতি নিশ্চয় চলতেই থাকবে ভবিষ্যতের দিকে, এই শোকাতুর মুহূর্তেও সেটুকুই আমরা আজ আশা করে থাকব।

**১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩**

# দীপুদা

রতন খাসনবিশ

দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৬৬ সালে। 'পুনশ্চ' 'অনীক' কিংবা বহরমপুর কেন্দ্রিক তাঁর তৎকালীন জীবনের বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য দিকগুলোর মতাদর্শগত কোনো কিছুই তখন আমি ছাড়তাম না। আমি করি ছাত্র রাজনীতি, প্রবল আগ্রহ সিপিআই বিরোধী কমিউনিস্ট আন্দোলনে। আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কে আমি তখন ঘোরতর সোভিয়েত বিরোধী। চীনা পার্টির ১৪ই জুনের চিঠি তো আছেই, প্রেসিডেন্সির ধাপিতে বসে আমার বন্ধু সঞ্জয় ক্ষেত্রী তখন আমায় এনভার হোজার লেখা শোনায়, আমি পকেট থেকে বের করি 'মহান সত্য, ধারালো হাতিয়ার'। আমরা জানি, সপ্তম কংগ্রেসের পর এদেশে কেন আর একটা সংশোধনবাদী পার্টিই তৈরি হয়েছে। আরও জানি, ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর যে 'সমাজতান্ত্রিক', এই কথাটাই বুঝছে না চীনপন্থী এবং বাম কমিউনিস্ট (পরে যা সিপিএম)-বিরোধী বিপ্লবীরা। বিপ্লবী পার্টি তৈরি করতে হবে, যে পার্টির এজেন্ডায় থাকবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

বিপ্লবী পার্টি তৈরি করার কাজে নেমে পেলাম মণিময় মুখোপাধ্যায়কে, যে মণিদা থাকেন শেয়ালদার কাছে একটা মেসবাড়িতে একটা অন্ধকার ঘরে, ভোলাদা যাঁর রুমমেট। জীবনযাপন চিত্তাকর্ষক। আহার নিদ্রা দুটোই তুচ্ছ। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে টেবিলে, বিছানায় গোল হয়ে বসে আমরা পড়ি 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', তর্ক করি 'এমপিরিও ক্রিটিসিজমে' ইথার তরঙ্গ সংক্রান্ত লেনিনের ধারণার সীমাবদ্ধতা নিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই, খাটের নীচে বিরক্ত ইঁদুরদের কিচিরমিচির। এই মেসবাড়িতেই একদা এক বিকেলে ঝকঝকে চেহারার এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। মণিদার বন্ধু, বহমরপুর কলেজে ইকনমিক্সের তরুণ অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী। আমার সহপাঠিনী মীরার সঙ্গে দীপুদার যে গভীর প্রণয়, সে খবর জানি না, দীপুদা যে কলকাতার সওদাগরি অফিসে একটা ভালো চাকরির অফার ছেড়ে মফঃস্বল কলেজের অধ্যাপনার জীবন বেছে নিয়েছেন বাম রাজনীতিতে যুক্ত থাকার তাগিদ থেকে, সে সবও জানি না। এসব খবর তখন তুচ্ছ। দরকারি যে কথাটা জানি তা হল মণিদার মতো করেই তিনি বিপ্লবী পার্টি গড়ার লড়াই-এ আমাদের সহযাত্রী। মেসবাড়ীর সেই ঘরেই জানলাম 'পুনশ্চ' গোষ্ঠীর কথা, জানলাম নাম রেজেস্ট্রি করতে গিয়ে 'পুনশ্চ'র বদলে এই গোষ্ঠীর পত্রিকার সরকারি অনুমোদন এসেছে 'অনীক' নামে। এক সংখ্যা 'পুনশ্চ' পেলাম, এক সংখ্যা 'অনীক'। শুনলাম এটা ত্রৈমাসিক পত্রিকা। নেড়ে চেড়ে বুঝলাম আমরা যে রাজনীতির কথা বলি, তার ছাপ আছে এর সর্বাঙ্গে। মেসবাড়ি থেকে বেড়িয়ে যখন হোস্টেলের পথ ধরেছি। তখন জানতাম না আমার জীবনের একটা লম্বা যাত্রা শুরু হয়ে গেছে এই 'অনীক' পত্রিকা আর দীপংকর চক্রবর্তীকে কেন্দ্র ক'রে।

আমাদের রাজনৈতিক চক্র বা গোষ্ঠীটি ছিলো গুপ্ত সমিতির আদলে গড়া। অর্থাৎ 'দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, কথা আমাদের চুপিচুপি', চার অধ্যায়ের ইন্দ্রনাথের মতো আমাদেরও এক নেতা ছিলেন। এ নেতার জোরেই জায়গাটা কিন্তু উচ্চশিক্ষা কিংবা বিলিতি পালিশ নয়, জোরের জায়গাটা ছিলো এই যে পেশায় তিনি ছিলেন মোটর মেকানিক অর্থাৎ শ্রমজীবী। সেটাই প্রত্যাশিত ছিলো সে সময়। ইন্দ্রনাথদের যুগ সেটা ছিলো না। যাই হোক, গুপ্ত সমিতির আদলে গড়া এই গোষ্ঠীটিতে সংগঠনের কোন্ স্তরে কে কী দায়িত্বে আছে জানার উপায় ছিলো না, জানার চেষ্টা করাটাও ছিলো গুরুতর অপরাধ। সুতরাং এই দলটিতে সে সময় দীপুদা কী করতেন, সংগঠনের কোন্ স্তরে তিনি যুক্ত ছিলেন, সে সব জানতাম না। আমি ছিলাম শুভব্রতর ক্যাডার, আমার সঙ্গী ছিলো সঞ্জয় ক্ষেত্রী। শুভ বেঁচে নেই। সঞ্জয় থাকে উত্তর আমেরিকায়। দলটির মধ্যে 'সংশোধনবাদ বিরোধ' লড়াই-এ 'প্রতিবিপ্লবীচক্রের পান্ডা' হিসেবে চিহ্নিত হন মণিদা। মণিদা কোথায় কীভাবে প্রতিবিপ্লব ঘটাচ্ছেন সেটা বুঝতে না পারায় আমার সদস্যপদ বাতিল হল। দীপুদার ভাগ্যে কী ঘটেছিল জানি না. যাই হোক, শুদ্ধিকরণের লড়াই-এর শেষে আমার ডাক পড়লো চক্রের নেতারা যেখানে অস্থায়ী কমিউন গড়ে থাকতেন, সেখানে। আমি সদস্যপদ ফিরে পেলাম, দায়িত্ব জুটলো কমিউনটির জন্য একটা প্রশস্ত আস্তানা খুঁজে দেবার। এক অরাজনৈতিক বন্ধুর যোগাযোগে পাতিপুকুরে একটা বাড়ির দোতলাটা ভাড়া পাওয়া গেল। কমিউন সেখানে স্থানান্তরিত হল। বলা বাহুল্য, আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির সেখানে স্থান হল না। শুধু সপ্তাহে একদিন স্টাডি ক্লাসের জন্য সেখানে আমার প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হল। এইখানেই একদিন দীপুদার সঙ্গে আমার দেখা। মণিদা-বর্জিত দীপুদা। কমরেড দীপুদা।

পাতিপুকুরের কমিউনে আহূত এক সভায় এই দলটির তরফ থেকে প্রদীপ বক্সীর নেতৃত্বে একটা তাত্ত্বিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমাকে এই টিমটায় স্থান দেওয়া হল। সঙ্গে থাকলেন দীপুদা আর আমার সহপাঠিনী সুমিতা। ঠিক

হলো এই তাত্ত্বিক কাগজটার নাম হবে 'পুবের হাওয়া'— নামের উৎস চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সেই বিখ্যাত শ্লোগান— 'পুবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়ার উপরে কর্তৃত্ব করে'। সিদ্ধান্ত হয় কাগজ প্রকাশিত হবে বহরমপুর থেকে। দীপুদা থাকবেন দায়িত্বে। প্রদীপ বক্সী মাসে মাসে বহরমপুর যাবে। সুমিতা আর আমি কলকাতায় কাগজের কাজ দেখব। পরে সুমিতাও বহরমপুরে যাওয়া শুরু করলো। যতদূর মনে পড়ে, সে সময় নাগাদই আমাদের দলনেতার নির্দেশে দীপুদা সুমিতার জন্য বহরমপুর গার্লস কলেজে একটা পড়ানোর কাজ জুটিয়ে দিলেন। সুমিতা বহরমপুরে থিতু হলো। প্রদীপ বক্সীর সঙ্গে সুমিতার অনুরাগ পর্বের সূচনা কবে জানি না। ঘর বাঁধার সিদ্ধান্ত ওরা নিল সম্ভবত এই পর্বেই।

কাগজ প্রকাশিত হলো। ঐ কাগজের কোন্ লেখা দীপুদার , কোন্টা আমার, কোন্টা প্রদীপ বক্সীর, কোন্টা সুমিতার এসব বলা যাবে না। কারণ কোনো লেখাই কারও নিজ নামে প্রকাশ হত না। এতদিন পরে আন্দাজ ক'রে বলাও মুস্কিল। তবে সব লেখাই খুব উগ্র ঝাঁঝের, সব লেখাতেই থাকতো সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ। আক্রমণ শানানো হ'তো নয়াগণতন্ত্রপন্থী (আমাদের ভাষায়, ফিফটি ওয়ানের) উপদলীয় কার্যক্রমের বিরুদ্ধে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রায় প্রতিটি বিষয় আমরা খুঁটিয়ে আলোচনা করতাম। লিউ সাউচি, তেঙ সিয়াও পিঙ, চৌ-এন-লাইও থাকতো আমাদের সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের টার্গেট। আমরা পছন্দ করতাম চিয়াঙ চিঙ ও চেন পো তা-কে। লাল লণ্ঠন ছিলো আমাদের আদর্শ নাটক। সং অফ ওয়াং হাই (বিপ্লবের গান) ছিলো আমাদের আদর্শ উপন্যাস। সং অফ ওয়াং হাই অনুবাদ করলেন দীপুদা। সেটা সম্ভবত 'অনীক'-এ প্রকাশিত হল। বলা দরকার, 'অনীক' তার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কাগজ হয়েছিলো একমাত্র এই সময়ে। পুরানো 'অনীক' ঘাঁটলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এসব কথা এতটা বিস্তারিতভাবে লিখছি এই কথাটা বলার জন্য যে দীপুদা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে কখনও কাজ করেন নি, জনমানসে এরকম যে একটা ধারণা আছে সেটা ভুল। দীপুদা সাংগঠনিক সম্পর্ক বজায় রেখেই রাজনীতি করেছেন তাঁর প্রথম যৌবনে। এ রাজনীতিতে তিনি কতটা দায়বদ্ধ ছিলেন আমাদের সেই 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গোষ্ঠীর জীবিত সদস্যদের অনেকেই তার সাক্ষী। রাজনীতিটা আমাদের ঠিক ছিলো না। অতটা মারমুখী লেখাপত্র না লিখলেও চলতো। কিন্তু নিষ্ঠার অভাব আমাদের ছিলো না। কিন্তু সে যাই হোক, দীপুদা আমার কমরেড হয়ে উঠেছিলেন সেই সময়েই। পাতিপুকুরের কমিউনে একসাথে থালাবাসন মাজা, দলনেতার কাছ ঘেঁসে বসে তাঁর বাণী শোনা, পিকিং রিভিউ-এর লেখা পড়ে তর্ক করা, নকশালবাড়ি নিয়ে পিকিং রিভিউ-র বাড়াবাড়ির কারণ নির্ণয় করা— সব কিছু নিয়ে চলতো আমাদের দিনগুলো।

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে পাতিপুকুরের কমিউনে একটা মিনি-অভ্যুথান হ'ল আমাদের কয়েকজনের নেতৃত্বে। পেছনে তাকিয়ে মনে হয়, গুপ্তসমিতিতে টিকে থাকার জন্য যে অবদমন অনুশীলন করতে হচ্ছিলো এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীকে, সেই অবদমনই শেষ পর্যন্ত এর আধারটিতে বিস্ফোরণ ঘটায়। আমরা রাজনৈতিক লাইন নিয়ে বিতর্ক তুলি নি, বিতর্ক তুলেছি আমাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি নিয়ে। সমাজবর্জিত, শ্রেণীসংগ্রাম বর্জিত সাচ্চা কমিউনিস্ট গড়ার লাইনটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আক্রমণ করেছি দলনেতাকে। প্রদীপ বক্সী আর সুমিতা ছাড়া কেউ থাকলো না দলনেতার সঙ্গে। আমরা তৈরি করলাম অন্য একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী, 'মজদুর' হ'লো যার মুখপত্র। দীপুদা যুক্ত হ'লেন এই দলটিতে। 'অনীক'-এর ভাগ্য ও জড়িয়ে গেল এই দলটির সঙ্গে। তখনও আমরা 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' পন্থী। গ্রামে গিয়ে কৃষি বিপ্লব করা নয়, খতম অভিযান নয়। শহরে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কাজ ক'রে পার্টির শ্রমিক ভিত্তি তৈরি করতে হবে। আন্দোলন হবে প্রকাশ্য— মিটিং মিছিল দাবি আদায়ের লড়াই। তবে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ার উপাদানগুলো সবসময়ই লালন করতে হবে। কীভাবে? গোড়া থেকেই পার্টিতে থাকবে সশস্ত্র স্কোয়াড, যা গোপন থাকবে। মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে মিছিলের মানুষের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা স্কোয়াড বোমা ছুঁড়বে পুলিশের ওপর। এই স্কোয়াডগুলোই ভবিষ্যতের লালফৌজের ধাত্রী। লাইনটি প্রয়োগ করার তাগিদে আমরা যাই মোহিনী মিলে, মেটাল বক্সে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল করার জন্য হেদুয়ায় জমায়েত হই। পুলিশ বাধা দিলে বোমা ছুঁড়ি, গ্রেপ্তার হই দলে দলে। সঞ্জয় ক্ষেত্রীর ভবানীপুরের বাড়ির চার তলাটা আমাদের অঘোষিত মজদুর কার্যালয়। ওড়িয়া হোটেলে আহার করি আর ঘরে মাদুর পেতে পড়ি মাও রচনাবলী। দীপুদা বহরমপুরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল সংগঠিত করেন। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে খবর পান, তিনি এক কন্যাসন্তানের জনক হয়েছেন। মনের আনন্দে মাও-এর ভাষণ (২০শে মে'র বিবৃতি) একরাতে অনুবাদ করে দুদিনের মধ্যে ছাপিয়ে বান্ডিল করে হাজির হন সঞ্জয়ের চারতলায়। প্রকাশক দীপংকর চক্রবর্তী, প্রকাশনা সংস্থা 'পিপলস্ বুক এজেন্সি।' সবই সেই খাগড়ায় তার ভাড়া বাড়ির ঠিকানায় অবস্থিত। ত্রৈমাসিক 'অনীক' তো আছেই। সঙ্গে জুটেছে 'মজদুর'। 'মজদুর'এর জন্য লেখা লেখেন দীপুদা, লেখা অনুবাদ করেন। 'মজদুর' বিক্রি করেন। 'মজদুর' বাঁধিয়ে রাখেন। 'মজদুর' এখন আর

কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু আছে তা দীপুদার সংগ্রহে।

আসানসোলে মুক্তেশের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে সঞ্জয় ফিরে এসে আমাকে পাকড়াও করলো তার চারতলার ফ্ল্যাটে। প্রশ্ন বিপ্লবের স্তর নিয়ে। প্রথমে যুক্তি আর পাল্টা যুক্তি। তারপর বইপত্র এবং বইপত্র। তারপর আবার তর্ক। ল্যান্সডাউনের ওড়িয়া হোটেল থেকে যাত্রা শুরু করে হাঁটতে হাঁটতে ন্যাশনাল লাইব্রেরি। সেখান থেকে হাজরা পার্ক। তারপর আবার হাঁটা। সরশুনার বাস ধরে শুভ-র নূতন বাড়ীতে হানা দেওয়া। শুভ-র মা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকেন— তোদের কি কেউ মারা গেছে? একটা দীর্ঘলালিত তত্ত্বের মৃত্যু হয়। আমরা এবার মেইনস্ট্রিম নকশালপন্থী, আমরা চাই নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। দীপুদাও আমাদের সঙ্গী। 'অনীক'-এ তীব্র আত্মসমালোচনা সহ প্রকাশিত হল সেই সম্পাদকীয়, যে সম্পাদকীয় ভারতের বিপ্লবের স্তরটিকে চিহ্নিত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর হিসেবে।

অতঃপর কী করা যায়? ইতিমধ্যে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সিপিআই(এমএল) গঠিত হ'য়েছে। চলছে 'খতম অভিযান' নির্বাচন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন— সবই এসে গেছে 'বয়কট'-এর আওতায়। এই পার্টিই পেয়েছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্বীকৃতি, সেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যার নেতৃত্বে আছেন স্বয়ং মাও সে তুঙ। আমরা কি ঐ পার্টিতেই যোগ দেব, নাকি আবার একটা নূতন পার্টি তৈরী করতে নামবো? এতদিন ধরে একসাথে চলা মানুষগুলোর মধ্যে এবার এলো বিভাজন। শুভ-সঞ্জয়-সত্যর বক্তব্য, নূতন পার্টি গড়ার প্রয়োজনীয়তা আর নেই। সিপিসি স্বীকৃত পার্টিটিই এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। লাইন নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু তার জন্য আলাদা দল গড়ার দরকার নেই। অন্যদের বক্তব্য, বিপ্লবের স্তর নয়াগণতান্ত্রিক হ'লেও সিপিআইএমএল ঠিক পার্টি নয়। রণকৌশলগত লাইন হঠকারী, সন্ত্রাসবাদী। অসিত সেন, নাগী রেড্ডী বা প্রমোদ সেনগুপ্ত যে কারণে এই দলটির সঙ্গে থাকেন না, সে কারণ বা কারণগুলোর সারবত্তা আছে। দীপুদা, নবারুণ, নিমাই, পল্লব এই বক্তব্যের পক্ষে। আমার যুক্তিবোধ বলছে, ওদের কথা ঠিক; আবেগ বলছে সিপিসি যে নূতন যুগের কথা বলছে, এ পার্টি সেই নূতন যুগের পার্টি, আগের মাপকাঠিতে যার বিচার হবে না। এ পার্টি কী সেটা বুঝতে হলে 'আত্মত্যাগের রাজনীতি' করতে হবে।

দীপুদার সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠন করার ইতিহাস এখানেই শেষ। দীপুদা ফিরে গেলেন বহরমপুরে। ঠিক করলেন সক্রিয় রাজনীতি আর তিনি করবেন না। রাজনীতি অবশ্য তিনি ছাড়লেন না, কারণ 'অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী' হবার জিন দীপংকর চক্রবর্তীর মধ্যে ছিলো না। দীপুদা অবলম্বন করলেন 'অনীক' পত্রিকাকে। এ পত্রিকার পিছনে এখন আর কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মদত নেই। সুতরাং নেই লোকবল এবং অর্থবল। দীপুদার পাশে দাঁড়ালো নবারুণ। নবারুণের ১১ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ী হল 'অনীক'-এর কলকাতার ঠিকানা। পত্রিকা প্রকাশিত হয় বহরমপুর থেকে, কলকাতায় তা দেখাশোনা করে নবারুণ। 'অনীক' তখনও ত্রৈমাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি 'চীনপন্থী' এবং 'নকশালপন্থী', কিন্তু কখনই সিপিআইএমএল-পন্থী নয়। এটা সাধারণভাবে তৃতীয় ধারায় রাজনীতির (অর্থাৎ সিপিআই ও সিপিএম বিরোধী ধারার) সমর্থক। এ পত্রিকা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে লেখা ছাপে, আবার নির্বাচন বয়কটের লাইন ঠিক কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কাগজটার সঙ্গে আমি যুক্ত নই তখন। কখনও কখনও নবারুণের বাড়িতে রাত্রিবাসকালে কাগজটা নাড়াচাড়া করি। প্রায় একক উদ্যোগে এই সময় দীপুদা প্রকাশ করলেন 'অনীক'-এর বাংলাদেশ সংখ্যা, যে সংখ্যাটি বিপুলভাবে আদৃত হলো বাংলাদেশে, দ্রুত যে সংখ্যা নিঃশেষিত হয়ে যায়। নবারুণকে সঙ্গে নিয়ে দীপুদা পিপলস্ বুক এজেন্সিকে চীনা বইপত্র বিক্রির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললেন এই সময়। দুজনে মিলে নেপালে গেলেন, চীনা বই যাতে সহজে আমদানি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে। জেলখানায় বসে পড়লাম 'অনীক' এর শারদসংখ্যা, যাতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি কংগ্রেসের পুরো রিপোর্টটা ছিলো। 'নূতন যুগ' সংক্রান্ত যে ধারণা আমাকে সিপিআইএমএল-পন্থী ক'রে তুলেছিলো, জানলাম সে ধারণা ভুল। মনে পড়লো শুভর সরশুনার বাড়িতে অনুষ্ঠিত সেই ম্যারাথন মিটিং-এর কথা। মনে পড়লো দীপুদা নবারুণের কথা।

দীপুদা সিপিআইএমএল-এ যে যুক্ত হন নি তার কারণ এই নয় যে তিনি ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি এর সঙ্গে যুক্ত হন নি রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে। ঝুঁকি নেবার সাহস যে তাঁর ছিলো সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৭৫ সালের জুন মাসের শেষের দিকে, যখন জরুরি অবস্থা জারি করা এবং প্রেস-সেন্সরসিপ লাগু করার বিরুদ্ধে তিনি এক তীব্র আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয় লিখলেন 'অনীক' পত্রিকায়। প্রত্যাশিত ভাবেই তাঁর ওপর নামলো রাষ্ট্রীয় আক্রমণ। 'অনীক' বন্ধ হয়ে গেল, পিবিএ বন্ধ, দীপংকর চক্রবর্তী জেলে গেলেন। বাড়ীতে থাকলো দুই শিশু সন্তান সহ মীরা— ভরসা মীরার স্কুল মাস্টারি, ভরসা আত্মীয় বন্ধুরা। উনিশ মাস জেলে কাটিয়ে, জরুরি অবস্থার অবসানে ঘরে ফিরলেন দীপুদা। দীপংকর চক্রবর্তী কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত থাকেন না, কারণ তিনি ঝুঁকি নিতে চান না— একথা এর পর আর কখনও ওঠেনি।

জরুরী অবস্থার পরে 'অনীক' এর ভবিষ্যত নিয়ে একটা মিটিং হয় দীপুদার বহরমপুরের বাড়ীতে। দীপুদা বললে,

এইভাবে বহরমপুর থেকে প্রায় একক উদ্যোগে এই পত্রিকা প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঠিক হলো, কাগজ প্রকাশিত হবে কলকাতা থেকে, সম্পাদক হিসেবে শুধু দীপুদার নাম থাকবে না, থাকবে আমার নামও। নাম ছাপা হবে না, কিন্তু প্রেস ও প্রকাশনার দায়িত্ব থাকবে নবারুণের ওপর। কলকাতায় এ জন্য একটা অফিস খোলা হবে। ঐ অফিসে আমি বসব নিয়মিত, অন্যরাও আসবেন। আমি তখন যুক্ত আছি একটি বিশেষ নকশালপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে। কিন্তু একটা অলিখিত বোঝাপড়ায় আমরা পৌঁছে গেছি ইতিমধ্যেই— পত্রিকাটি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কথা বলবে না, তাদের বিশেষ মত কিছু থাকলে সেটা 'অনীক'-এর মত হবে, এমন কথাও নয়। 'অনীক' চলবে তৃতীয় ধারার সাধারণ রাজনীতি অবলম্বন করে। 'অনীক' কোনো রাজনৈতিক দল গড়ার উদ্যোগ নেবে না। 'অনীক'-কে ঘিরে তাই বিশেষ কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠিও গড়ে উঠবে না।

জরুরি অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে বামপন্থী আন্দোলনে একটা জোয়ার এসেছিলো। এই জোয়ারে 'অনীক'ও লাভবান হল। কাগজের প্রচার বাড়তে লাগলো। এক ঝাঁক নতুন কর্মী যুক্ত হলেন এই পত্রিকায়। এখন যাঁরা অনীক চালান, তাঁদের অধিকাংশকেই 'অনীক' অর্জন করেছে এই পর্যায়ে। বহরমপুর কলকাতা সমন্বয় করে ভালোই চলছিলো 'অনীক'। পত্রিকার প্রাণপুরুষ দীপুদা। বহরমপুরের বাড়ির একতলার ঘরে 'অনীক'-র অফিস। সন্ধ্যের পর সেখানে বসে যিনি গল্প কবিতা বাছাই করেন। চিঠিপত্র লেখেন। লেখকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে ডেসপ্যাচ পাঠান কলকাতায়। নিজে লেখেন, অন্যদের দিয়ে লেখান। নিয়ম করে কোলকাতায় আসেন। হৈ চৈ করে জমিয়ে রাখেন কলকাতার অনীক অফিস। আমরা যাই বহরমপুর। রাত জেগে মিটিং চলে। কাগজ প্রকাশিত হয় নিয়মিত; সমস্যা হয় না। সমস্যা যে ছিলো না তা নয়। আর্থিক সমস্যার কথা বলছি না। দীপুদা এবং নবারুণের কঠোর পরিচালনায় পত্রিকাটি মোটের ওপর নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকতো। এ কাগজের জন্য কাউকে পকেট থেকে টাকা দিতে হত না এই পর্যায়ে। সমস্যাটা ছিলো রাজনৈতিক চরিত্রের। অনীক-এর ঘোষিত সম্পাদকদের একজন হলাম আমি। আমি আবার সক্রিয়ভাবে কোনো না কোনো নকশালপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত। দলগুলোর মহাসমস্যা 'অনীক' নিয়ে। যে দলের যখন যা লাইন সেটা হতে হবে 'অনীক'-এর লাইন, অন্তত দলের লোক হিসেবে আমাকে সে লাইন নিয়ে যেতে হবে 'অনীক'-এ। না পারলে রাজ্য কমিটির মিটিং-এ এজেন্ডা করে আলোচনা হবে আমার 'বিচ্যুতি' নিয়ে। কিছুটা ছাড় দিয়ে, অন্যদের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে কোনো কিছু যে করা যায়, এই বোধটাই তখন আমাদের ছিলো না। ফল দাঁড়ালো এই যে, ঐ পর্যায়ের 'অনীক'-এ আমি কখনও কখনও 'আমাদের লাইন' চালিয়ে দিই। দীপুদার সঙ্গে সে নিয়ে মনকষাকষি হয়। কখনও 'অন্যদের লাইন' অনীক-এ প্রকাশিত হবার জন্য দলের কমরেডদের সমালোচনার সামনে পড়ি।

এইভাবে চলতে চলতেই গড়ে ওঠে আমার সঙ্গে দীপুদার সম্পর্কের একটা রসায়ন, শুধু রাজনীতি দিয়ে যা ব্যাখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যখন নকশালপন্থী রাজনীতির সাধারণ ধারার বাইরে গিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, তখনও দেখি সম্পর্কের সে রসায়ন সমানভাবে ক্রিয়াশীল। একদিন আমি বললাম, দীপুদা, চিন্তার এই পার্থক্য নিয়ে 'অনীক'-এর দুই সম্পাদকের একজন হিসেবে আমার নাম কি রাখা উচিত? দীপুদা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমার অসুবিধা নেই। তোমার কি অসুবিধা? রাজনৈতিক আমি বলতে চাইলো, হাঁ। অন্য এক আমি জবাব দিলো, না। রাজনৈতিক জমির বাইরে অন্য কোনো জায়গায় একটা রাজনীতি-বাহিত সম্পর্কের কি রূপান্তর হয়? ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলছি না, বলছি রাজনৈতিক সম্পর্কেরই কথা। যদি হয়, সে রূপান্তর কি রাজনৈতিক জমিকে কলুষিত করে না? এসবের কপিবুক উত্তর আমি জানি। আরও যেটা জানি তা হল। এই কপিবুক উত্তরের চেনা রাস্তার আশেপাশে অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর চিন্তার যে ঝোপঝাড় থাকে তাতে লুকিয়ে থাকে এক অচিন পাখি, যুক্তির ঠাস বুনট জগতে যে মহাহাঙ্গামা বাধায়, অচেনা সুরে যুক্তি লালিত আমিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের রূপান্তর সম্ভবত এ ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। দীপুদা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন না। দীপুদা কলকাতাবাসী হবার পর কদাচিৎ দীপুদার বাড়িতে গিয়েছি। দীপুদার মেয়ে আমাকে 'স্যার' বলে। দীপুদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাজনীতিবাহিত, রাজনীতি-আশ্রিত। কিন্তু চেনা ছকে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এ সম্পর্ক আবার সে রকমও নয়।

মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ঘরে দীপুদার নিথর দেহ রেখে এসে একা একা কলেজ স্কোয়ারের রেলিঙ ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন মন্থর গতিতে আশুতোষ বিল্ডিং-এর লম্বা করিডোরে হাঁটছি, তখন হঠাৎ মনে হলো কোনো কোনো বন্ধু জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের চেতনায়। দীপুদা আমার সে রকমই এক বন্ধু। যুক্তির ঠাস বুনট জগতে মহাহাঙ্গামা বাঁধায় এই সব বন্ধুরা।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# দীপংকর চক্রবর্তীকে মনে রেখে

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

দীপংকর চক্রবর্তী, আমাদের সবার প্রিয় দীপুদা, চলে গেছেন। ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। এমন প্রাণবন্ত, সক্রিয় মানুষ আচমকা শেষ হয়ে যেতে পারে না। কী ভাবে তাঁকে স্মরণ করব। টুকরো টুকরো স্মৃতির মালা গেঁথে কি?

দীপুদার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার ঢের আগেই তাঁর কথা জানতাম। একাত্তরের মাঝামাঝি পড়া শেষ করে দেশে ফিরেছি। উত্তাল দেশের, উত্তাল মহানগরের একটা 'রোড ম্যাপ' সন্ধান করছি। এক বন্ধু আমার হাতে 'অনীক' তুলে দিয়ে বলল, এটা পড়ো। অনেক কিছু বুঝতে পারবে। সেই থেকে আমি 'অনীক'-এর নিয়মিত ও অনুরাগিণী পাঠিকা। সব বিষয়ে একমত না হতে পারলেও এই পত্রিকা আমাকে এক জটিল ও বিপজ্জনক সময়কে বুঝতে শিখিয়েছে।

প্রথম দীপুদাকে দেখেছিলাম ১৯৭৫-এর মাঝামঝি। জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ঠিক আগে। বন্দীমুক্তির দাবিতে সভা ডাকা হয়েছিল। দীপুদা ছিলেন প্রধান বক্তা। লেখার মতো তাঁর ওজস্বিতাও ছিল মনে দাগ কাটার মত। সবাই যখন সমবেতভাবে নজরুলগীতি শুরু করল, ''কারার এই লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট'', তখন দীপুদার উদাত্ত কণ্ঠস্বর মিলে গেল তাদের সঙ্গে।

তারপরই নেমে এল জরুরি অবস্থার কালো দিন। দীপুদা গ্রেপ্তার হলেন, 'অনীক' বন্ধ হয়ে গেল। জরুরি অবস্থার বছর দুয়েক ধরে যে নৈরাশ্য ও বিপন্ন আবহাওয়া চলেছিল, তার মধ্যে এক বড় অংশ ছিল এই পত্রিকার অভাব। আর সম্পাদককে নিয়ে চিন্তা। অবশেষে এই কালো অধ্যায়ের উপর যবনিকা পড়ল। দীপুদা মুক্তি পেলেন। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা এই অভিজ্ঞতার পর কিছুমাত্র কমেনি। 'অনীক' বার হল সগৌরবে। পাঠকরা পড়লো অধীর আগ্রহে। দুইটি সংখ্যার পর প্রকাশিত হল মাও সেতুঙ স্মরণ সংখ্যা যা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। কেন্দ্রে ইন্দিরা ও রাজ্যে তার মনসবদার সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের অপসারণের পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। বর্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত 'অনীক' ছিল তার অংশীদার।

ক্রমে দেখা গেল, ঘটনা বক্ররেখায় চলে। জনতা সরকার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে আত্মহত্যার পথে গেল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ইন্দিরাকে লোকে ফিরিয়ে আনল, তিনি যা করেছিলেন সাম্প্রতিক কালে, সে কথা ভুলে। রাজ্যে বামফ্রন্ট কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেও তার সব কাজ সমর্থনযোগ্য মনে করা গেল না। সীমান্তের বাইরে বিপ্লব-ভাস্বর চীনে এবং ''আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম''-এও দেখা দিল নানা প্রশ্নচিহ্ন। এ হেন বিভ্রান্তি ও বিতর্কের মধ্যে দীপুদা ও তাঁর 'অনীক' ছিল স্থির-শিখাসম্পন্ন প্রদীপের মতো। দেশি ও বিদেশি বিষয় উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ নিয়ে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ ও ক্ষুরধার বিবেচনা। তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে একমত না হয়েও কথা বলা যেত। সে সময় জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জগতে যে ডামাডোল চলত, 'অনীক' তার মধ্যে পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। তিন দশকের উপর পত্রিকা সে দায়িত্ব পালন করে এসেছে।

লিখতে গিয়ে কত কথাই না মনে পড়ছে। এতদিন দীপুদা ছিলেন আমার কাছে দূরের নক্ষত্র। শেষ দিকে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হলো। বলব, তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারেরই একজন। আমারও ভূমিকা কিছুটা পাল্টালো। পাঠিকা থেকে এক লেখিকার পদে উত্তরণ ঘটল। আর এটা সম্ভব হলো অনেকটা দীপুদার উৎসাহে ও সহায়তায়। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, পত্রিকার একটি লেখা পাঠানোর বিষয়ে। আমার জীবন ও কাজের উপর দীপুদার প্রভাব সামান্য ছিল না।

স্মৃতিচারণ করতে গেলেই গুণবর্ণনা করতে হবে, তার কারণ নেই। তবে দীপুদার অসামান্যতা ভুলে যাওয়া যায় না। তাঁর জ্ঞান যেমন ছিল বিস্তৃত ও বিবিধ, তেমনি ছিল লেখার প্রসাদগুণ। দীপুদাকে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক বলা যেতে পারে। এমন কিছু নিয়ে তিনি কলম ধরেছেন যা জটিল ও স্পর্শকাতর। ধরা যাক বাংলার রেনেসাঁসের কথা। বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে বাংলার মার্কসবাদী মহলে বিতর্কিত। নকশালপন্থী আমলে এই বিতর্ক বা বিভাজন চরমে উঠেছিল। মূর্তি ভাঙা ইত্যাদি অতি-বাম হঠকারিতার কথা বাদ দিলে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরকম। বাংলার রেনেসাঁস, অথবা তাকে যাই বলা যাক না কেন, গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায়, আধা-সামন্তবাদকে অবলম্বন করে। লড়াই যেখানে সাম্রাজ্যবাদের ও আধা-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, সেখানে এ জাতীয় রেনেসাঁসকে গুরত্ব দেওয়া যায় কি? আবার এর মধ্যে ইতিবাচক বস্তু আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না। দীপুদা তাঁর রামমোহন ও বাংলার রেনেসাঁস সংক্রান্ত বইতে বিতর্কিত বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন কিছু পরিমাণে। সুভাষচন্দ্র আর একজন, যার সাথে বামপন্থীদের ছিল যাকে

বলে love-hate সম্পর্ক। সুভাষচন্দ্রের ভাস্বর দেশপ্রেম অদম্য সাহস শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কিন্তু তাঁর ফ্যাসিবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা কি সমর্থনযোগ্য? দীপুদা সুভাষচন্দ্রের উপর গবেষণা করেছিলেন। একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ একটি বই লেখার ইচ্ছা ছিল এবং তার জন্য বেশ কিছু মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লেখা হয়নি। বামপন্থা ও বাংলায় প্রগতির আইকনদের মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে যদি আলোচনা হয়, তবে দীপুদার অবদানের কথা না বললেই নয়।

মূলত রাজনীতির মানুষ হলেও, অর্থনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে চর্চা করলেও, দীপুদা সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আদৌ উদাসীন ছিলেন না। মনে পড়ে, ১৯৯৪ সালে আমরা হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলাম, এক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে। দীপুদা ফেরার টিকিট পাল্টে একদিন বেশি থেকে গেলেন। অন্ধ্রের এক প্রখ্যাত গণকবির সঙ্গে কথা বলা ও তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে। এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার পরে 'অনীক'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সংস্কৃতি যে নয়া-উদারনীতির বিরুদ্ধে এক বড়ো হাতিয়ার, এ কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। দীপুদার কাছে শুনেছি, একবার তিনি বাসে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, প্রখ্যাত সঙ্গীতকার প্রতুল মুখার্জীর সঙ্গে। দীপুদার উৎসাহে প্রতুল গাইতে লাগলেন তাঁর সেই সুবিদিত গান, মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। অন্যতম লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে দীপুদার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। মহাশ্বেতার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্প, যেমন 'বিছন' অনীক-এই প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত 'অনীক' মূলত রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা হলেও সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়টি অবহেলিত ছিল না। রাজনীতির সাথে সংস্কৃতির যোগসূত্র অস্বীকার করা যায় না। কম হলেও কিছু গল্প কবিতা প্রকাশিত হতো, আর তার মান খুব উচ্চস্থানীয় ছিল না। মাঝে দু চারবার কথা উঠেছিল, ও সব একেবারে বাদ দেওয়া যাক। কিন্তু দীপুদা বিচক্ষণতার সঙ্গে তাতে রাজি হন নি। শঙ্খ ঘোষের মতো অগ্রগণ্য কবির কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সিঙ্গুর সংক্রান্ত প্রতিবেদন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান উপলক্ষে 'অনীক' বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল। উৎপল দত্তের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি দীপুদাকে বলেছিলাম, "এ নিয়ে 'অনীক'-এ কিছু লেখা উচিত"। উনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, বেশ তো, তুমি লেখো না। উপরোক্ত সাংস্কৃতিক নক্ষত্ররা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যদিও তাদের সবার রাজনীতির সাথে 'অনীক' একমত ছিল না। সত্তরের দশকের গোড়ায় যখন নকশালবাড়ি আন্দোলন তুঙ্গে, স্বর্ণ মিত্রের (উৎপলেন্দু চক্রবর্তী) প্রায় লড়াইয়ের ময়দান থেকে লেখা উপন্যাস 'গ্রামে চলো' প্রকাশ করে অনীক কিছুটা ঝুঁকি নিয়েছিল ও সাড়া জাগিয়েছিল। দীপুদার নেতৃত্বে 'অনীক' যেমন আন্দোলনের দর্পণ ছিল, তেমনি ছিল কিছুটা সাংস্কৃতিক শাখা। চার দশকের বাংলার রাজনীতি, ও রাজনীতি ভিত্তিক সংস্কৃতি দীপুদা এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিফলনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

দীপুদার একটি পরিশীলিত নাগরিক মন ছিল (একথা বলে কারোর প্রতি কোনো অবজ্ঞা দেখাচ্ছি না)। দুটি নগরের, একটি ছোট ও একটি বড়ো, টানাপোড়েন ও সমন্বয় চোখে পড়ে দীপুদাকে কেন্দ্র করে। কাজের সূত্রে তিনি জীবনের বড়ো অংশ বহরমপুরে কাটিয়েছিলেন। অবশ্য তখনও ঘন ঘন কলকাতায় আসতেন। আঞ্চলিক বিষয়েও তাঁর উদ্যোগ ও উৎসাহ কম ছিল না। 'অনীক'-এর পাশাপাশি তিনি 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' সম্পাদনা করতেন। কত গল্প করতেন, মুর্শিদাবাদের নবাবি আমলের প্রাচীন গৌরব আর স্থাপত্যের কথা। আমাদের নিমন্ত্রণ জানাতেন দেখতে যাওয়ার জন্য। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাকাপাকি ভাবে কলকাতার বাসিন্দা হলেন। কারণ, কিছুটা পারিবারিক, কিছুটা চিকিৎসার উন্নত সুযোগ, কিছুটা 'অনীক'-এর ভালোভাবে দেখভাল করার বাসনা। ('অনীক' প্রথমে কেবল বহরমপুর থেকে বার হতো, তারপর যুগপৎ বহরমপুর ও কলকাতা থেকে। শেষ দিকে কলকাতার দিকেই পাল্লা ভারি হয়েছিল।) তবে আমার মনে হয়, কলকাতার কোলাহল ভরা জীবন ও দূষিত পরিবেশ দীপুদা ঠিক মানিয়ে নিতে পারেন নি। হয়ত স্থান পরিবর্তন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির এক কারণ। তবে আমার ভুলও হতে পারে।

নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বলে দীপুদা যে দিনরাত গুরুগম্ভীর হয়ে থাকতেন, এমন নয়। তাঁর রসিক মন, প্রাণখোলা হাসি আমরা কখনো ভুলবো না। যেখানে মতপার্থক্য ঘটত, সেখানেও তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব অটুট থাকত। মতান্তরকে তিনি কখনো মনান্তরের পর্যায়ে যেতে দিতেন না। নিজের বিশ্বাস বজায় রেখেও অন্যের মতকে স্থান দিতে পারতেন। নানা ধরনের লোক, নানা ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত থেকেও বিব্রত বোধ করতেন না। পাল্টাতেন না শান্ত, হাসিখুশি মেজাজ।

দীপুদা নেই। তাঁর স্মৃতি, তাঁর অবদান সহজে মুছে যাবে না। এখনো মনে হয়, তিনি যেন কাছেই আছেন। হাসিমুখে বলবেন, "কী, লেখাটা রেডি তো"।

# দীপংকর চক্রবর্তী— এক প্রবাহ

প্রণব দে

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে যাদের মার্কসবাদে হাতেখড়ি হয়েছিল, পরবর্তী জীবনে তারা বামপন্থী ভাবধারা এবং মার্কসবাদী ভাবজগতে অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী। ষাটের দশকে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে গণসংগঠন ও গণসংগ্রামের উপর ভিত্তি করে। সত্তরের দশকে উল্টোযাত্রা, গণসংগঠনই বয়কট— এটা ছিল একটা ধারা। আশির দশকে যে বামপন্থীরা সরকারে ক্ষমতাসীন হলো— সেটা ছিল আর এক ধারা। ক্ষমতায় যারা এলো, ক্ষমতার খাপে তারা নিজেদের মানানসই করে নিল। শ্রেণীসংগ্রাম হয়ে গেল অচ্ছুত। বার্লিন ওয়াল ধ্বসে যাওয়ার পর, নব্বইয়ের দশকে এদেশের মার্কসবাদীদের চিন্তাজগতেও যেন এক নৈরাজ্য ধাক্কা দিয়েছে। চীন পথ দেখাল সমাজতন্ত্র বাতিল করে পুঁজিবাদ বরণের। এদেশেও অনেক 'মার্কসবাদীর' মুখে পুঁজিবাদের গুণগান শোনা গেল। অপরদিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের রেশ ধরে যে তৃতীয় ধারার উত্থান, সেটাও গোষ্ঠীদীর্ণ। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্যায় বাদ দিলে, সামগ্রিকভাবে বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক জগতে যে এক শূন্যতা বিরাজ করছিল, সেটা অস্বীকার করা যায়না।

এই অবস্থায় যা হওয়ার, মূল্যবোধেও ভাঙ্গন ধরেছিল। জীবনচর্চায় এসেছিল পরিবর্তন। অনেকেই সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতা। এইরকম একটা সময়ে, সম্ভবত ২০০৪ সালের শেষ অথবা ২০০৫-এর প্রথম, দীপঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। 'অনীক' এবং 'বিপ্লবের গান'-এর দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে দূর থেকে দেখেছি, সমীহ করেছি। তিনি যে আমার একটা লেখা পড়ে, টেলিফোন নম্বর যোগাড় করে ডেকে পাঠাতে পারেন, এটা ভাবনাতেও ছিল না। সম্মানিত বোধ করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, কিছুটা সংশয়ও ছিল।

আমি দীপংকর চক্রবর্তীকে জেনেছিলাম পরিণত বয়সে। আবেগ বস্তুটা সেই বয়সে ক্ষীণস্রোতা। একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, যিনি বুদ্ধিজীবী হয়েও উন্নাসিক নন, দল না করেও মার্কসবাদী। দিলখোলা, রসবোধ সম্পন্ন, মূল্যবোধের মানুষ। কায়িক শ্রমে অনীহা নেই। একদিকে ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন, অপরদিকে *অনীক*এর মোড়কে ডাকটিকিট সাঁটছেন। স্থিতধী, নিজ বিশ্বাসে দৃঢ়, কিন্তু ইংরাজিতে যাকে বলা হয় ডগম্যাটিক, তা কিন্তু নন। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, এমন একজনেরই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চাই, বিশ্বাস যেখানে হারায় না।

২০০৬-এর পর পশ্চিমবঙ্গ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-নেতাইয়ে পুলিশ-প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলের যে অত্যাচার-নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছিল, তাতে স্পষ্টত জনমানসে তদানীন্তন শাসকদলকে প্রত্যাখান করার আকুতি জন্মেছিল। এই সময়ে বামপন্থী চিন্তক শিবিরে আবার এক সংকট উপস্থিত হয়। *অনীক*-এর পাঠকদেরও এই দ্বন্দ্ব স্পর্শ করেছিল। দীপুদার বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তনে কোন মৌলিক পরিবর্তন হবেনা, কিন্তু অত্যাচারী শাসকরা ফিরে এলে এই বিশাল আন্দোলনের প্রতি অবিচার করা হবে। অনেকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও আমি দীপুদার এই বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলাম। কারণ দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি জানি, গায়ে লাল রঙ মাখলেই অন্তরে লাল হওয়া যায়না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলন ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। আন্দোলনের রাশ তো আর মার্কসবাদীদের হাতে ছিল না। নয়া শাসকদল সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে, গণআন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে। দীপুদার কলমও তৎক্ষণাৎ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। দীপংকর চক্রবর্তীর রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য, আমি যা বুঝেছিলাম, তাঁর মার্কসবাদী ভাবনায় গুরুত্ব পেত শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতি। একই সঙ্গে স্থান ও কালের চাহিদা এবং বৈশিষ্ট্যকেও তিনি মান্যতা দিতেন। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যদি এই দুটি উপাদান গুরুত্ব পেত, আজকের এই নেতৃত্বের সংকটকে হয়তো অতিক্রম করা যেত।

স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা দীপুদা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনের অনেক ছোট ছোট ঘটনাতেও এই মানসিকতার প্রতিফলন দেখেছি। জীবনে তাঁর শেষ কাজ দেহদান। এটাও বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। ইচ্ছাপত্র তিনি আগেই সম্পাদন করে রেখেছিলেন। এটাও তো যুক্তিবাদী জীবনচর্চার এক নিদর্শন। এইভাবেই সাঁতার কেটে কেটে, বাধাবিপত্তি ঠেলে ঠেলে তিনি *অনীক*-কে এতটা পথ পার করিয়ে এনেছেন। সাথে সাথে নিজেও সম্ভবত একটা প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাহলে, আজকের এই রাজনীতি-বিরূপ তরুণ সমাজেও অনীক নিয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করি কেন।

অনীকের পথ চলা এই প্রবাহ ধরেই।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# আমাদের দীপংকরদা

সুমিতা

প্রথম যৌবন থেকেই *অনীক* করি, কলকাতায় তখন *অনীক* গোষ্ঠীর কনিষ্ঠতম সদস্য, একেবারে নিচুতলার কর্মী। মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় এইসব সিনিয়রদের প্রতি— যারা বিপ্লবী রাজনীতি করেন, মার্কসবাদী ধ্রুপদী সাহিত্য যাদের গুলে খাওয়া, তার ওপর বিপ্লবের টানে জেলে গেছেন। আমি কলকাতার কর্মী। সেখানে দীপংকরদার আসা-যাওয়া ধূমকেতুর মতো, হঠাৎ হঠাৎ আসেন, *অনীক* অফিসটা সেদিন একটু বেশি সরগরম হয়ে ওঠে, আর পরের দিন সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক হয়— জানতে পারি। দীপংকরদাকে তখন দেখেছি নিয়মিতভাবেই, কিন্তু চিনি নি।

যে সময়টার কথা বলছি সেটা '৭৮ সাল। নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় ও বন্দীমুক্তির পর সে এক রাজনৈতিক জোয়ারের সময়। আশার সময়। সত্তরের দশক মুক্তির দশক হয়নি ঠিকই, কিন্তু অতীতের ভুলগুলি কাটিয়ে উঠে বিপ্লবী বামপন্থীরা নতুন করে কাজ করবেন, ভারতে নতুন সূর্য আনবেন— এই আশা। সেই সময় আমার দীপংকরদাকে প্রথম দেখা।

দীপংকরদাকে চেনা, ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার শুরু এর অনেক পরে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি। তখন এক মহা সংকটের সময়। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে পড়েছে। পূর্ব ইউরোপের 'রিয়েলি এক্সিস্টিং' সমাজতন্ত্র আর নেই। চীন মাওয়ের পথ ছেড়েছে। চারদিকে হতাশা। হতাশা শুধু মানসিক নয়, হতাশার দর্শনে চারদিক ছেয়ে গেছে। পুরনো কর্মীরা কেউ রাজনীতি ছেড়ে বসে যাচ্ছেন, কেউ অন্য রাজনীতি ধরছেন, কেউ আছেন কিন্তু বিশ্বাসের জোর নেই, কেউ বা সরাসরি জীবনকে অন্য খাতে বইয়ে দিচ্ছেন। আর নতুন কর্মীদের গ্রাস করেছে উত্তর আধুনিকতা— তার অন্য নানা মাত্রা থাকলেও যেটি আসলে কিছু না করার, বিশেষ করে সবাই মিলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কিছু না করার দর্শন।

এই সংকট গ্রাস করেছে *অনীক*-কেও। আমাদের কর্মীদেরও। *অনীক* চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সেই সময় চিনলাম দীপংকরদাকে। বুঝলাম, যদি কলকাতায় একজনও থাকেন আর বহরমপুরে দীপংকরদা, তাহলেও *অনীক* চলবে। পরে বুঝেছি, কলকাতায় যদি কেউ না থাকেন, শুধু বহরমপুরে দীপংকরদা, তাহলেও *অনীক* চলবে। এবং চলবে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথ ধরেই।

এর মধ্যে দীপংকরদার একটা বড়ো আর একটা ছোট হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। বাইপাস অপারেশন হয়েছে। কীভাবে চলেছে *অনীক*? হাসপাতালের বিছানা থেকে *অনীক*-এর পরিকল্পনা হয়েছে, ডাক্তার-নার্সদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শ্রুতিলিখনে 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ'-র সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। *অনীক* চলেছে। *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ*-ও।

এরপর ২০০৩ সালে দীপংকরদা কলকাতায় এলেন। আমাদের অনেকের আপত্তি ছিল। ওনার শরীরের যা অবস্থা তাতে কলকাতার কঠোর জীবনে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে। কথাটা সত্যি। দীপংকরদার যে বুকের অসুখ, তা কলকাতায় এসে দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করলো, কলকাতার দূষিত বাতাসে একঘন্টা জার্নি করে *অনীক* অফিসে বা অন্যত্র যাওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগলো।

ভাগ্যিস দীপংকরদা আমাদের আপত্তি শোনেন নি। তাই তো আমরা দেখলাম নতুন এক দীপংকরদাকে। বহরমপুরে নানা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক মানবাধিকার সাংবাদিকতা ইত্যাদি উদ্যোগে অগ্রণী দীপংকরদা কলকাতাতেও একইভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। তখনও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম ঘটেনি। কিন্তু দীপংকরদার উজ্জ্বল উপস্থিতি *অনীক*-এর কলকাতা অফিসকেও নতুন করে প্রাণ দিল। *অনীক*-এর বর্তমানের এক প্রধান কর্মীকেও *অনীক* পেল দীপংকরদা কলকাতায় আসার পর প্রথম মাসেই।

এরপর এলো সিঙ্গুরের ঘটনা। ২০০৬ সাল। তখন সদ্য বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেছে, বিপুল ভোটে বামফ্রন্ট জয়লাভ করেছে। সবাই বলছেন, তিরিশ বছর হয়ে গেল, এরা বোধহয় আরও তিরিশ বছর থাকবে। ঠিক এমন সময়ে ঘটলো সিঙ্গুর। মে মাসে নির্বাচন। *অনীক*-এর জুন সংখ্যায় নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা। কিন্তু সম্পাদকীয়তে তখনই বলা হয়েছে সিঙ্গুরের কথা। এরপর তো সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। সংগ্রাম, প্রতিরোধ। এই সময়ে *অনীক* তো বটেই, নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কৃষকদের সংগ্রামের পক্ষে যারা দাঁড়ালেন, তাদের মধ্যে একজন অগ্রণী হয়ে উঠলেন দীপংকরদা। বিভিন্ন সরকারি ও পার্টিগত জুলুমের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সংগঠিত করা, গণশুনানি, পথসভা, মিছিল, কনভেনশন— উদ্যোগী দীপংকরদা।

আবার খাম্মামে যখন গুলি চললো সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন কৃষকদের বিরুদ্ধে— সেখানেও দীপংকরদা। নেপালে নির্বাচন, যেখানে সেখানকার সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মাওবাদীর অস্ত্র সংবরণ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন— সেখানেও দীপংকরদা। এছাড়া মানবাধিকার নিয়ে কাজ, এপিডিআর— এসব তো আছেই। *অনীক*-এর কথা বলাই বাহুল্য।

বলা চলে, ২০০৪ সালে কলকাতায় এসে এক দশকে নতুন করে কাজের জগৎ গড়ে তুললেন ষাটোর্দ্ধ এই তরুণ। দীপং করতি যঃ সঃ দীপংকরঃ। কলকাতায় এসে দীপংকর তাই অনীককে, এপিডিআর-কে ও আন্দোলনকে তাঁর আলো দিয়ে উজ্জ্বল করে তুললেন।

এসব কথা সবার জানা। সবাই লিখেছেন। কীভাবে তিনি মতাদর্শে, নিজের মতপ্রকাশে দৃঢ় থেকেও অন্যের মতামত মনোযোগ দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে শুনতেন, দরকারে নিজের মত পরিবর্তন করতে পারতেন, সেকথাও লিখেছেন অন্যরা।

এবার তাই বলি এমন কিছু কথা যেগুলি অন্যরা তো বটেই, আমরাও ঠিকমতো জানতাম না। কয়েক দশক ধরে পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনীকের সহকর্মীরাও জানতেন না যে পত্রিকা চালিয়ে যেতে হলে কী পরিমাণ নিরলস পরিশ্রম লাগে, যাকে ইংরাজিতে বলে থ্যাংকলেস জব। লেখা ঠিক করা, লেখা যোগাড় করা, সম্পাদনা করা, লেখক-পাঠকের সঙ্গে চিঠিতে-ফোনে যোগাযোগ রাখা— এগুলো সবাই জানেন। তারপর প্রেস, প্রুফ দেখা ও পত্রিকা প্রকাশ— এসবে তেমন গ্ল্যামার না থাকলেও এগুলোও করতে হয়। তার পরে আছে পত্রিকা ঠিক ঠিক জায়গায় পাঠানো, পাঁচশো পত্রিকা পোস্ট করা। কারোর কাছে যাবে একটি পত্রিকা, কারোর কাছে দুটি বা পাঁচটি, কারোর পত্রিকার সঙ্গে চিরকুট পাঠাতে হবে চাঁদা ফুরোনোর, কিছু পত্রিকা যাবে এজেন্টদের কাছে— সঙ্গে টাকার হিসেব, কিছু আবার যাবে বহরমপুরে বা অন্য কোথাও— সেখান থেকে পত্রিকা বণ্টিত হবে— সেখানকার চাঁদার হিসেব আবার অন্যরকম। যাঁরা ঠিকসময় চাঁদা পাঠাননি তাঁদের কাউকে ফোনে জানানো, কাউকে চিরকুটে, কাউকে ভিপি করা। এছাড়া পত্রিকা না পেয়ে গ্রাহকের (সাধারণত ডাকের গন্ডগোলের কারণে) ক্ষুব্ধ/রাগত ফোন বা চিঠি— তার সমাধান। বারবার সমস্যা হতে থাকলে ডাকবিভাগে যোগাযোগ। সরকারি নানা নিয়মকানুন, কাগজ পাঠানো। সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপনের প্রচেষ্টা। যাঁরা পত্রিকা করেন, করেছেন, তাঁরা বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু খুব কম জনই জানেন যে পত্রিকা প্রকাশের পর একমাত্র কলকাতার এজেন্টদের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো ছাড়া বাকি সব কাজ প্রায় একা করতেন দীপংকরদা— পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত। গত পাঁচ বছর ধরে অবশ্য তাঁর সহকর্মীরা এসব কাজ অনেকটাই হাতে নিয়েছিলেন।

বইমেলা। সহকর্মীরা কে কবে কখন বসবেন তার দিনক্ষণ স্থির হয়েছে। দীপংকরদা হাজির। হাতে কম্পিউটারে তৈরি একটা পোস্টার, নতুন সংখ্যার বিজ্ঞাপন। পেরেক হাতুড়ি হাতে সটান উঠে গেলেন কাউন্টারে— ওটা টাঙাতে হবে।

এগুলো কেন এত গুরুত্ব দিয়ে বলছি? কারণ, আমাদের তো জাতিভেদের সমাজ। সেখানে প্রগতিশীল-মার্কসবাদীদের মধ্যেও জাতিভেদ থেকে যায় অন্তঃসলিলা। যিনি প্রাবন্ধিক-বুদ্ধিজীবী-সম্পাদক— তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি পত্রিকার তাড়া বাঁধবেন না, হাতুড়ি হাতে নেবেন না। যে ছেলেটি নতুন এসেছে, এত বড় হয়নি— সে করবে এগুলো। দীপংকরদা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ছিলেন মার্কসবাদী। ছিলেন গণতান্ত্রিক। তাঁর কাছে তাই কাজের ভাগাভাগিতে কোনও কাজই ছোট ছিল না। এই দীপংকরদাকে আমার প্রণাম।

দীপংকরদার আর এক পরিচয়ের কথা বলি। অনেকেই জানেন, তিনি তরুণ রায় নামে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। সত্যিই তিনি ছিলেন চিরতরুণ। শুধু তরুণ কেন, শিশুও বলা যায়। শিশু মানে জিজ্ঞাসা। সে সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়। আর বৃদ্ধ হলো সে, যে সব বুঝে গেছে, নতুন জিজ্ঞাসা নেই তার। শেষ দিন পর্যন্ত দীপংকরদার মধ্যে সেই শিশুটি দারুনভাবে বেঁচে ছিল। তাঁর জিজ্ঞাসার শেষ ছিল না। তিনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড়ো মনে করতেন না। তাই তিনি হতে পেরেছিলেন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মানুষ। সাদা চুলের এই প্রবীণ বিদগ্ধ মানুষের কাছে সবচেয়ে কনিষ্ঠজনও তাই সমান মর্যাদা পেতেন। এটা অনেকে জানেন না, অনীকের প্রতিটি লেখা, প্রতিটি কাজে তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা না করে মত দিতেন না। এবং তুমুল তর্কবিতর্কের পর ওনার অনেক মত খারিজ হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। ইগো-বর্জিত, স্বচ্ছ, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক এই দীপংকরদাকে আমার প্রণাম।

শিশুটির কথা বলছিলাম। শিশুর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, জীবনকে উপভোগ করা। একটি ইটের টুকরো বা একটা লজেন্স হলেই তার আনন্দ, জীবনকে উপভোগ। বামপন্থী মানুষদের কাছে এই দীর্ঘ কঠিন সময়, অসুস্থতা, মৃত্যুচিন্তা— কিছুই দীপংকরদাকে জীবনরস থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি। 'তোমার আজ ফাইন হবে— চা-তেলেভাজা নিয়ে এসো'। 'আজ একটা লেখার জন্য কিছু টাকা পেয়ে গেছি, মিষ্টি খাওয়াবো'। এসব তো আছেই। তারপর, এর-ওর পেছনে লাগা। সবচেয়ে বেশি পেছনে লাগা হতো দীপংকরদার। বেশি হইচই করার জন্য সবচেয়ে বেশি বকুনিও খেতেন তিনি। দীপংকরদার চলে যাওয়াতে তাই *অনীক* শুধু তার অভিজ্ঞতম প্রাণপুরুষকেই হারালো না, হারালো সেই শিশুটিকে, যে মাতিয়ে রাখতো প্রতিটি দিন।

আরেকটা স্বীকারোক্তি করার আছে। অসুস্থতাকে উপেক্ষা করার জন্য দীপংকরদাকে আমরা খুব শাসন করতাম। 'বাড়াবাড়ি করবেন না, দীপংকরদা, আপনার বাঁচার দরকার আছে।' আসলে কিন্তু দীপংকরদা বাড়াবাড়ি করেন নি। কফি আর চারমিনার ছাড়া যাঁকে কল্পনাও করা যেত না সেই দীপংকরদা হার্ট অ্যাটাকের পর এ দুটি বস্তু আর ছুঁয়ে দেখেন নি। আন্দোলনের খুব প্রয়োজন না হলে ডাক্তারের নির্দেশমতো বিশ্রামও নিতেন। ওষুধবিষুধকে ডাক্তারি বিধিনিষেধকে জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। জীবনের যতটা সময় পাওয়া যায় সেটুকু শুধু নিঙড়ে নিয়েছেন, কাজে লাগিয়েছেন তিনি। কাজ ও জীবনকে উপভোগ, রাজনৈতিক জীবন, অধ্যাপনা, পরিবার— জীবনের কোনো দিককেই উপেক্ষা করেন নি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলো ছড়িয়ে গেছেন আমাদের দীপংকরদা।

# দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে

নারায়ণ সরকার

বহরমপুর শহরের দীর্ঘদিনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠক, বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদক ও মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠক দীপংকর চক্রবর্তী গত ২৭ জানুয়ারি কলকাতায় নিজ বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায় ১৯৪১ সালের ১৪ ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ছয় বছর বয়সে দেশভাগের ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরে চলে আসেন বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁরা সাত ভাই-বোন। বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দুই নেতা—অনন্ত ভট্টাচার্য ও সনৎ কুমার রাহার ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসে বামপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ছাত্র ফেডারেশন ও গণনাট্য সংঘের সক্রিয় কর্মী তাঁর ছোড়দাও তাঁকে বামপন্থায় আকৃষ্ট করেছিলেন। কৃষ্ণনাথ কলেজে আই.এস.সি. ও কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে বি.এ. পড়ার সময় তিনি ছাত্র ফেডারেশনে সক্রিয় থাকলেও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিতে কিছুটা অনীহা জন্মানোর ফলে মূলত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ—প্রধানত বিতর্ক ও লেখার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন।

১৯৬৪ সালে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সহযোগে 'পুনশ্চ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলে ভারতের চীনযুদ্ধ পরবর্তী কণ্ঠরোধকারী পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টাতে 'পুনশ্চ' ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। দেড় বছর পর এই পত্রিকার পরবর্তিত নাম হয় 'অনীক'। ত্রৈমাসিক 'অনীক' ১৯৭২ সালের জুলাই মাস থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। জরুরি অবস্থার সময় দীপঙ্কর বিনা বিচারে আটক থাকার জন্য ১৯৭৫ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৭৭ সালের জুলাই পর্যন্ত দু'বছর অনীক প্রকাশ বন্ধ থাকা ছাড়া নিয়মিত মাসিক পত্রিকা হিসেবে অনীকের প্রতিটি সংখ্যা আজ অবধি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। গত ৪৯ বছর ধরে সম্পূর্ণ অ-বাণিজ্যিক ও বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাহীন বাংলা ভাষার একমাত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাসিকপত্র হিসাবে 'অনীক' মননশীল পাঠক ও লেখকদের আকৃষ্ট করে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে যে সমস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি এদেশের জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বা যে সব আন্দোলন সমাজকে নাড়া দিয়েছে তা সবই তথ্য ও বিশ্লেষণে অনীকের পাতায় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য লেখকদের লেখাসহ সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীর অজস্র মূল্যবান নিবন্ধ অনীকে প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের সমৃদ্ধ করেছে। মৌলিক প্রবন্ধ ছাড়াও চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বহু দলিল ও বিখ্যাত উপন্যাস 'বিপ্লবের গান' অনুবাদ ও অন্যান্য বহু মূল্যবান অনুবাদ কর্ম, নাটক রচনা, রচনা সংকলন সম্পাদনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বহুপ্রজ লেখকের দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

'পুনশ্চ' সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুব উৎসব, বিতর্ক সভা আয়োজিত করা, ১৯৬৫ সালে 'বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ভিয়েতনাম দিবস বা বিশে জুলাই দিবস পালন ইত্যাদি বিভিন্ন আলোড়নসৃষ্টিকারী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী।

১৯৭০-এর দশকের শুরুতেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বীভৎস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, গণহত্যা, জেল হত্যা, পুলিশ হেফাজতে হত্যা ও ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর চরম আঘাত হানছিল তৎকালীন শাসকদল, তার প্রতিবাদে কপিল ভট্টাচার্য, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী ভট্টাচার্য, প্রমোদরঞ্জন সঞ্জয় মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে কলকাতায় একটি কনভেনশনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ২৫ জুন গঠিত হয় মানবাধিকার সংগঠন 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' বা এপিডিআর। এই কনভেনশনে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর উদ্যোগেই বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্যকে আহ্বায়ক করে বহরমপুর শহরে গড়ে ওঠে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ শাখা। ১৯৭৪ সাল এক সম্মেলনে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি গড়ে তোলা হয় অনন্ত ভট্টাচার্যকেই আহ্বায়ক করে। এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি এ জেলায় জোরালো বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলে ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সরব হয়। এই সব কাজেই অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরি অবস্থা জারি হলে 'অনীক'এ প্রকাশিত সিকিমের ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নিবন্ধের জন্য তিনি এবং অনীকের সঙ্গে যুক্ত তাঁর একজন সহকর্মী, জেলা এপিডিআর-এর দুই উদ্যোগী কর্মী, গ্রেপ্তার হন বিনা বিচারে আটক আইনে।

জরুরি অবস্থার অবসানে মুক্তি পাওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত এপিডিআর-এ বন্দীমুক্তি আন্দোলন ও পরবর্তীকালে জেলার নানা স্থানে এপিডিআর-এর শাখা সংগঠন গড়ে তুলে জেলা জুড়ে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এই জেলায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন দীপংকর চক্রবর্তী। ২০০৩ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি কলকাতায় এপিডিআর কেন্দ্রীয় সংগঠনেও সহ-সভাপতি হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। ২০০৩ সালের মে মাস থেকে বহরমপুর ত্যাগ করে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতাবাসী হন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও বর্তমান সরকারের রাজত্বে নোনাডাঙ্গা বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৯৬২ সালে ভারতের চীন যুদ্ধের পর কার্যত নিষ্ক্রিয় ও অবলুপ্ত 'ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি' সারা ভারতে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হয় বহরমপুর শহর তথা মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৭৪ সালে প্রধানত তাঁর উদ্যোগে। ১৯৭৪ সালে বিশে জুলাই কলকাতার কার্জন পার্কে 'ভিয়েতনাম দিবস' পালনের সময় পুলিশের হামলায় তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী প্রবীর দত্তের মৃত্যু ঘটলে ওই সমাবেশে উপস্থিত দীপংকর চক্রবর্তী বহরমপুরে ফিরে চুয়াল্লিশটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিদের সংগঠিত করে যৌথভাবে এক প্রতিবাদী নাগরিক কনভেনশন আয়োজিত করেন প্রবীন শিক্ষাবিদ অরবিন্দ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে। পরের বছর ১৯৭৫ সালে বিশে জুলাই দিবস উদ্‌যাপনের যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হলেও ২৬ জুন জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৮০-র দশকের প্রারম্ভে প্রধানত তাঁর উদ্যোগে বহরমপুর শহরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সংস্কৃতি পরিষদ' গড়ে উঠলে ওই সংস্থা থেকে বহরমপুরের বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে 'বিশে জুলাই উদযাপন কমিটি-র' পতাকাতলে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত বহরমপুর গ্রান্ট হল ময়দানে প্রতিবছর বিশে জুলাই 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস' পালন করা হয়। ১৯৬৩ সালে রঘুনাথগঞ্জে বই মেলা অনুষ্ঠিত হলেও জেলাস্তরে বইমেলা বা 'মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা' প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর শহরে ১৯৮১ সালের ৩ থেকে ৯ জুন কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে কবি মনীশ ঘটক স্মরণে ও 'বর্তিকা' পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তিতে। বইমেলা কমিটির সভানেত্রী ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী এবং প্রধান সংগঠক ও সম্পাদক ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। জেলার শিল্পীদের অংশগ্রহণে রবীন্দ্রগান, নজরুলগীতি, লোকগান ও গণসঙ্গীতের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায়। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির আসরে জেলার কবি ও আবৃত্তিকারদের সাথে জেলার বাইরে বিশিষ্ট কবিরাও উপস্থিত ছিলেন। সাতদিনের উন্নত মানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বহরমপুর শহর ও সমগ্র জেলায় সাড়া জাগিয়েছিল। বইমেলায় কোনো প্রবেশমূল্য ছিল না। ১৯৮১ সালের বইমেলার সাফল্যের পর ১৯৮২ সালে গঠিত হয় দ্বিতীয় জেলা বইমেলা কমিটি। ১৯৮২ সালের ১৪ থেকে ২০ মার্চ অনাথ শিশু-কিশোরদের সরকারি আবাসের মাঠে দ্বিতীয় জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় আরো বড় আকারে সাফল্যের সঙ্গে। এই বইমেলা কমিটিতেও সভানেত্রী ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী ও সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। এবারে আরো উন্নতমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জেলার পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা ইত্যাদির প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৯৮৩-র নভেম্বরে তৃতীয় বইমেলা কমিটি গঠনের সময়ে তৎকালীন প্রধান শাসকদল তাদের সদস্যদের ব্যাপকভাবে হাজির করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের বশংবদ ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন কমিটি তৈরি করে। দ্বিতীয় বইমেলার সমাপ্তি ভাষণে দীপংকর চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন যে, আগামীবার থেকে তিনি বইমেলার মূল দায়িত্বে থাকবেন না। সেই সুযোগ গ্রহণ করে শাসকদল ১৯৮৪ সাল থেকে বইমেলাকে তাদের দলতন্ত্রের কব্জায় নিয়ে আসে। ফলত দীপংকর চক্রবর্তী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা কেউই তৃতীয় বইমেলার কমিটিতে থাকেননি। তৃতীয় বইমেলা থেকেই ক্রমশ বইমেলা তার প্রাণোচ্ছলতা হারিয়ে শাসকদলের নিয়ন্ত্রনে গতানুগতিক বাণিজ্যিক মেলায় পরিণত হয়। ১৯৮১-এর বইমেলার পর প্রধানত দীপংকর চক্রবর্তীর উদ্যোগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও তৃতীয় ধারা রাজনীতির সমর্থক সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের প্রচেষ্টায় দল-নিরপেক্ষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সংস্কৃতি পরিষদ' গড়ে ওঠে ১৩ আগষ্ট, ১৯৮১-তে বহরমপুরে 'ভারতের ইতিহাস ঃ অধ্যয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা' বিষয়ে আয়োজিত আলোচনাচক্রের মাধ্যমে যাতে মুখ্য বক্তা ছিলেন ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র ও জ্ঞান পাণ্ডে। সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যরা ছাড়াও বহু স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন এই আলোচনাচক্রে। ১৯৮১-র ডিসেম্বর মাসে চীনা সাহিত্যিক লু সুনের জন্মশতবর্ষ পালন করা হয় সংস্কৃতি পরিষদ থেকে। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সংস্কৃতি পরিষদ বহরমপুর শহরে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে শহরবাসীদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল। তরুণ সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংস্কৃতি পরিষদের গণসঙ্গীতের টিম ও নাট্য শাখা শহর ও শহরের বাইরে জেলার বিভিন্ন স্থানে, এবং গ্রাম অঞ্চলেও অনুষ্ঠান করে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। বিশেষত 'বিশে জুলাইয়ের বিচার','আমরাও ডিমিট্রিভ', 'কানুর স্বপ্ন', 'তীরবিদ্ধ শিকার' নাটকগুলি দর্শক-সমাদৃত হয়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা ও আলোচনাচক্র চালানোর সঙ্গে সংস্কৃতি পরিষদ থেকে দীপংকর চক্রবর্তীর মূল দায়িত্বে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিতর্ক প্রশিক্ষণ ও চর্চার কেন্দ্র হিসেবে

গড়ে তোলা হয় 'বহরমপুর বিতর্ক পরিষদ'। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংস্কৃতি পরিষদের তরুণ সদস্যরা আশির দশকে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে খরাত্রাণ ও আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধের মতো সামাজিক কাজেও জড়িত হয়েছেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বহরমপুরের বিভিন্ন নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে বহরমপুর গ্রান্ট হল ময়দানে ২০ জুলাই তারিখে 'বিশে জুলাই সাম্রাজ্যবাদী দিবস' পালন করা হয় সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে। প্রতি বছরই সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য রেখে বিশে জুলাইয়ের তাৎপর্য তুলে ধরেন দীপংকর চক্রবর্তী। ১৯৭৪ সালের বিশে জুলাই কার্জন পার্কে পুলিশি হামলায় তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী প্রবীর দত্ত নিহত হওয়ার ঘটনার ওপর রচিত দীপংকর চক্রবর্তীর নাটক 'বিশে জুলাইয়ের বিচার' প্রতি বছরই মঞ্চস্থ করেন সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যরা। সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে 'বহরমপুর চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি' গঠন করে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত একটানা সাতবছর দেশ-বিদেশের অনেকগুলি সমাজ সচেতন ও শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির সম্পাদক ও প্রধান সংগঠক ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। মিস শেফালীর অশ্লীল ক্যাবারে নাচের ঘোষিত অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক সংস্থার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'বহরমপুর সাংস্কৃতিক সমন্বয় কমিটি'-র পতাকাকালে সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি বৃহৎ মিছিল ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে বহরমপুর শহরে পথ পরিক্রমা করে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে ওই নাচের আয়োজকরা অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত 'একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন কমিটি' গঠন করে বহরমপুর শহরে ও ১৯৯৩ সালে বহরমপুরের সঙ্গে শহীদ বরকতের বিদ্যালয় সালার থানার তালিবপুর হাইস্কুলে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী।

১৯৮২ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সক্রিয় সদস্য, কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং সভাপতি হিসেবে তিনি ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের একমাত্র সংগঠনকে সফলভাবে পুনর্গঠিত করেন কার্যকরী সমিতির উদ্যোগী সদস্যদের সহযোগীতায়। ১৯৮৩ সালে তাঁর মূল উদ্যোগে ও সম্পাদনায় বহরমপুর শহর থেকে সমীক্ষামূলক পাক্ষিক সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা' প্রকাশিত হয়। একবছর পর 'মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা' বন্ধ হয়ে গেলে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ থেকে পাক্ষিক সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে ২০০৩ সালের মে মাস পর্যন্ত। বহরমপুর ছেড়ে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতাবাসী হওয়ার পর বহরমপুরে তাঁর উত্তরসূরীরা নিয়মিতভাবে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন। ১৯৮৮ সাল থেকে 'বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' নামক একটি জেলাভিত্তিক সমীক্ষামূলক বার্ষিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতে থাকেন। ২০০৯ সাল পর্যন্ত এই বার্ষিক পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রায় পাঁচ দশক ব্যাপী অসামান্য গতিশীলতা, বিরল সাংগঠনিক দক্ষতা ও বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতিতে, আমরা 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণে' তাঁর উত্তরাধিকারীরা, বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

---

## অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল-এর শোকবার্তা

একটা সময়ে আমি কে এন কলেজে অধ্যাপনা করেছি, কিন্তু দীপংকর চক্রবর্তী আমি চলে আসার পর ঐ কলেজে যোগদান করেন। আমার প্রতি তাঁর ভদ্র আচরণ আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। উনি আমার লেখা একাধিক প্রবন্ধ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা, *অনীক*-এ প্রকাশ করছিলেন। উনি জানতেন যে আমার রাজনৈতিক মতামত তাঁর মতামতের বিপরীত। বিপরীত মতামতকে মান্যতা দেওয়ার তাঁর এই মানসিকতার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আজ আমার খুব মনে পড়ছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলন যখন চলছে তখন তৎকালীন শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং একজন শাসক দলের ঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্রকার নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে সমাজে অতি নিম্নস্তরের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। আমরা তিনজনই একটি পরিচিত টেলিভিশন চ্যানেল-এ উপস্থিত ছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে ফোন-এ দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা ছিলো। দীপংকর চক্রবর্তী ফোনে নিম্নরুচির ভাষা প্রয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পাশাপাশি নন্দীগ্রাম বিষয়ক প্রশ্নগুলি এমনভাবে উত্থাপিত করেন যে তাঁর যুক্তির কাছে আক্রমণকারীরা পরাস্ত হন। উনি যেভাবে সেদিন আমার মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন তা আমি সারাজীবন স্মরণে রাখবো। রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তিনি যেমন সংযত, ভদ্র ও সভ্য ভাবে রাজনৈতিক বিতর্ক চালাতেন, তা সবাই-এর কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। মতামতের ভিন্নতার কারণে তিনি কখনও আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেননি, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেননি। আমি আশা রাখি তাঁর অবর্তমানে *অনীক* পত্রিকা একই রকম সংযত ও নম্রভাবে রাজনৈতিক বিতর্ক পরিচালনা করবে।

**১৩/০২/২০১৩**

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# দীপংকর চক্রবর্তী— 'পুনশ্চ' পর্বের প্রেক্ষিতে

**সোমনাথ চক্রবর্তী**

বহুমুখী কর্মপ্রতিভার অধিকারী, বাম গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার অতন্দ্র প্রহরী দীপংকর চক্রবর্তীর আকস্মিক প্রয়াণ প্রগতিশীল শিবিরে নিঃসন্দেহে এক বিপুল ক্ষতি ও ক্ষত সৃষ্টি করল। আশৈশব বহরমপুর শহরে লালন পালন দীপংকরের। ছেলেবেলা থেকেই উদারনৈতিক পারিবারিক পরিবেশে সাহিত্য সংস্কৃতির আস্বাদ লাভ করেছেন তিনি তাঁর অগ্রজ ভ্রাতাদের উৎসাহ ও প্রেরণার সূত্র ধরে। কৃতী ছাত্র দীপংকর বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল ও কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রী লাভ করার কিছুকাল পরেই ঐতিহ্যমন্ডিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সাংস্কৃতিক নানা কর্মকান্ডের সূচনা করলেন দীপংকর। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সুধীজনমন্ডলীর মধ্যে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও মতবাদের বিশ্লেষণমূলক আন্দোলনের মঞ্চ 'অনীক' মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে। তার সলতে পাকানোর কাজটি কিন্তু তরুণ বয়সে সহযোগী বন্ধুদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতায় স্থাপিত 'পুনশ্চ' সাংস্কৃতিক সংস্থা স্থাপনের মধ্যে দিয়েই সাধিত হয়েছিল। সে কারণেই কৃতী দীপংকরের জীবনে 'পুনশ্চ' পর্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, এ কথাটি প্রণিধানযোগ্য।

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপন হল 'পুনশ্চ সংস্কৃতি পরিষদ'-এর। দীপংকরের এই নবীন উদ্যোগে তিনি তাঁর পাশে পেলেন ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুদলকে— কুমারেশ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চক্রবর্তী, মৈত্রেয় ঘটক, মণিময় মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ চক্রবর্তী, বিভাস মুখার্জী। তরুণ অধ্যাপক দীপংকরের যুক্তিনিষ্ঠ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী পাঠদান, বিতর্কসভায় তাঁর সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপনা, তাঁর তরুণতর ছাত্রদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করত এবং সেজন্যই প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় দীপ্ত বেশ কয়েকজন দীপংকর অনুরাগী ছাত্র 'পুনশ্চ' সংস্থার পরিচালনায় নানাবিধ কার্যক্রমে উৎসাহী সহযোগী হয়ে এগিয়ে আসে। অশোক দাশগুপ্ত, শ্যামল মুখার্জী, জয়ন্ত আচার্য, স্বদেশ বাগচী, সাবিত্রীপ্রসাদ গুপ্ত, স্মরজিৎ সিংহ, জয়ন্ত সাহা প্রমুখ ছাত্রকর্মীরা 'পুনশ্চ' সংস্থার ছত্রতলে এসে সামিল হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুস্থ চর্চা ও সুষম বিকাশের অভিলাষ ও অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভাব এই সংস্থার। বহরমপুরের মতো একটি মফঃস্বল শহরে নতুন যুগের সংস্কৃতিমনস্কতায় নতুন সুরের নতুন রুচির প্রতিশ্রুতির ঘোষণা। আধুনিক মানসিকতার বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও সুস্থ রুচির এষণা নিয়ে আগুয়ান হল 'পুনশ্চ'। ২৬, কোতোয়ালী রোডের পুরনো দোতলা বাড়ীর একটি ঘরেই ছিল পুনশ্চ সংস্কৃতি পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠাস্থল। শুরু হল ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'পুনশ্চ'-র প্রকাশ। অশোক মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত ভাবনাদীপ্ত মননশীলতার মূর্ত প্রতীকরূপ 'পুনশ্চ' সাহিত্যপত্রের প্রচ্ছদ এই পত্রিকার মান ও মননের অনন্যতাকে চিহ্নিত করে দিল। স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত কবি-লেখকদের রচনার পাশাপাশি কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনাও অলংকৃত করল 'পুনশ্চ' পত্রের পাতাগুলোকে। স্থানীয় সম্ভাবনাপূর্ণ কবি, গল্পলেখক, প্রবন্ধকাররা প্রবল উৎসাহে 'পুনশ্চ'র আবির্ভাবলগ্ন থেকেই জড়িয়ে পড়লেন এই সাহিত্যসেবী গোষ্ঠীতে। প্রগতিবাদী মননশীল প্রবন্ধ-গল্প-কবিতার সমাহারে সমৃদ্ধ 'পুনশ্চ' পত্রিকার বিশিষ্টতা শহর তথা জেলার বিদ্বজ্জনদের সানন্দ স্বীকৃতি লাভ করল অচিরেই। 'পুনশ্চ' সাহিত্যপত্রের সম্পাদকমন্ডলীতে প্রথম পর্বে দীপংকরের সঙ্গে ছিলেন উৎপলকুমার গুপ্ত, কুমারেশ মুখোপাধ্যায় ও সুধীর মজুমদার। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কারণে ১৯৬৬ থেকে 'পুনশ্চ' পত্রিকা 'অনীক' নামে প্রকাশিত হতে থাকে, যা আজ পাঁচ দশকের কালগণ্ডীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে সম্পাদকমন্ডলীতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হন সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত, মণিময় মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ চক্রবর্তী। প্রথমাবধি মুখ্য সম্পাদক ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তীই।

'পুনশ্চ সংস্কৃতি পরিষদে'র ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'পুনশ্চ' প্রকাশ ছাড়াও অন্যান্য বহুমুখী কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সাংগঠনিকভাবে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল, তাতে সভাপতি পদে ছিলেন কৃষ্ণনাথ কলেজের সর্বজনমান্য ও স্বনামধন্য অধ্যক্ষ ডঃ রামচন্দ্র পাল। দীপংকর চক্রবর্তী ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। কোষাধ্যক্ষ পদে কুমারেশ মুখোপাধ্যায়, অফিস-সম্পাদক পদে ভোলানাথ চক্রবর্তী, কলকাতা প্রতিনিধি হিসেবে মণিময় মুখোপাধ্যায় এবং সদস্যমন্ডলীতে ছিলেন সুধীন মজুমদার, সোমনাথ চক্রবর্তী, বিভাস মুখোপাধ্যায়, প্রণব বন্দোপাধ্যায় এবং অজয় ভট্টাচার্য।

'পুনশ্চ' সংস্থার উদ্যোগে নিয়মিতভাবে আয়োজিত উচ্চমানের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্যসভায়, আলোচনা সভায়, সংগীতানুষ্ঠানে সোৎসাহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক পরিশীলিত সংস্কৃতির আবহ সৃষ্টিতে 'পুনশ্চ'-র কর্মীদের উজ্জীবিত করে

তুললেন। ছাত্র ও যুবসমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত হল 'পুনশ্চ' সংস্থার আর একটি শাখা বিতর্ক পরিষদ। সাহিত্যভাবনা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নিয়ে আয়োজিত হতে লাগল বিভিন্ন সাহিত্যসভা। 'পুনশ্চ'-র কিশোর ঘোষ লেনের দপ্তরে শহরের বিশিষ্ট গুণীজনদের আগমন ঘটত প্রায়শ। এমন কি সেই দিনগুলোতে কলকাতা থেকে বর্ষীয়ান বিদ্বজনেরা কেউ কেউ কোনো ব্যক্তিগত কারণে বহরমপুরে এলে 'পুনশ্চ' দপ্তরের ঠিকানা জেনে নিয়ে চলে আসতেন আসর জমাতে । 'পুনশ্চ'-র প্রযোজনায় গুটিকয়েক একাংক নাটকও অভিনীত হয়েছে। 'পুনশ্চ'-র উদ্যোগে কিশোর ঘোষ লেনের দপ্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি অবৈতনিক পাঠচক্র। সেখানে দেশবিদেশের বাংলা ও ইংরাজিতে প্রকাশিত বহু পত্রপত্রিকা পড়বার সুযোগ পেতেন উৎসাহী আগ্রহী পাঠকেরা।

সুস্থ রুচির বিকাশ আর শিল্প সাহিত্যসংস্কৃতির আধুনিকতা ও সমাজমনস্কতার লক্ষ্যে দীপংকর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 'পুনশ্চ' সংস্থার পরিচালনায় গড়ে তোলা হল 'বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটি' যা কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের কোনো মফঃস্বল শহরে প্রথম আর্বিভাবের গৌরব দাবি করতে পারে। শিল্পের নবতম মাধ্যম চলচ্চিত্র যে চিরায়ত শিল্পের মর্যাদামন্ডিত হয়ে উঠতে পারে, তা দেশবিদেশের বাস্তবভিত্তিক মানবিক আবেদন ঋদ্ধ নান্দনিক গুণসম্পন্ন চলচ্চিত্র দর্শনের শিল্পরসিক শহরবাসী সম্যক উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়ে চলচ্চিত্র আন্দোলনে 'পুনশ্চ'-র প্রয়াসে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানালেন। সদস্যসংখ্যা আশাতীতভাবে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেল। 'পুনশ্চ' তথা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় বেশ কয়েকটি আলোচনাসভা। এরকম একটি সভায় কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি, সিনে ক্লাব অব ইন্ডিয়ার চলচ্চিত্রজগতের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন সোসাইটি আয়োজিত আলোচনাচক্রে চলচ্চিত্ররসিক দর্শক শ্রোতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করেন আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে। সোসাইটির বক্তব্য উপস্থাপনা ও চলচ্চিত্রবিষয়ক আলোচনার মাধ্যম হিসাবে বুলেটিন বা মুখপত্র প্রকাশ করা হত। শুরুতে তা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন দীপংকর, পরে সে দায়িত্ব দেওয়া হয় সোমনাথ চক্রবর্তীকে। গতানুগতিক বিনোদন সর্বস্ব বাণিজ্যিক ছবি দেখার বাইরে নতুন আঙ্গিকে নতুনতর ভাবনায় নির্মিত বাস্তবানুগ মননশীল চলচ্চিত্র দেখার চোখ ও মন তৈরী করে দেবার দায়িত্ব সফলতার সঙ্গেই পালন করতে পেরেছে বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটি, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। ১৯৬৬-র শেষদিক পর্যন্ত দীপংকর ফিল্ম সোসাইটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তারপর মৈত্রেয় ঘটক সম্পাদক পদে বৃত হন।

পুনশ্চ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সূচনা হয় মুর্শিদাবাদ জেলা যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে। এই কমিটির সভাপতি পদে ছিলেন কবি মণীশ ঘটক, সম্পাদক পদে দীপংকর চক্রবর্তী। যুব উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে বহরমপুরের ছাত্র-যুবদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

ছাত্র-যুবদের সম্মিলিত মশাল দৌড়, দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী, নাটক ও যাত্রাভিনয়, গণসঙ্গীত পরিবেশন, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বিতর্ক-আবৃত্তি-সংগীত প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে তখনকার নিস্তরঙ্গ দিনযাপনের ক্ষেত্রে একটি মুক্তির ও প্রাণময়তার পরিবেশ রচিত হয়। ১৯৬৫-র সেই যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুরাতন বোরস্টল স্কুল প্রাঙ্গনে। দীপংকরের তৎপরতায় দ্বিতীয় যুব উৎসবের আয়োজন হয়েছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে মহারাণী কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে।

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বহরমপুরকেও উত্তাল করে তুলেছিল। বিভিন্ন বাম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'পুনশ্চ' সংস্থার কর্মীরাও সে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে মিছিলে আলোড়িত শহরে, গণসঙ্গীত মুখরিত শহরের রাজপথে অন্যদের সঙ্গে 'পুনশ্চ'-র সভ্যদেরও সামিল হতে দেখা গেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণের শিকার ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনগণের সমর্থনে দীপংকর ও তাঁর সহযোগী 'পুনশ্চ'-র সদস্যকর্মীরা নানা সভা-সমাবেশে, মিছিলে-শোভাযাত্রায় উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে এগিয়ে এসেছেন।

১৯৬৭ সালের মধ্যভাগ থেকে 'পুনশ্চ' সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্যধারা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দীর্ঘদিনের কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটে— শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কৃষক অভ্যুত্থানে সৃষ্টি হয় এক ব্যাপক আলোড়ন। দীপংকর তখন অন্যতর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় 'পুনশ্চ'-র এতাবৎকালের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশয়-পীড়িত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবং সেইসঙ্গে তাঁর সহযোগী বন্ধুরাও অনেকে নানা কারণে, মুখ্যত জীবিকার তাড়নায়, স্থানান্তরে চলে যান। এমনিভাবেই দীপংকর চক্রবর্তীর 'পুনশ্চ'-পর্ব পরিসমাপ্তির পথে চলে যায়।

একথা অনস্বীকার্য যে দীপংকর 'পুনশ্চ' সংস্থা স্থাপনার মধ্যে দিয়ে যে বহুমুখী কর্মধারার ব্যাপ্তি ঘটিয়েছিলেন, তা তাঁর প্রিয় ধাত্রী শহরের বুকে এক নতুন প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করেছিল। এই সংস্থার প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনিই। দীপংকর বেদনাতুর দৃষ্টিতে দেখে গেছেন, 'পুনশ্চ' পর্বের তাঁর একদা ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহযোগীরা অনেকেই একে একে চলে গেছেন। অবশেষে চলে গেলেন দীপংকরও। সন্দেহ নেই, তাঁর মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি ঘটল বর্ণময় কর্মময় উজ্জ্বল এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# দীপংকরদাকে যেমন দেখেছি

সুকান্ত রাহা

দীর্ঘ ২০০ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন-আধা সামন্ততান্ত্রিক-আধা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ মাত্র ২০ বছরের মধ্যে এক চরম অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ফলে বহু লড়াই আন্দোলনের পর ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের দিকে দিকে এবং তার ফলে হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী শাসকশ্রেণীর আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। লাঠি-গুলি-গুমখুন এবং সন্ত্রাস নেমে এসেছিল ছাত্র-যুব, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের উপর। হাজার হাজার জনতা বিনা বিচারে জেলবন্দী হয়েছিলেন।

এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জরুরি হয়ে পড়েছিলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ভারতের সর্বত্র গড়ে উঠেছিল Civil Liberty Movement বা Legal Aid Movement, পশ্চিমবঙ্গেও জয়শ্রী রানা প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে উঠে Legal Aid Committee। পরবর্তীতে কপিল ভট্টাচার্য্য, সঞ্জয় মিত্র, দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে উঠে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)। বহরমপুর শহরে এই সংগঠনগুলির কার্যকলাপ প্রথম থেকেই শুরু হয়। এর পুরোধা ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী, তার সম্পাদনায় 'অনীক' পত্রিকা ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিবেশী দেশগুলির উপর সম্প্রসারণবাদী এবং জাতিসত্তাগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

পূর্ববাংলার জনগণ পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মৌলানা ভাসানী ও মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ভাসানীকে সামনে রেখে সেখানকার জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলি পাকিস্তানের আধিপত্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও মুক্তির আন্দোলন সংগঠিত করেন। দীপংকরবাবু এই দলগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ওপার বাংলার মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লবীদের তাঁর আশ্রয়ে রাখতেন। আলাপ আলোচনা চালাতেন। তাঁদের লেখা, তাঁদের লড়াইয়ের সমর্থনে লেখা ছাপতেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে পূর্ববাংলার বিপ্লবীদের এই যৌথ কার্যকলাপ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা খুব সুনজরে দেখতেন না।

এমতাবস্থায় ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়লো। যে কোনো আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হল কে প্রকৃত শত্রু কে প্রকৃত মিত্র তা বাছাই করা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই সময় সেই ফ্যাসিবাদী অগণতান্ত্রিক অবস্থার বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর মধ্যকার বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকেও সংগঠিত করার প্রয়াস চালানোর ক্ষেত্রে দীপংকর চক্রবর্তী যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, গণতান্ত্রিক মানুষজনকে এ ব্যাপারে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সমস্ত শক্তিগুলিকে সমবেত করেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ব্যাপকতা লাভ করে। সত্তর দশকের ফ্যাসিবাদী আক্রমণ বা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে *অনীক* পত্রিকা সাহসের সাথে সোচ্চার হয়।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ৭ই জুলাই ১৯৭৫ অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী ও আমাকে বহরমপুর শহর থেকে রাতের অন্ধকারে গ্রেপ্তার করা হল। D.I.R (Defence of India Rule) আইনে দু মাস পরে বিচারে যখন দেশদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণ করা গেল না তখন 16A MISAতে (কেবলমাত্র জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই আইন) তাদের আটকে রাখা হল। সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় এদেরকেই জরুরি অবস্থাকালীন 16A MISA-তে আটক রাখা হয়েছিল।

ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রেক্ষাপট ছিল শাসক শ্রেণীর দলগুলির মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ, ভারতবর্ষ তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের লড়াই এবং দখলের বধ্যভূমি। যার ফলে জরুরি অবস্থাকালীন ইন্দিরা গান্ধীর পাশে ভারতবর্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার পেটোয়া দলগুলির সমর্থন থাকায় CPM বা CPI-র মত রাজনৈতিক দলগুলির উপর তীব্র আক্রমণ নেমে আসেনি। অপর দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী শক্তিগুলি এবং গণতান্ত্রিক মানুষগুলিই ছিল জরুরি অবস্থা বা তার প্রাক্কালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের শিকার। জাতীয় স্তরে জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই বা অটলবিহারী বাজপেয়ীর মত নেতৃস্থানীয় শত শত রাজনৈতিক ব্যক্তিরা, অন্যদিকে সাংবাদিক-সাহিত্যিক, গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্তের মত খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা ছিল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। *অনীক* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দীপংকর চক্রবর্তীও এই সময়েই গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার করার পর দীপংকরদা ও আমাকে একটি বড় হলঘরে থাকতে দেওয়া হয় আরও ১০/১২ জনের সাথে। তারা প্রত্যেকেই জরুরি অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। এদের মধ্যে একজন উকিল ও একজন সাংবাদিক ছিলেন।

এদের অধিকাংশই ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাথে যুক্ত। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা জয়ন্ত রায়কে কয়েক দিনের জন্য আটকে রাখা হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। আমাদের কেউ কেউ Division বন্দীর মর্যাদা পেয়েছিলাম। আমাদের খাবারের মানটাও ছিল কিছুটা ভাল। দীপংকরদার উদ্যোগে সকলের খাবার একত্র করে যৌথভাবে খাওয়া দাওয়া করতাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দুটি সেলে রাখা হল আরও কয়েকজন নকশাল বন্দীর সাথে। পরে জানা গেল যে কলকাতার কোন এক সেন্ট্রাল জেলে বন্দীরা জেল ভেঙে পালানোর কারণেই শাসকশ্রেণী আতঙ্কিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে পর্যন্ত আমাদের বাইরের জগতের সঙ্গে একটা ক্ষীণ সম্পর্ক ছিল পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন বইপত্রের মাধ্যমে। এছাড়া জেলের অভ্যন্তরে অত্যন্ত মূল্যবান একটি লাইব্রেরি ছিল। আমরা সেটি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হল। স্নান এবং প্রাতঃকৃত্যের জন্য সেলের বাইরে বেরোতাম। এ অবস্থার বিরুদ্ধে সে সময় দীপংকরদার নেতৃত্বে অনশন আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। এই আন্দোলনে রাজনৈতিক বন্দী ছাড়াও অন্যান্য অপরাধের সাথে যুক্ত বন্দীরাও সামিল হয়েছিলেন জেলের বিভিন্ন বঞ্চনা এবং অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে— আন্দোলন সফলও হয়েছিল। সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা জেলের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে। জেলে দীর্ঘ বাইশ মাস আটক থাকাকালীন শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতির গ্রন্থ বাইরে থেকে আনিয়ে এবং জেলের অত্যন্ত মূল্যবান লাইব্রেরিকে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত তিনি অধ্যয়ন করতেন। এছাড়াও পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চালাতেন। অতি-বামপন্থী বন্দী, যারা সশস্ত্র গেরিলা আক্রমণ এবং ব্যক্তিখতমের রাজনীতিকে একমাত্র জনযুদ্ধের পথ বলে মনে করতেন, তাঁদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতি, দৃঢ়তা এবং মার্কসবাদ, লেনিনবাদকে উদ্ধৃত করে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতেন। এঁদেরকেও জেলে অনশন আন্দোলনে সামিল করা সম্ভব হয়েছিল। কখনও রাতের দিকে সকলে মিলে গণসঙ্গীত গাওয়া হত। দীপংকরদার উদাত্ত কণ্ঠ সকলকে মুগ্ধ করত। সকলকে গণসঙ্গীত গাইতে অনুপ্রাণিত করবার জন্য তাঁর সংগৃহীত গণসঙ্গীতের খাতা বাড়ি থেকে আনিয়ে নিয়েছিলেন।

"৯০ শতাংশ জনগণ বিপ্লবের পক্ষে"— মাও সে তুং-এর এই বাণী মনে রেখে জেলের নিম্নস্তরের কর্মচারীদের (জেলওয়ার্ডার, হাবিলদার) আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধু করা সম্ভব হয়েছিল তাঁরই প্রচেষ্টায়। তাদের সাহায্যে জরুরি অবস্থাকালীন বাইরের জগতের খবরাখবর এবং পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। দেশ-বিদেশের যে সমস্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে খবরাখবর তাদের মাধ্যমেই পাওয়া যেত। এই যে সকলকে নিয়ে পথ চলা— এই যে গুণ— তাকে একজন সুসংগঠক হিসেবে পরিচিতি দিয়েছিল।

ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথম থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নির্বাচন বয়কটপন্থীদের থেকে আলাদা। 'অনীক'-এ প্রকাশিত দীপংকরবাবুর বক্তব্য বয়কটপন্থীদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে সমর্থন করেছিলেন। তার বক্তব্য নকশালপন্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে বিতর্কে অনেক রসদ জুগিয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে জ্বলন্ত বিষয় হিসেবে দেখা দেয় জরুরি অবস্থার পরবর্তী কালে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, ছাত্র অবস্থায় '৬৫-৬৭ সালে আরো অনেকের সাথে আমরাও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ ও সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন চরম ভাঙনের মুখে। আমরা বিভ্রান্ত। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী আন্দোলনে মতাদর্শগত বিতর্কে দীপংকর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় *অনীক* পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নেভিল ম্যাক্সওয়েলের 'India's China War' বা ফেলিক্স গ্রিনের 'The Wall Has Two Sides' গ্রন্থের লেখাগুলি তাঁর সহায়তার আমরা অধ্যয়ন করার সুযোগ পাই। চীন-ভারত যুদ্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে এই বইগুলি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। ছয়-এর দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুব উৎসব সংগঠিত হয় বামপন্থী আদর্শ প্রচারের মঞ্চ হিসেবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির বাণী এই মঞ্চ থেকে প্রচার করাই উদ্দেশ্য ছিল। বহরমপুরে দীপংকরবাবু সহ একদল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী যুবক যুব-উৎসব সংগঠিত করে এবং এই মঞ্চ থেকে বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা প্রচার করেন। যুদ্ধের শান্তির আন্দোলনকে একপেশেভাবে না দেখে অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করাই লক্ষ্য ছিল। ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধের সংগ্রামগুলিকে সমর্থন জানানো হয় এই মঞ্চগুলি থেকে। এই সময়েই *অনীকের* পাতায় চীনের বিখ্যাত উপন্যাস "Song of Wang Hye" 'বিপ্লবের গান' নামে তিনি অনুবাদ করেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এই উপন্যাসখানি। অনুবাদক হিসেবে তাঁর দক্ষতা বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে সে সময়।

দীপংকরবাবু অনেকের মত বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষ ও চীন— তৃতীয় দুনিয়ার এই বৃহৎ প্রতিবেশী দুই দেশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিবাদে যুক্ত থাকলে উভয়ের বিকাশই ব্যাহত হবে। সেখান থেকে ভারতে অনেকের মতো এই জেলায় ভারত চীন মৈত্রী সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ডাঃ বিজয় বসু, ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ভক্তিভূষণ মন্ডলকে এনে

সাফল্যের সাথে সভার আয়োজন করেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'ডঃ কোটনিস কী অমর কাহানী' প্রদর্শন করেন। এইসব কার্যকলাপের উদ্দেশ্যই ছিল দুই দেশের মধ্যে সুস্থ বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি করা।

ছয়-এর দশকের প্রথমে বহরমপুরে ফিল্ম সোসাইটি গঠন করে প্রগতিশীল ছবি প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভাল দর্শক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

*অনীক* প্রকাশের বছর খানেক আগে 'পুনশ্চ' নামে একটি পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) তারই উদ্যোগে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর সাথে 'পুনশ্চ' নামে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তার উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। এই একই ভাবধারায় সত্তরের শেষে, আশির দশকের প্রথমে 'সংস্কৃতি পরিষদ' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সুস্থ সংস্কৃতির প্রয়োজনে গান, নাটক ছাড়াও বামপন্থী, প্রগতিশীল ভাবধারায় শিক্ষিত জনগণ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই সংস্থার মধ্য দিয়ে বিতর্ক সভা, আলোচনা (seminar) আয়োজন করা উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসবিদ বরুণ দে, গৌতম ভদ্র, অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ রতন খাসনবিশ, দেবনাথন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সন্তোষ রানা, ভাস্কর নন্দী এবং আরও অনেককে বক্তা হিসাবে বহরমপুরে এনে অনুষ্ঠান করা হতো তাঁরই উদ্যোগে, সেই সময়ে এই অনুষ্ঠানগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। কোনো ধরণের ধর্মাচরণেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। অলৌকিকতা বা আধ্যাত্মিকতাতে কখনই তার বিশ্বাস ছিল না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি এগুলি পরিহার করে চলেছেন। যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর সদিচ্ছা বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রকাশ পেত। বইমেলা আয়োজনের সময়ে যুক্তিবাদী বই প্রকাশনার সাথে যুক্ত স্টলগুলির আয়োজনে তার বিশেষ নজর থাকতো। সিংহলের যুক্তিবাদী আন্দোলনের খ্যাতনামা ব্যক্তি ডাঃ কভুরের লেখা তার মাধ্যমেই সংগ্রহ করার সুযোগ পাই। প্রবীর ঘোষ সহ বহু যুক্তিবাদী লেখকের বইয়ের সম্ভার যাতে বইমেলায় থাকে তার জন্য তিনি সচেষ্ট থাকতেন। যুক্তিবাদী মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা তার অন্যতম কাজের বিষয় ছিল। এই উদ্দেশ্যেই সংস্কৃতি পরিষদের মাধ্যমে অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিতর্ক ক্লাসের আয়োজন করেন। এই সময়েই তাঁর সম্পাদনায় জেলা থেকে সমীক্ষামূলক পাক্ষিক পত্রিকা 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

জীবনের অধিকাংশ সময়ে দীপংকরবাবুর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা। মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যালঘু-প্রধান অঞ্চল। প্রায় ৭০ শতাংশ জনগণ এ জেলায় মুসলিম। এ জেলার মানুষের সাম্প্রদায়িক ঐক্য দীর্ঘ দিনের। জেলার শিক্ষিত মুসলিম জনগণের আগ্রহেই মুর্শিদাবাদ জেলা বহু টানাপোড়েনের পর ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে কখনো কখনো কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের দুরভিসন্ধির ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংকটাপন্ন হয়। '৭০ দশকের প্রাক্-মুহূর্তে গ্রামাঞ্চলে কিছু গুজবের ফলে বহরমপুরে দুই সম্প্রদায়ের কিছু দুষ্কৃতি, বিশেষ করে হিন্দু মৌলবাদীরা, অশান্তির প্রচেষ্টা চালায়। বহরমপুরে এক সংখ্যালঘু ব্যক্তির সাইকেলের দোকান লুঠ হয়। চরম দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রচেষ্টায় সংখ্যালঘু জনগণ ও ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত করা হয়। দীপংকরবাবুর এক্ষেত্রে উদ্যোগ ও ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। ১৯৮৮ সালে সালের পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক স্থান, Heritage ভবন কাটরার মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম এবং হিন্দু মৌলবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও *অনীক* পত্রিকার মাধ্যমে দীপংকর চক্রবর্তী সোচ্চার হন।

জেলের ভিতরে হোক বা জেলের বাইরে সর্বত্রই বহুমাত্রিক এই মানুষটি কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। বহু কাজ করেছেন সমাজ বিকাশের স্বার্থে। কিছু ব্যক্তির অভিযোগ ছিল, উনি কোনো দলের সাথে যুক্ত না হয়ে ব্যক্তি হিসেবে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন ও সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতেন, যা সম্পূর্ণই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু কোনো দলের সাথে যুক্ত না থেকেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুঙের চিন্তাধারায় ভারতবর্ষকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশ হিসেবে এবং সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের ভাবধারায় যে সমস্ত গোষ্ঠী বা দল কাজ করতেন, তাদের বৃহত্তর কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থেকে বন্ধুর মতো আচরণ করতে তাঁকে দেখেছি। যা ছিল সম্পূর্ণ বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের পরিচয়। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার মাধ্যমে এই গোষ্ঠীগুলির সহায়ক শক্তি হিসেবেই তিনি কাজ করেছেন।

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক এবং সু-সংগঠক। অত্যন্ত অল্প সময়ে সমস্ত বয়সের মানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন। ছয়ের দশকে মফঃস্বল শহরের মতো জায়গায় তাঁর সামাজিক অবস্থান থেকে সকলের সাথে সহজ হয়ে মেলামেশা করার ক্ষমতা ছিল বিরল দৃষ্টান্ত। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন— তাঁর বিরোধী ও সমালোচকরা সহ— সকলেই তাঁকে বহুদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন, এ আমার বিশ্বাস।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# মৃত্যু-হীন প্রাণ

**অপরেশ চট্টোপাধ্যায়**

দীপংকর দা নেই!

শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন বুকে নিয়ে সেই লক্ষ্যে মানুষের চেতনার মশালকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে আমৃত্যু নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে মানুষটি; যে মানুষটি কর্মে ও কথায় আত্মীয়তা অর্জনের জন্য সাহস ও আত্মত্যাগ-এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন— সেই দীপংকরদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

সেই আটের দশকের শেষ ভাগ থেকে দীপংকরদার সঙ্গে আমার পরিচয়। সাংস্কৃতিক মানবাধিকার আন্দোলন, সাংবাদিকতা ও সাংবাদিক সংঘের বিভিন্ন কার্যকলাপে একসাথে থেকেছি, মিছিলে পা মিলিয়েছি। মতামত জানতে চাওয়া, কখনো সমালোচনাকে স্বীকার করে নেওয়া, ভুলত্রুটি, কর্তব্যে গফিলতি হলে বকুনি খাওয়া, আবার সবশেষে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও কাছে টেনে নেওয়ার আন্তরিকতা— এসবকিছুই দেখে আমার মনে হয়েছে দীপংকরদা জন্মগতভাবেই ছিলেন একজন নেতা। নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ তাঁর সহজাত। অজস্র স্মৃতি আজ ভিড় করে আসে মনে। প্রথমে কান্দিতে দীপংকরদার কিছু কথা বলি ঃ—

১। সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি বিষয়ক একটি আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে দীপংকরদাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম কান্দিতে। একাই কান্দি স্কুলে ঢুকে এসেছিলেন, বলেছিলেন, 'তুমি কান্দি চেনাচ্ছ? কান্দিতে অল্প কিছুদিন ছিলাম— থানার কাছাকাছি। তখন আমি খুব ছোট।' সেই সভায় উপস্থিত সকলে তাঁর বক্তব্য ও জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

২। তারও আগে কান্দির কোরাস নাট্য গোষ্ঠীর গৃহে (ঘোষালের হোটেল) কয়েকটি আলোচনাসভায় এসেছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস-এর মৃত্যুর পর কান্দি পৌরসদনে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয় কোরাসের উদ্যোগে। সেই সভায় ছিলেন কবি সমীর রায় ও দীপংকরদা। ধুতি পরিহিত মানুষটির বক্তব্য সেদিন আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। পরবর্তীতে পেয়েছিলাম *অনীক*-এর হেমাঙ্গ বিশ্বাস সংখ্যা।

৩। ১৯৮৮ এর মার্চে কান্দি স্কুলে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্মেলনে এসেছিলেন। সে সময়টা সাংবাদিক সংঘের পক্ষে ভাল ছিল না। তিনি শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন।

৪। ১৯৮৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কান্দি ও ফরাক্কা ইউনিট (এপিডিআর)-এ এসেছিলেন। কান্দির বিধান সংঘ হলে তাঁর উপস্থিতিতেই কান্দি কমিটি গঠিত হয় এবং আমাকে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। তারপর কয়েকটি সম্মেলনেই কান্দি এসেছিলেন। APDR-কে শক্তিশালী করা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

৫। কান্দি শাখা গঠিত হবার পর একাধিক সেমিনারের আয়োজন করি আমরা। যেমন : ১৯৯৬-এ মার্চ মাসে 'পুলিশ ও মানবাধিকার', ১৯৭৭ সালে 'গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস', ২০০১-এ ১৭ই ডিসেম্বর 'বিশ্বায়ন ও মানবাধিকার', ২০০৬-এ ৯ ডিসেম্বর 'সিঙ্গুর শিল্পায়ন ও মানবাধিকার'। এ সেমিনার গুলিতে তাঁর উপস্থিতি, বক্তব্য এবং সহযোগিতা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অমিতদ্যুতি কুমার, তাপস চক্রবর্ত্তী, পার্থ মুখার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৬। ১৯৯২ সালে হরিহর পাড়া গণহত্যাকাণ্ডের (৭ জন নিহত হন) প্রতিবাদে কান্দি বাসস্ট্যান্ডে একটি পথসভা সংগঠিত করা হয়। সেই সভায় APDR এর ছাপানো পুস্তিকা (তদন্ত রিপোর্ট ) বিলি করা হয়। দীপংকরদার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য অনেকেই প্রশংসা করেন।

৭। পর্বতপুর একটি অজ গ্রাম। উদয় চাঁদপুরের কাছাকাছি। পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে দীপংকরদা সেখানেও হাজির। শুধু হাজির থাকাই নয়, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বক্তব্যও রেখেছিলেন। কান্দি থেকে আমিও ছিলাম সেই প্রতিবাদী সভায়।

৮। কান্দিতে 'নবজাগরণ'-এর একটি সভা হয় কান্দি স্কুল সংলগ্ন মাঠে। বাংলা ভাষার দাবিতে 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক ও দীপংকরদার ছাত্র অশোক দাশগুপ্ত তাঁকে বহরমপুর থেকে তুলে নিয়ে আসেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। হিন্দীর আধিপত্যের অবসান ও বাংলা ভাষার সর্বত্র প্রচার ও প্রসার, সরকারি কাজকর্মে বাংলা চালু করার কথা সংক্ষেপে বলেন।

৯। কান্দি রাজ উচ্চবিদ্যালয়ের সার্ধ শতবর্ষে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়। ২০০৯-এ সেই বিতর্ক সভায় শরীরে জ্বর নিয়েও বক্তব্য রাখেন, অন্যদের বক্তব্য শোনেন, তাঁর চাঁছাছোলা যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য মানুষের হৃদয়গ্রাহী হয়। বিতর্কসভায় যাবার পূর্বে তিনি রাস্তাতেই বসে পড়েন কান্দি এপিডিআর-এর মানবাধিকার অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল কান্দি বিশ্রামতলায়।

একটা মানুষ— কলেজে শিক্ষকতা করেছেন, *অনীক*-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ* পত্রিকা চালাচ্ছেন, জেলা সাংবাদিক সংঘ নিয়ে কার্যকলাপ চালাচ্ছেন। এতরকম কাজ সবকিছু ঠিকঠাক চালানোর পরও দীপংকরদা জেলার সর্বত্র ঘুরছেন। কর্মসূচি নিচ্ছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন কর্মীদের— এ আমার কাছ থেকে দেখা— গল্প নয়।

তাঁর মুখে কোনদিন জেল জীবনের (১৯৭৫-৭৭) গল্প শুনিনি। অনেকেই জেল জীবনের কথা নিয়ে প্রচার পেয়েছেন। দীপংকর দা ছিলেন ব্যতিক্রম।

আমাদের 'অঙ্গাঙ্গি' পত্রিকায় তাঁকে জেলজীবনের উপর লিখতে

বলেছিলাম। অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য পারেন নি। জানিয়েছিলেন— ''বাংলাদেশ'' নামক সাপ্তাহিক কাগজে লিখেছিলাম। পত্রিকাটি পাচ্ছি না। তবু লেখা দেব। একটু সময় দাও।''

না, আর লেখাটি লিখে উঠতে পারবেন না দীপংকর দা! তাঁর লেখা মহাশ্বেতা দেবীর উপর প্রবন্ধ এবং সর্বশেষ 'অঙ্গাঙ্গি'-তে লিখেছেন কবি সব্যসাচী দেবের উপর। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের লেখা ছাপিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আমাদের পত্রিকা প্রকাশ করা, সাংবাদিকতা করা এসব কিছুই দীপংকরদার দ্বারা প্রভাবিত। 'বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' প্রকাশিত হয়েছে। 'বিষয় নগর-সংস্কৃতি'। আমি বহরমপুর-কেন্দ্রিকতার সমালোচনা করলে তিনি স্বীকার করে নিয়ে আমাকেই কান্দির উপর লিখতে বলেন। সেই থেকে আমি মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ এর নিয়মিত লেখক ও সাংবাদিক হয়ে গেলাম। '৯০ এর পর দশকের প্রথম থেকেই। হিজল বিল, ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকত, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে অনেক লেখাই লিখিয়ে নিয়েছিলেন। দীপংকরদার হাতে লেখা পত্রগুলো রাখা আছে সযত্নে। ভাল হলে 'অসাধারণ', কখনো ফোনে 'খুব ভালো' বলে উৎসাহিত করেছেন। এগুলি একান্ত ব্যক্তিগত হলেও আমার কাছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। মুর্শিদাবাদ জেলার জনজীবনের প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ ছিলেন বললে ভুল হয় না। কলকাতা যাওয়ার পূর্বে জেলা সাংবাদিক সংঘের একটি সভায় সম্পাদকমন্ডলী গঠন করে যান— যাতে মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ প্রকাশিত হতে পারে।

জেলা সাংবাদিক সংঘে ১৯৮২-৮৬ সালে এবং নব্বই দশকের তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ইতিহাস হয়ে আছে। সাংবাদিকদের মানোন্নয়ন -এর প্রচেষ্টা, বানানের উপর কর্মশালা আয়োজন, চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী ভূমিকা, ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সমস্যা নিয়ে তাঁর ভূমিকা আমার মনে চিরকাল অমলিন থেকে যাবে।

বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় APDR এর উদ্যোগে গোরাবাজার নিমতলা থেকে খাগড়া নেতাজী স্ট্যাচু পর্যন্ত এক দীর্ঘ পদযাত্রা হয়। পদযাত্রা শেষে নেতাজী স্ট্যাচুর কাছে— দীপংকরদার বক্তব্য সত্যিই অসাধারণ। মালদা রাজ্য সম্মেলনে (APDR) রাত জেগে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব রচনা করা দেখেছি দীপংকরদার। আমি এবং সুভাষ পান্ডে ছিলাম তাঁর সাক্ষী। যা করতেন, আলোচনা করেই করতেন। গণতান্ত্রিকতাকে মূল্য দিতেন বেশি। মালদাতেই আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তানিয়া রায় চৌধুরী, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য-এর। তানিয়া দেবীকে বলতে শুনেছি ঃ 'দীপংকর বাবুকে আমি অনুবাদক হিসেবে চিনি। বিপ্লবের গান - অসাধারণ অনুবাদ। আমার আশংকা ছিল এই অনুবাদক হারিয়ে যাবে না তো?'' দীপংকরদার হাসিমুখটা আজ বড়ো মনে পড়ে। পরবর্তীকালে দীপংকরদা ইন্দ্রপ্রস্থের বাড়িতে বলেছিলেন : ''অনুবাদের জন্য অনেকেই এসেছিল, পয়সা দেবে বলেছিল। আমি রাজি হই নি।'' *আজকাল*-এর সম্পাদক ও ছাত্র অশোক প্রস্তাব দিয়েছিল *আজকাল*-এর মুর্শিদাবাদ সংস্করণ বের করার। তার সম্পাদক হিসেবে আমাকে বলেছিল। আমি রাজি হই নি।''

আমি বিভিন্ন সময়ে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম। প্রশ্ন ও উত্তরগুলো একটু বলি :

*প্রশ্ন*: আপনার বাড়িটি কি চীন থেকে আসা টাকায় নির্মিত?

*দীপংকর চক্রবর্তী* : আমি লোন করে বাড়ি করেছি। সম্পূর্ণ মিথ্যা অপপ্রচার।

*প্রশ্ন* : আপনার *অনীক* পুড়িয়ে দিয়েছিল নকশালরা। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

*দীপংকর চক্রবর্তী* : হ্যাঁ, নকশালবাড়িব কৃষি লড়াই-কে সমর্থন করেছিলাম। খুন-হত্যাকে সমর্থন করিনি। তাই *অনীক* পুড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ৭২-৭৩ সালে তোমাদের ভরতপুর থেকে রঙ্গলাল এসে দোষ স্বীকার করে যায়।

*প্রশ্ন* : আপনাকে আনন্দবাজারে লিখতে বললে লিখবেন?

*দীপংকর চক্রবর্তী* : অবশ্যই। তবে শর্ত একটাই। আমার লেখা পরিমার্জন, পরিবর্তন করা যাবে না। যতটুকু সুযোগ আছে সেইটুকুও নিতে হবে মতাদর্শ প্রচারে। সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এক্ষত্রে থাকা ঠিক নয়।

*প্রশ্ন* : আপনার অবর্তমানে এইসব বইপত্রের কী দশা হবে?

*দীপংকর চক্রবর্তী* : হ্যাঁ। রামমোহন ফাউন্ডেশন লাইব্রেরির কথা ভাবা যেতে পারে। তবে এখনই এসব ভাবছি না।

*প্রশ্ন* : আপনার লেখাগুলো নিয়ে পিবিএস থেকে বই বের করুন? (*অনীক*-এর পাঠক সভা সাংবাদিক সংঘের দ্বিতল, মার্চ ২০১২)

*দীপংকর চক্রবর্তী* : বেরুবে। তবে পিবিএস- কে বলবো না। দেখি, অন্য প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে করবো।

*অনীক*-এর পাঠকসভার পর প্রতিমাসেই একবার করে ফোনে কথা হতো। শেষ ফোন পাই রাত্রি ৯-৩০ টায়। ২৪শে জানুয়ারি। অনীক এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা বেরুতে দেরি হবে। বললেন। তারপরই ২৭শে জানুয়ারি রাত্রে বহরমপুর থেকে ফিরে টিভি-তে দেখলাম দীপংকর চক্রবর্তী প্রয়াত! মনটা বিষণ্ণতায় ভরে গেল। কান্দিতে শোকমিছিল করলাম ২৯শে জানুয়ারি। ১৭-ই ফেব্রুয়ারি কান্দি গার্লস স্কুলে APDR এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি (২০১৩) একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে তাকে স্মরণ করলাম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

বড় ফাঁকা লাগে এখন। মনে হয় বিরাট শূন্যতা ঘিরে আছে আমাকে। সবসময় যাঁর পরামর্শ পেতাম, সহযোগিতা পেতাম, পাশে দাঁড়াতেন, বিপদে সাহস যোগাতেন, সেই মানুষের অনুপস্থিতিতে তো শূন্যতার সৃষ্টি হবেই। মানুষের অধিকার ও বেঁচে থাকার উপর যখন নেমে আসছে রাষ্ট্রের লাগামহীন সন্ত্রাস, বাম দলগুলি যখন দিশাহীনতায়, সংকীর্ণতায় কম বেশি আক্রান্ত সে সময় দীপংকরদার প্রস্থান আমার কাছে সীমাহীন বেদনাদায়ক!

# সাংবাদিকতার আলোকে দীপংকর চক্রবর্তী

সাবিত্রী প্রসাদ গুপ্ত

অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী ১৯৬৪ সালে আমাদের শিক্ষক রূপে জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। সেই সময় থেকেই শিক্ষকরূপে দীপংকর চক্রবর্ত্তীকে আমি অতি কাছ থেকে দেখা ও চেনার সুযোগ পাই। বিগত ষাটের দশকের গোড়ায় বহরমপুরে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পুনশ্চ'-র জন্ম হয় দীপংকর বাবুর নেতৃত্বে। এই সংস্থার নামেই প্রকাশিত হয় একটি আধুনিক চিন্তা সম্পন্ন পত্রিকা, দীপংকর চক্রবর্তীর সম্পাদনায়। পরে এই 'পুনশ্চ' সাংস্কৃতিক সংস্থার অধীনে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে জন্ম হয় 'বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটির'। এই নবগঠিত সোসাইটিরও সম্পাদক ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। 'পুনশ্চ' সাহিত্য পত্রিকাটি পরে 'অনীক' নামে প্রকাশিত হয় যা আজও সমান ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পরবর্তীকালে অধ্যাপক দীপংকরবাবুর নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে যুব উৎসব, (১৯৬৫ সাল), বহরমপুর ডিবেটিং সোসাইটি, বহরমপুরে প্রথম বইমেলা, সংস্কৃতি পরিষদ, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি, বাংলাভাষা আন্দোলনের স্মরণে গঠিত ২১ শে ফেব্রুয়ারি উদ্যাপন কমিটির সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী কালে আটের দশকের গোরায় তিনি সাংবাদিকতায় যোগ দেন। যদিও সাংবাদিকতা তাঁর পেশা ছিল না, ছিল নেশা। প্রথমে 'অনীক' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে ও পরে 'মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা' তথা 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' পত্রিকার প্রতিনিধি রূপে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের এক সংকটজনক অবস্থায় সভাপতির গুরুদায়িত্বে এগিয়ে আসেন। সেই থেকে শুরু হয় জেলা সাংবাদিক সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগ। সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তীকে সম্যক ভাবে জানতে হলে তাঁর উপরোক্ত সাংস্কৃতিক পটভূমিকা অবশ্যই জানার প্রয়োজন। তাঁর সকল সাংবাদিকতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ঐ সব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের জন্ম ১৯৪০ সালে। এর প্রথম সভাপতি জেলার প্রখ্যাত আইনজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন সাংসদ শশাঙ্কশেখর সান্যাল এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন শোভেন্দ্র মোহন সেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত হয় 'The Murshidabad News' একটি স্বল্প আয়ুর সংবাদপত্র। মাত্র দুবছর চলার পর রাজরোষে ঐ পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটলে ১৮৪০ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয় 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদ পত্রী' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র। ঐ পত্রিকাটিও একই কারণে মাত্র একবছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। তার পর বহরমপুর তথা জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক ছোট ছোট পত্রিকা প্রকাশিত হলেও সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় বহরমপুর থেকে 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' নামে সংবাদপত্র। এই পত্রিকাটি শতবর্ষ প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে ১৯১৪ সালে দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) সম্পাদিত 'জঙ্গীপুর সংবাদ' প্রকাশিত হয় জঙ্গীপুর থেকে এবং ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় কান্দী থেকে 'কান্দী বান্ধব' পত্রিকা। এই দুই পত্রিকা আজ শতবর্ষের দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

আজ থেকে শতবর্ষ আগে সাংবাদিকতাকে পেশাগত ভাবে নেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না মফঃস্বল বাংলায়। শিক্ষক, আইনজীবী প্রভৃতি পেশার মানুষজন আংশিক সময়ের জন্য অবৈতনিক সাংবাদিকতার ভূমিকা পালন করতেন। তাও তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

স্বাধীনতা-পূর্ব সাংবাদিকতা ছিল অনেকটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রামের সহায়ক। ফলে সাংবাদিকদের নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সেসময় অনুভূত হয়নি। তাই ১৯৪০ সালে জেলা সাংবাদিক সংঘ গড়ে উঠলেও সদস্যগণ বেশিরভাগই ছিলেন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত অবৈতনিক ও আংশিক সময়ের সাংবাদিক।

১৯৪০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হতে থাকে। বিগত আটের দশকের গোড়ায় দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয় এবং পরে তার নাম পরিবর্তন করে 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ নামে আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তবে বর্তমানে সম্পাদক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র সরকার। ইতিপূর্বে ছ'এর দশকে প্রকাশিত এবং দীপংকর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত 'পুনশ্চ' সাহিত্য পত্রিকাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে 'অনীক' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। দীপংকর বাবু সেই 'অনীক' পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে জেলা সাংবাদিক সংঘের এক সংকটময় মুহূর্তে জেলা সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন ১৯৮২ সালে। পরবর্তীকালে 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করেন। জেলার সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব দীপংকর বাবুর যোগ্য পরিচালনায় সেসময় সাংবাদিক সংঘ বিপদমুক্ত হয় এবং গতিশীলতা লাভ করে এবং ঐ পদে তিনি দীর্ঘদিন বহাল থাকেন।

দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ'

পত্রিকাটিকে তিনি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন করে গড়ে তোলেন। এই পত্রিকায় নিছক সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও বিভিন্ন সমীক্ষাধর্মী রচনা ও বিশ্লেষণমূলক উচ্চ মানের প্রবন্ধ সমন্বিত ছিল। পত্রিকাটির এই ধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি আজও একই ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে সময় দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা সংগ্রহে রাখার মতো বিভিন্ন প্রবন্ধ ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশন পত্রিকাটিকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে। পত্রিকাটি আজও একটি উন্নত মানের পত্রিকা হিসাবে জেলার পাঠকবর্গের কাছে সমান সমাদৃত।

এরপর বেশ কিছুদিন সাংবাদিক সংঘ সুষ্ঠুভাবে চললেও ১৯৯৭ সালে সাংবাদিক সংঘ সাংগঠনিক কারণে বিপদগ্রস্ত হলে মাঝে কয়েক বছর পর তিনি পুনরায় সভাপতির পদে যোগ দিয়ে সংগঠনকে বিপদমুক্ত করে স্বাভাবিকভাবে পথ চলার সুযোগ করে দেন।

দৃঢ়চেতা ও স্পষ্টবক্তা দীপংকর বাবুর ভাবনা সাংবাদিকতার ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেছিল। তাঁর লেখালেখির মধ্যে এই গুণগুলি ফুটে উঠত। বিভিন্ন বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা, সেমিনার ও বিতর্ক সভা পরিচালনায় তাঁর ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

দীপংকর চক্রবর্তীর সভাপতিত্ব করা কালে বিগত আট-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসারের ফলে সাংবাদিকদের কাজের ক্রমশ পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা পেশাগত রূপ ধারণ করে। ফলে সাংবাদিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক সংঘের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ফলে সাংবাদিক সংঘের কর্মচঞ্চলতা বাড়ে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রের প্রকৃত অবস্থা যাচাই ও তার সমস্যার প্রতিকার কল্পে সরকার একটি Facts Finding Committee গঠন করে, যার সরকারি বিজ্ঞপ্তি নং ১৮৬৪/আইসিএ, তারিখ ৬/৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশিষ্ঠ আইনজীবী ও প্রাক্তন সাংসদ শশাঙ্ক শেখর সান্যালকে। এই কমিটি তার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে ১৯৮০ সালের জুন মাসে। এতে মোট ৪৪টি সুপারিশ করা ছিল। তার মধ্যে সরকার ২২টি সুপারিশ গ্রহণ করলেও তা সর্বাংশে চালু হয়নি। সে সময় মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি ক্ষুদ্র পত্রিকার সরকারি বিজ্ঞাপন রাজনৈতিক কারণে বন্ধ করা হয় (*গণকণ্ঠ, রঙধনু*)।

এ বিষয়ে প্রতিকারের দাবিতে এবং ক্ষুদ্র পত্রিকার সমস্যাবলীর প্রতিকারকল্পে সুপারিশগুলি যথাযথ কার্যকর করার দাবিতে দীপংকর চক্রবর্তীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জেলা সাংবাদিক সংঘ জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলে। তাছাড়াও, সাংবাদিকদের ট্রেন ও বাসে যাতায়াত করার জন্য ফ্রি পাশের দাবিতে ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে জেলায় যে আন্দোলন সংগঠিত হয় তার যোগ্য নেতৃত্ব দান করেন দীপংকরবাবু।

ইতিপূর্বে জেলা সাংবাদিক সংঘের কোন নিজস্ব স্থায়ী দপ্তর ছিল না। সভাপতি দীপংকর চক্রবর্ত্তী ও সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরীর আন্তরিক আগ্রহে ১৯৮৮ সালে সে চেষ্টা শুরু হয়। যদিও তার পূর্বে ১৯৭৭ সালে তৎকালীন জেলা সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় শহরের মধ্যাঞ্চলে এক খণ্ড সরকারি জমি পাওয়া যায়। ১৯৮৮ সালে সেই জমি দীপংকর চক্রবর্ত্তীর বিশেষ প্রচেষ্টায় সামান্য অর্থের বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে স্থায়ী লীজ প্রাপ্ত হয় এবং একটি অস্থায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সংঘের এই নিজস্ব ভবনে দপ্তরের কাজ শুরু করা হয়। আস্তে আস্তে সেই ভবন আজ দ্বিতল সুদৃশ্য ভবনের রূপলাভ করেছে, যা মফঃস্বল বাংলায় সাংবাদিকদের গর্ব।

১৯৯১ সালের ৯ই এপ্রিল জেলা সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে ক্ষুদ্র পত্রিকার সমস্যা ও তার প্রতিকারের জন্য তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

সারা রাজ্যের ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রতিনিধিরা ঐ ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। এবিষয়ে মুর্শিদাবাদ সাংবাদিক সঙেঘর অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব দীপংকর চক্রবর্তী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বিগত নয়-এর দশকে কাশিমবাজার মহাজন সমিতি উচ্চ বিদ্যালয়ে সারা বাংলার ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। দীপংকর চক্রবর্তী তারও অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

এভাবেই দীর্ঘদিন শ্রদ্ধেয় দীপংকর চক্রবর্তী সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও জেলা সাংবাদিক সংঘের সাংগঠনিক কাজে দক্ষতার সহিত অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দান করেন। তাই জেলায় সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকার কথা কখনই ভোলার নয়। আর বিগত ছয়-এর দশকের শুরু থেকে দীর্ঘসময় ছাত্র ও সহকর্মী হিসাবে তাঁকে চেনা ও দেখার স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তরের মণিকোঠায় চির সমুজ্জ্বল থাকবে। ২০০৩ সালে বহরমপুর থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত জেলা সাংবাদিক সংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট ছিল।

গত ২৭শে জানুয়ারি ২০১৩, রবিবার কলকাতার বাসভবনে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা হারিয়েছি আমাদের সাংস্কৃতিক ও সংবাদ জগতের এই প্রাণপুরুষকে। তাঁর স্মৃতি চির অম্লান হয়েই আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# দীপংকর চক্রবর্তী, কান্দী ও আমরা : কিছু টুকরো স্মৃতি

**শুচিব্রত সেন**

ব্যক্তি বা আন্দোলন ঋণী থাকে সময়ের কাছে, এবং উভয়ই উভয়কে করে প্রভাবিত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বহন করেন সময়ের দায়বদ্ধতা। দীপংকর চক্রবর্তী এমনই একজন ব্যক্তি যিনি বহরমপুর তথা বাংলার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাসের এক উত্তরাধিকারী। সময়টা গত শতাব্দীর '৭০ এর দশক এবং চলমান এক কঠিন সময়। মতাদর্শ, সংগ্রাম, সন্ত্রাস সব মিলিয়েই সেই ওলোটপালোট সময়ে আমার সঙ্গে পরিচয় দীপংকরদা-র। দীর্ঘদেহী ভরাট কণ্ঠস্বরের এই ব্যক্তিটি প্রথম দর্শনেই যে সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিলেন তাঁর জীবনাবসানে তা আজও অনেক ভাঙ্গাগড়ার মাঝেও অটুট।

সামনাসামনি পরিচয়ের আগেও 'অনীক' পত্রিকার মাধ্যমে দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে তৈরি হয়েছিল সাজুজ্য। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিল তখন অনেক পত্র-পত্রিকা। গ্রামে গ্রামান্তরে টেলিফোনের চল ছিল না, দূরভাষ তো দূরস্থান। রাস্তাঘাট অনেক ক্ষেত্রেই অগম্য। কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গোপন ও প্রকাশ্য, সবই পৌঁছে যেত বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে। 'Frontier', পরে কিছুদিন বাংলায় 'সংহতি'; 'কালচেতনা', 'অনুষ্টুপ', 'প্রস্তুতিপর্ব', 'এপিক থিয়েটার' ছোট খবরের কাগজ আকারে, বাংলাদেশ থেকে 'Holiday', এবং অবশ্যই 'অনীক'। পাঠক খেয়াল রাখুন, একমাত্র 'অনীক' ব্যতীত সবগুলির প্রকাশ স্থান রাজধানী শহর। বহরমপুরের মত এক মফঃস্বল শহর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতো 'অনীক'। দীপংকর চক্রবর্তীর সাংগঠনিক শক্তির এই পরিচয় আমৃত্যু উজ্জ্বল ছিল।

বহরমপুর থেকে কান্দীর দূরত্ব প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার মত। ছোট্ট মহকুমা শহর। কিন্তু সেই '৭০ এর দশকেও আপাদ-মস্তক সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে আচ্ছন্ন। রাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সর্বত্র। ১৯৭৩-এ যখন লেকচারার হয়ে কান্দী রাজ কলেজে যোগ দিই, তখন দেখেছি WBCUTA কোন ধর্মঘট করলে গুটি কয়েক শিক্ষক তখন যোগ দিতেন। বাকিরা ভয়ে থাকতেন। কিন্তু এ হেন কান্দীও '৭০ এর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারে নি। শুরু হয়েছিল নাট্য সংস্কৃতি দিয়ে। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী যেমন কোরাস, আহ্‌দী, ঝড় প্রভৃতি এরা আগেও নাটক করতেন, কিন্তু '৭০ এর ধাক্কায় করলেন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী নাটক। কিছুদিন বাদেই সংহতির এক আদর্শ নমুনা তৈরী হল। সমস্ত নাট্যগোষ্ঠীগুলি মিলে তৈরি হল 'প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সমন্বয় কমিটি'— সংক্ষেপে প্র.সা.স.ক.। সমর মুখার্জী, কুবের ঘোষ, মিলন মালাকার, শ্যামল সরকার এরা ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। সভাপতি হিসাবে বর্তমান লেখককে এরা নির্বাচিত করেছিলেন। প্রথমেই যা দরকার ছিল তা হলো এক মতাদর্শগত দিশা। শুরু হল বিভিন্ন আলোচনা সভা, আর এখানেই এসে গেল দীপংকর চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিকতা। মনে আছে আহ্‌দী নাট্যগোষ্ঠীর ছোট ঘরে দীপংকরদা এলেন বক্তা হিসাবে। যারা ওঁর বক্তৃতা শুনেছেন নূতন করে তাদের বলার কিছু নেই। কান্দীর প্রগতিশীল এই অংশের সঙ্গে দীপংকরদার যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। এক দাবিকে কেন্দ্র করে আমরা আরো ঐক্যবদ্ধ হলাম। তা হল কান্দীতে এক স্থায়ী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা। বহরমপুরে গ্রান্ট হলে প্রায়শই নানা আলোচনায় দীপংকরদা থাকতেন এক অনিবার্য বক্তা। সেই বক্তৃতা শুনতে কান্দী থেকে আমরা অনেকেই যেতাম শুধু দীপংকরদার আকর্ষণে।

লক্ষ্য করে দেখেছি শত টানাপোড়েনের মধ্যে এক মতাদর্শে ব্যক্তিরা কাছাকাছি এসে যায়। নকশাল আন্দোলনের সূচনায় বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শৈবাল মিত্র, নিমাই করণ প্রমুখ। আমার সঙ্গে নিমাই করণের কোন পরিচয় ছিল না। কান্দীতে হঠাৎ একদিন শুনলাম একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে খুঁজছেন। আলাপে জানলাম ইনিই নিমাই করণ এবং সূত্র দীপংকর চক্রবর্তী। আরও একটি বৃত্ত কান্দীতে গড়ে উঠল— আর সেটি হলো ময়ূরাক্ষী ক্লাব কেন্দ্রিক এক গোষ্ঠী। কে নেই সেখানে— ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যাংক কর্মচারী, অফিসার, সাব-জেলা জজ এবং অবশ্যই নিমাই করণের মত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শুধু একটা ক্লাব হলে এর উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই সার্বিক অপ-সংস্কৃতির সময়ে ময়ূরাক্ষী ক্লাব যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল বিভিন্ন বিতর্ক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে এক সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখতে। আজ ভাবতেও অবাক লাগে যে কী ভাবে সেই সময় বিভিন্ন পেশার মানুষ তাঁদের পেশাগত অহং-কে সরিয়ে রেখে একত্রিত হয়েছিলেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে। সন্দেহ নেই এর মূল চালক হিসাবে ছিলেন নিমাই করণ, ডাঃ শেখর সরকার, ডাঃ অমিত পানের মত ব্যক্তিরা। ব্যক্তিগতভাবে হয়ত দীপংকরদা এখানে উপস্থিত থাকেন নি, মাঝে মাঝে কয়েকটি বিতর্ক সভা ছাড়া। কিন্তু গোড়াতেই যা দিয়ে শুরু করেছিলাম, অর্থাৎ সময়ের ফসল হিসাবে তাঁর মতাদর্শ এবং প্র.সা.স.ক. ও ময়ূরাক্ষী ক্লাবের প্রচ্ছন্ন মতাদর্শে কোন বিরোধ ছিল না। আসলে আমরা তো জানি ব্যক্তির অবসানে মতাদর্শের অবসান হয় না। সময় তার স্বর রেখে যায় ইতিহাসে।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# শিক্ষক দীপংকর চক্রবর্তী

**শক্তিনাথ ঝা**

১৯৬৫-র নভেম্বরে আমি যখন কৃষ্ণনাথ কলেজে আসি, তখন দীপংকর এখানে অধ্যাপনা করে। সে এ কলেজে আইএসসি পড়েছিল। তার পরিবার বহরমপুরেই থাকে। স্থানীয় এবং কলেজের ছাত্র হিসাবে সে বহুজনের সঙ্গে পরিচিত ছিল। ভাল শিক্ষক হিসাবে তার পরিচয় ছিল। তখন অর্থনীতি বিভাগে খুব ভাল শিক্ষক ছিলেন মনোজ সান্যাল এবং প্রাণতোষ সেন। দীপংকর ছিল ভাল আবৃত্তিকার, বিতার্কিক এবং বক্তা। এ গুণগুলি শিক্ষকতায় মিশেছিল তার। তখনকার সিপিআই-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না। তবে রাজনৈতিকভাবে সিপিআই(এম)-এর প্রতি তার পক্ষপাত ছিল। কিন্তু সরাসরি সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে তার সংযোগ ছিল না। জেলার নেতা সন্তোষদা, অনন্তদার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। দীপংকর কখনো পার্টির সদস্যপদ নিতে আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার চর্চা সে করত। বহরমপুরে একটি মননশীল, প্রগতিশীল, রুচিবান গোষ্ঠীর সঙ্গে দীপংকর বরাবর যুক্ত ছিল। মণিময়, মৈত্রেয়, সৌমেন এবং আরো অনেকে মিলে তারা আলোচনাসভা, বিতর্কসভা, পত্রিকা প্রকাশ করতো। কলেজের পাঠ্যবই-এর বাইরে বিস্তর পড়াশোনার আয়োজনে দীপংকর ছিল ব্যতিক্রমী। ব্রডশীট পত্রিকা, অনেক দামী তথ্য এবং লেখার সূত্রে ভাল ছাত্রেরা তার কাছ থেকে এক বড় দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে পারতো। গোষ্ঠীগতভাবে লেখা-পড়া-আলোচনা, পত্রপত্রিকা প্রকাশে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দীপংকর ছিল অক্লান্ত।

আমরা অনেকে প্রাইভেট টিউশানি করতাম না। ছাত্রদের পড়ানো, সাহায্য করা, বই দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের স্বজন বলেই যারা এ কলেজে পরিচিত ছিলেন, দীপংকর তাদের অন্যতম ছিলেন। সে সময়ে আমরা কলেজের শিক্ষক সমিতিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলাম। তখনকার শাসকশ্রেণীর (কংগ্রেস/সিপিআইএম) প্রভাবের বাইরেই ছিল কৃষ্ণনাথ কলেজ। শিক্ষকদের বড় অংশ প্রগতিশীল বামপন্থায় বিশ্বাস করতেন, কিন্তু পার্টির অন্ধতা থেকে ছিলেন মুক্ত। বামপন্থী হিসাবেই সকলে দীপংকরকে জানতো। এর ফলে প্রথমবার ডিপিআই প্যানেলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে তার নাম নথিভুক্ত হয় নি। অধ্যক্ষের উপর চাপ এসেছিল তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু অধ্যক্ষ ড: রামপাল কৃতী শিক্ষক দীপংকরকে না ছাড়িয়ে, তাকে দ্বিতীয়বার প্যানেলের সুযোগ দেয় এবং দীপংকর তার যোগতা প্রমাণ করে।

নকশালবাড়ির আন্দোলনের সমসময়ে এক সর্বভারতীয় তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সঙ্গে দীপংকর যুক্ত হয়। তাদের মুখপত্র 'পুনশ্চ'-এর সম্পাদক হয় সে। মাওজে-দং-এর পরিবর্তে হোজাকে, কৃষিবিপ্লবের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে তারা বিস্তর আলোচনা, সংগঠন গড়ে তোলে। এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু সে সময়েও কলেজের তাবৎ প্রগতিশীল কাজকর্মে, আন্দোলনে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ করতে পেরেছিলাম। কলেজের নকশালবাড়ির সমর্থক ছাত্রদের সঙ্গে তার বিতর্ক হতো। কিন্তু সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধার। কলেজের কংগ্রেসি ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে দীপংকর অগ্রণী, সাহসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধা করে নি। সিপিআই(এম) এর ক্ষমতার আগ্রাসনের বিরোধিতায় তার কোন দুর্ভাবনা ছিল না। আদর্শবান, সৎ শিক্ষক হিসাবে তার বিপুল প্রতিষ্ঠা ছিল ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে। কলেজের বাইরেও।

জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করায় দীপংকর গ্রেপ্তার হওয়ায় শিক্ষক সমিতি সর্বসম্মতভাবে তার মুক্তি চেয়ে ডেপুটেশন দেয়। এবং এ জন্য তার কোন চাকুরিগত ছেদ হয় নি শিক্ষকদের মিলিত ইচ্ছায়/চাপে। দীপংকরের রাজনৈতিক চিন্তার বিরোধী শিক্ষক ও ছাত্রেরাও নিষ্ঠাবান অনন্য শিক্ষক হিসাবে দীপংকরকে স্বীকার করতো। এটি তার বড় পাওয়া। দীপংকর শিক্ষক সমিতির সম্পাদক, পরিচালন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। শিক্ষক সংগঠনের (ওয়েবকুটা) জেলার নেতৃত্বেও সে ছিল। এবং সব খানেই সে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতো। তার মেধা, সংগঠন ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব আর পাঁচজনের মধ্যে তাকে হারিয়ে যেতে দিতো না। কৃষ্ণনাথ কলেজের স্মরণীয় শিক্ষকদের মধ্যে সে অন্যতম বলে অবশ্যই বিবেচিত হবে।

### স্মরণসভা

**গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ভারতসভা হলে অনীক, এপিডিআর, পিপলস বুক সোসাইটি, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, এখন বি সংবাদ, নাগরিক মঞ্চ, লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ ও তাঁর পরিবারের উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।**

**এছাড়াও স্মরণসভা হয়েছে কলকাতা বইমেলায়, বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে, কান্দিতে, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে,বহরমপুর গার্লস কলেজে ও এপিডিআর-এর বিভিন্ন শাখায়।**

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# ‘স্যারের স্যার’

**প্রতাপ মিত্র**

আমাদের প্রেসের এক কর্মী মজা করে প্রায়ই দীপংকর চক্রবর্তীকে বলতো, ‘আপনি তো আমার স্যারের স্যার’, কাজেই আপনার কথা কি আমি অমান্য করতে পারি? অর্থাৎ কর্মসূত্রে বা পদাধিকার অনুযায়ী আমি হচ্ছি সেই কর্মীর স্যার, (যদিও আমাদের প্রতিষ্ঠানে স্যার বলার রেওয়াজ না থেকে দাদা বলার রেওয়াজই রয়েছে) আর দীপংকর চক্রবর্তী আমার স্যার (শিক্ষক) হবার সুবাদে, সেই কর্মীর স্যারের স্যার। এই সম্পর্কটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঠাট্টা ইয়ার্কি চলত, উনি স্যারের স্যার হওয়াটাকে বেশ গর্বের সঙ্গেই নিতেন।

একদিন প্রেসে *অনীক*-এর কাজ চলছে, সঙ্গে *অনীক*-এর অন্যান্যরাও আছেন। কাজের সঙ্গে মুড়ি, সিঙ্গাড়া ও আড্ডাও হচ্ছে। আমাদের সেই কর্মী স্যারের স্যার বলতেই কেন জানিনা হঠাৎ আমি প্রত্যুত্তর করলাম, আমি তো কোনদিন ওনার কাছে পড়িনি। উনি উত্তর করলেন, তুমি অর্থনীতি (অর্থাৎ ওনার ক্লাস) না পড়লেও কৃষ্ণনাথ কলেজে তো পড়েছো, সেই অর্থে আমার ছাত্র। আমি গর্বের সঙ্গে জানালাম, আমি কোনদিনই কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়িনি। (আমার সমসাময়িক সব বন্ধু-বান্ধবরাই কৃষ্ণনাথ কলেজের বা ওনার ছাত্র ছিল)। মুহূর্তের মধ্যে ওনার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল আর উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুঝলাম কাজটা ঠিক করিনি, অনুশোচনায় ভিতরটা দগ্ধ হয়ে যেতে লাগলো, মনে হতে লাগলো কেন বলতে গেলাম এমন নিষ্ঠুর এই কথাটা! কেন কেড়ে নিলাম ওনার সুখানুভূতি! ওনার জীবিতাবস্থায় কোনদিন আমার এই অনুশোচনার কথা ওনাকে বলতে পারিনি। প্রথাভিত্তিক শিক্ষার স্যার উনি ছিলেন না ঠিকই কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা, যদি পেয়ে থাকি, উনি যে আমার কতটা স্যার বা শিক্ষক ছিলেন তা প্রসঙ্গান্তরে।

খুব অল্প বয়সেই দীপংকর চক্রবর্তী কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। দীর্ঘ ৩৭ বছর অধ্যাপনার জীবনে বহু ছাত্র-ছাত্রী উনি রেখে গেলেন। কোন একজন বিশেষ কারুর কথা উঠলেই উনি বলতেন, ‘‘ও তো আমার ছাত্র’’। এবং এটা বলতে বেশ গর্ব বোধ করতেন। ছাত্রদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা ওনার থেকে হয়তো মাত্র দু-তিন বছর বয়সের ছোট ছিলেন।

বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী পণ্ডিত এই মানুষটা শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন আবার প্রেসে আসতেন একদম দিল-খোলা আড্ডার মেজাজে, একজন সাধারণ মানুষের মতো ব্যক্তিগতভাবে অনেক কর্মীরই খোঁজ-খবর রাখতেন। নিজস্ব অবস্থান বা অবস্থানের অহমিকা কখনই সেই মেলামেশায় অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এই উপলক্ষে তিনি তখন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কাছাকাছি। একদিন প্রেসের কর্মীরা আড্ডার সময় বললো, পরিবর্তন তো আনছেন, আর আপনার যা এখন পজিশন, শিক্ষামন্ত্রী হওয়া তো স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। দেখবেন আমাদের ভুলে যাবেন না তো? আমাদের আর কিছুই চাই না, শুধু মনে রাখলেই হল।

একবার আমাদের কর্মীরা দীপংকরদাকে প্রস্তাব দিল এবারের *অনীক* পত্রিকার প্রচ্ছদ সবুজ ও গেরুয়া রঙে ছাপা হোক, তাহলে ছাপার পয়সা লাগবে না। মানুষটি এইসব রসিকতা বেশ খোলামনেই নিতেন, *অনীক*-এর কাজ ও আড্ডা একই সঙ্গে চলত। হঠাৎই কেমন যেন সব অতীত হয়ে গেল।

বহরমপুরে দেখেছি, লালগোলার রাজ পরিবারের ছেলে বীরেন রায় কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে (বিধায়ক হয়েছিলেন) পার্টিকে ছাপার কাজের সুবিধার জন্য একটা প্রেস করে দেন। প্রেসের নাম ছিল ‘কুমকুম প্রেস’। পার্টির পক্ষ থেকে রণজিৎদা (গুপ্ত) সেই প্রেস দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন। দীপংকরদা বরাবর কুমকুম প্রেস থেকে যাবতীয় ছাপার কাজ করাতেন। পরে ১৯৬২-তে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা হ'লে রণজিৎদা গ্রেপ্তার হন ও জেলে যান। পরবর্তীকালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ব্যক্তিগত উদ্যোগে রণজিৎদা নিজ মালিকানায় ‘সুপা প্রেস’ নামে একটি প্রেস শুরু করলে দীপংকরদা সুপা প্রেসে চলে আসেন। সুপা প্রেস বন্ধ হবার পর বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের এক সহযোদ্ধা সুকান্ত রাহা প্রেস ব্যবসা আরম্ভ করলে উনি সেই প্রেস থেকেই ছাপার কাজ করাতেন। অর্থাৎ ছাপাখানা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতো। লিটল ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ অনেকাংশেই চালু যে পরিচালকেরা প্রায়শই প্রেসে নিয়মিত টাকা মেটান না বা মেরে দেন। উনি বরাবরই ছিলেন এ সবের উর্ধ্বে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিটি পয়সার উনি সঠিক হিসাব রাখতেন বা প্রেসে নিয়মিত পেমেন্ট করতেন। কাজেই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা ছাড়াও প্রেস মালিকরা ব্যবসায়িক কারণেও ওনাকে পছন্দ করতেন।

গত বারো বছর ধরে *অনীক* আমাদের গঙ্গানগরের ‘ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ’ থেকে ছাপা হচ্ছে। এর আগে কলকাতার অন্য কোন প্রেস থেকে *অনীক* ছাপা হলেও কোথায় যেন নির্ভরশীলতার একটা অভাব থেকে গিয়েছিল ওনার মধ্যে। বোধহয় সেই কারণেই খুঁজে বের করলেন আমাকে। (পারিবারিক

ও জীবিকার কারণে ওনার প্রায় বিশ বছর আগেই আমি বহরমপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি। এই বিশ বছর ওনার সাথে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না)। দায়িত্ব দিলেন *অনীক* ছাপার ও পোস্টাল ডেলিভারির প্যাকিং ও পোস্টিং করার। ভাবতে ভালো লাগছে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মতো সে দায়িত্ব আমরা পালন করেছি এক সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। কোন দিন কোন অভিযোগ তো শুনিনি বরং প্রশংসাই করেছেন পরিষেবার।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে বাবার চাকুরি সূত্রে পরিবারের সকলে বহরমপুর যাই। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি। চোখে তখন ম্যাঞ্চেস্টার যাওয়ার রঙিন স্বপ্ন। '৬৭-র 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ' নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ-এর ঢেউ হঠাৎ-ই স্বপ্নটা পাল্টিয়ে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন হয়ে গেল। বহু তরতাজা যুবকের মতো আমিও সমাজ বদলের সশস্ত্র বিপ্লবের অতিবাম রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ঘরবাড়ি ও পরিবার পরিজন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ও বহরমপুর ছাড়লাম। তখনও দীপংকর চক্রবর্তীকে চিনি না, নামও শুনিনি। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অতি-বাম রাজনীতির ভুলগুলো বুঝতে শিখেছি। মনে তখন তখন নতুন উদ্দীপনা— গণ-আন্দোলন চাই, বৃহত্তর মানুষকে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। তাই বহরমপুর ফিরলাম ১৯৭৪-এ। পরিচয় হ'ল দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে। যুক্ত হলাম *অনীক* পত্রিকার সঙ্গে। প্রায় একা হাতে চালাচ্ছেন তখন *অনীক* পত্রিকা। তারপর এপিডিআর, লিগ্যাল এড কমিটি, ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধীর ফ্যাসিস্ত সরকার বিরোধী আন্দোলন সবেতেই যুক্ত হয়েছি দীপংকরদার নির্দেশিত পথে বা নেতৃত্বে। অসাধারণ গুণ ছিল বিভিন্ন মত ও পথের মানুষকে নিয়ে ইস্যুভিত্তিক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার। তাই তো কখনও আরএসপি-র নীরদবরণ সরকার (কালোশশীদা), কখনও দেবু ব্যানার্জী (পরে বামফ্রন্টের মন্ত্রী হয়েছিলেন), কখনও দেবেন্দ্রনাথ দত্ত (জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি) বা আইনজীবী মঙ্গলময় মৈত্র এঁদেরকে রেখেছিলেন সামনের সারির নেতৃত্বে, কিন্তু আন্দোলনের প্রকৃত চালিকা শক্তি ছিলাম তাঁর নেতৃত্বে আমরা। সেই সময় জেলার বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে লিগ্যাল এড কমিটির পতাকায় আইনি সহায়তায় ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলাম। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলন কাকে বলে, কীভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হয়, আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্ব বা রাশ কিভাবে নিজেদের হাতে রাখতে হয়, সবই তিনি শেখাতে চেয়েছিলেন হাতেকলমে। সেই অর্থে তিনি ছিলেন আমার বা আমার মতো অনেকেরই প্রকৃত স্যার বা শিক্ষক।

এক সময় মার্কসবাদ ও সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য বেশ গর্ব ছিল। আর যারা মুখে মার্কসবাদ, বামপন্থা ও বিপ্লবের কথা বলেও পরিবার পরিজন নিয়ে সুখী জীবনযাপন করতেন তাদের সম্পর্কে ছিল রাগ, বিতৃষ্ণা ও করুণা! অতি-বাম ঝোঁকের ফলে তখন বুঝিনি বিপ্লব মানেই শুধু আত্মত্যাগ করে অস্ত্র হাতে লড়াই নয়, সমাজ জীবনে আমরা যে যেখানে আছি সেই অবস্থানে থেকেই মানুষের পাশে থাকা, মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে থাকা, তাদের ভালো-মন্দের সাথী হওয়া, তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা কেউ কেউ হয়তো কখনও বা কিছু সময় একটা ভালো কাজ, একটা বৈপ্লবিক কাজ করেছি আর গর্ব বোধ করেছি। তারপর দেখা গেছে, সেই ভালো কাজ থেকে সরে এসেছি। প্রশ্নটা হ'ল সারা জীবন ধরে ভালো কাজ করা, বিপ্লব ও মানুষের জন্য কাজ করা, তাদের পাশে থাকা। দীপংকর চক্রবর্তী ঠিক সেই কাজটাই সারাজীবন ধরে করে গেলেন। মানুষের পক্ষে থেকেছেন। আমাদের দেশে অনেকেই আছেন যাঁরা অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে মার্কস অধ্যয়ন করেছেন, মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং নিজেদের মার্কসবাদী হিসেবে তুলেও ধরেছেন। মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে মার্কসবাদী হওয়ার সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু যৌবনে পা রাখার সেই ক্রান্তি মুহূর্তে আমরা জেনেছিলাম এ হল এমন এক বিজ্ঞান যে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমেই একজনকে প্রকৃত মার্কসবাদী হয়ে উঠতে হয়। বুঝেছিলাম দীপংকর চক্রবর্তী হলেন সেই অর্থে একজন প্রকৃত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী যিনি মার্কসীয় তত্ত্বগুলো শুধু অধ্যয়নের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে গেছেন। একজন প্রকৃত মার্কসবাদী হয়ে সেই দর্শনটা মাথায় রেখেই সমস্ত কাজের পরিকল্পনা করেছেন। পত্র-পত্রিকা, ছাত্র-যুব উৎসব, ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট, বন্দীমুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন, ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি, সাংস্কৃতিক পরিষদ সবই এর অংশ হিসাবেই গড়ে তুলেছেন।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যু পারিপার্শ্বিক আবহে এমন এক গভীর বেদনা ও শূন্যতাবোধের সৃষ্টি করে গেল যা অপূরণীয়। দীপংকর চক্রবর্তীর সৃষ্টিশীল মন ও সংবেদনশীল জীবনচর্চা কতটা বহুমাত্রিক ও ব্যাপক ছিল, তা যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন।

কথায় বলে, মৃত মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোটাই রীতি। আবার সর্বব্যাপী ভাঙনের উপপ্লবের এই হট্টরোলের কালে অনেকেই অনেক রীতির মতো সে রীতিও ভাঙতে পারে। বলা হতে পারে, তাঁরা যেটা বলছেন সেটাই হল একজন মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন। তেমনটা চেষ্টা করলেও হয়তো আমি পারতাম না। আসলে যে অপরূপ সারল্য, সততা আর কর্মনিষ্ঠায় জড়িত মানুষটিকে এতদিন প্রত্যক্ষ করলাম, সাহচর্য পেলাম, কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলাম— নিছক 'শ্রদ্ধা' শব্দটা বোধহয় তাঁর ক্ষেত্রে

বহুব্যবহারে জীর্ণ, ক্লিশে; 'মূল্যায়ন'-এর অন্তত যে মাপকাঠি বা যোগ্যতার আমি অধিকারী, তাও অপ্রতুল। প্রকৃতপক্ষে, নিজের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে না পারার একটা যন্ত্রণা আমাকে কুরে খাচ্ছে। হয়তো, আমারই মতো, আমার অনেক বন্ধুকেও।

অনেক কথাই মনে পড়ছে, তার মধ্যে বিশেষ একটা ঘটনা— প্রথম জীবনে দীপংকর চক্রবর্তী প্রভাবিত হয়েছিলেন বহরমপুরের অগ্নিযুগের বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্যের দ্বারা। যিনি অনেক বিপ্লবীর মতো পরবর্তীকালে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। পারস্পরিক একটা শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিল। দীপংকর চক্রবর্তীর বাসগৃহ বা *অনীক*-এর দপ্তর তখন মীরা হাউসের কাছে। এখনও কানে ভাসে "দীপু আছো?" বলে বাইরে থেকেই উচ্চৈস্বরে ডাক দিয়ে তিনি আসতেন। দীপুদাও চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে সসম্মানে তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসতেন। হঠাৎই একদিন তাঁর জীবনাবসান হ'ল। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বেশি রাতে পরিবারের লোকেরা শেষকৃত্যের জন্য তাঁর মরদেহ সৈদাবাদ শ্মশানে নিয়ে গেল। এরপর চলল হিন্দু শাস্ত্রমতে ঘি মাখানো, মন্ত্র উচ্চারণ ও মুখাগ্নি ইত্যাদি। দীপুদা সমেত আমরা মাত্র ক'জন সেই ঘটনার সাক্ষী। খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন দীপুদা এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে। বারবার বলতে লাগলেন "যে লোকটা সারা জীবন ধর্ম মানলো না, বিপ্লব ও মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল শেষ যাত্রায় এই তার পরিণতি হ'ল।" পরে বহু দিন দেখেছি সেই মনঃকষ্ট উনি ভুলতে পারেন নি।

সব শেষে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। দীপংকরদা চলে গেছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে ও ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় স্মরণসভাও হয়ে গেছে। ১৭ ফেব্রুয়ারির ভোরে একটা স্বপ্ন দেখলাম, উনি প্রেসে এসে বলছেন, "পত্রিকার কী খবর? ১৫ই মার্চ বেরুচ্ছে তো?" আমি যথারীতি মজা করেই বললাম, "আপনি অযথা এই নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আপনি যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তারা ভাবুক।" উনি ওনার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, "একটু দেরি করে ফেলছে।" আমি বললাম, "এই যে আপনি চির বিশ্রামে চলে গেলেন, তাহলে আবার ফিরে এলেন কী ভাবে?" উনি বললেন, "ওই যে কি একটা ইনজেকশন দিল তাতেই আমি ফিরে এলাম।" পাশে ঘুমিয়ে থাকা আমার ছেলেকে ঠেলে ওঠানোর চেষ্টা করলাম। স্বপ্নের কথাটা বললাম ওকে। হালকা হেসে মনের চেতন-অচেতন-অবচেতনের কী সব স্তরবিন্যাসের তত্ত্ব শুনিয়ে আমার বিজ্ঞানমুখী আত্মজটি পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাদরটি টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো। আর আমি, শৈত্য ও উষ্ণতার দোলাচলের সেই ভোর থেকে ভেবে চলেছি— "যদি এমনটা হতো, কী ভালোই না হতো?"

ক্ষমা চাইছি, আমি মার্কসবাদী হতে পারিনি। ক্ষমা চাইছি, এখনও তিনি আমার স্যারই।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# দীপংকরদা

**অশোক দাশগুপ্ত**

দীপংকরদা সম্পর্কে বলার এত কথা আছে, কিন্তু লেখার মতো শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা এই মুহূর্তে নেই। তবু, শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ যখন দিয়েছেন, কয়েকটা কথা জানাতে চাই।

অনেক কিছু হয়ে ওঠা উচিত ছিল, অনেক কিছু করা উচিত ছিল। হয়নি। সেজন্য নিজেই দায়ী। কিন্তু, যতটুকু সচেতনতা অর্জন করতে পেরেছি, যতটুকু, তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ দীপংকরদার কাছে। আমার বিষয় ইতিহাস, অর্থনীতির দুঁদে অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তীর ক্লাসে বসার সুযোগ তাই পাইনি। কিন্তু কলেজের বাইরের ক্লাসে তাঁকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পেয়েছি।

'পুনশ্চ' পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয়, আমরা কয়েকজন নিতান্তই ছাত্র, সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী ওই মফস্‌সল শহরে গড়ে তোলেন এক সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন, যার ছাপ গোটা রাজ্যেই পড়ে। অনভিজ্ঞ সহযোগী হিসেবে আমরা কয়েকজন বেড়ে উঠেছি তাঁরই নেতৃত্বে। জন স্টেইনবেক, আন্তন চেকভের গল্প অনুবাদ করতে দেওয়ার সময়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অনুবাদ করা মানে, বড় লেখকদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়া।

দুর্ধর্ষ বিতার্কিক দীপংকরদা শেখাতেন, কী করে যুক্তি পেশ করতে হয়। তাঁর বিতর্কে ছিল ক্ষুরধার যুক্তি। একবার বললেন, 'তোমার ধরনটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একটু আবেগ থাকছে। তা হোক। নিজের মতোই কর। শুধু দেখবে, আসল জায়গাটায় পৌঁছতে যেন ভুল না হয়।' দীপংকরদার কথাবার্তাতেও ছিল যুক্তির ঝাঁঝ। রসিকতা থাকত খাঁজে খাঁজে। সাধারণ বামপন্থী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ওই অসাধারণ মানুষটির অবদান এই উটকো সাংবাদিক কখনও ভুলবে না।

শুধু রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ নয়, দীপংকরদার কথায় পড়েছি কালজয়ী সাহিত্য, জীবন্ত কবিতা। সুধীন দত্তর 'কুলায় ও কালপুরুষ' হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়া ধরব কিন্তু!' হাতে আগাথা ক্রিস্টির একটা বই দেখে বলেছিলেন, 'অযথা সৃষ্টি'!

আজীবন বামপন্থী থেকে গেছেন। এবং মানবাধিকার সংগঠক। রাজনৈতিক মতপার্থক্য কখনও কখনও হয়েছে, কিন্তু তাঁর স্নেহ এবং আমার শ্রদ্ধা অটুট থেকেছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে বাকি জীবনেও শ্রদ্ধার আসনে রাখব।

ইতি—
দীপংকরদার অযোগ্য ছাত্র
অশোক দাশগুপ্ত

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# ''অন্য মনের মানুষ''

সমর নাগ

ছেষট্টির শেষ। গড়িয়ার এন্ড্রুজের নামাঙ্কিত কলেজের ছাত্র ভূদেব সেন পুলিশের গুলিতে নিহত।

সারা বাংলায় লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট। বহরমপুরের ঐতিহাসিক ব্যারাক স্কোয়ারের দপ্তরের অদূরে পুলিশ আটকালো ছাত্র মিছিল। শহরের সব স্কুলের ছাত্রদের মতো কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েটের সর্বোচ্চ শ্রেণীর আমাদের সেটাই প্রথমবার মিছিলে পায়ে পায়ে হাঁটা। পাশের চায়ের দোকান থেকে নড়বড়ে বেঞ্চ এলো। সাদা পাঞ্জাবী-ঢোলা পাজামা, শীর্ণ, ভারী চশমা, একমাথা অশাসিত চুল, বক্তৃতা শুরু করলেন দীপংকর চক্রবর্তী। শুনলাম কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক। অপরিচিত শানিত বাচনভঙ্গি— জ্বালা ধরানো বক্তব্য, সদ্য কৈশোর পেরোনো আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম— দীপ্ত হয়ে উঠলাম।

সাতষট্টিতে বহুখ্যাত শতাব্দী প্রাচীন কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হলাম। 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তের হাত ধরে এবং দ্বিতীয় দিনেই আরএসপি-র ছাত্র শাখা পিএসইউ-এর পক্ষ থেকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলাম। প্রস্তাবক আজকের তৃণমূলের সংসদীয় নেতা তৎকালীন পিএসইউ-এর নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিনের মধ্যেই সুদীপ বাম ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি হয়ে গেল। আমরা তুমুল বাম ছাত্রনীতির আবর্তে আমূল জড়িয়ে গেলাম। এই সুবাদে বাম ছাত্র সংগ্রাম কমিটির বিপিএসএফ, পিএসইউ ও ডিএসও-র কলেজে ইউনিটের সভায় এলেন দীপংকরদা। প্রথমেই সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও'। হতচকিত আমরা— লহমায় আড় ভেঙ্গে সহজ, সমীহ জড়ানো নৈকট্য। কালেক্টরেটের সামনে ছাত্র মিছিলে বক্তা অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী হয়ে উঠলেন আমাদের, বিশেষ করে বাম ছাত্র সংগঠকদের, প্রিয় দীপংকরদা । শিখতে শুরু করলাম ওঁর কাছে, ক্লাশে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া। স্নেহপ্রণোদিত হয়েই আলোচনা করতেন, সমসাময়িক বিষয়ে বইপত্রের উল্লেখ করতেন অবলীলায়, পড়তে বলতেন, কৌতুহল-ক্ষুধা জাগাতেন। আন্তঃকলেজ বিতর্ক সভায় কলেজের প্রতিনিধি আমরা। ছুটির পর কমন রুমে বা ফাঁকা কোন ক্লাশ ঘরে যুক্তি দিয়ে বক্তব্য রাখার সময়ের মাপ, দাঁড়ানো-তাকানো-বক্তব্যের মাঝে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া, মাঝে বিরতির প্রয়োগে নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করা, কোটেশন-এর প্রয়োগ। শেষের মোচড়ে বক্তব্যকে অটল প্রতিষ্ঠা দেবার কায়দা— ধৈর্য্য ধরে শেখাতেন। সহনশীল, কিন্তু ছাত্রপ্রিয় হবার জন্য আত্মমর্যাদা কখনো বিসর্জন দেননি। প্রয়োজনে দৃঢ় হতে পারতেন। সেবারে কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক, বি বি নামে পরিচিত, একটু রাগী। ক্যালকুলাস শেখাতে শেখাতে নিজেদের মধ্যে গভীর আলাপে মগ্ন শেষের বেঞ্চে দুজন ছাত্রের দিকে নজর পড়লো। মুহূর্তে মেজাজ হারালেন। ছুঁড়ে মারলেন হাতের ডাস্টার— সঙ্গে ইংরেজিতে চিৎকার। সরাসরি কারোর গায়ে লাগেনি। কিন্তু ছাত্রদের অভিমান বলে কথা। সব বাম ছাত্র সংগঠন চটজলদি যৌথসভায় সিদ্ধান্ত নিল, অধ্যাপককে ক্ষমা চাইতে হবে। বি বি অনমনীয় । তখন শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘর ঘেরাও শুরু হল। আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা ভেবে ছাত্র পরিষদও সাথে যোগ দিল ঘেরাও-এ। কে কত জঙ্গি স্লোগান বা দাবি তুলবে তার চপল প্রতিযোগিতা শুরু হোল। রাত বাড়ছে। ছাত্ররা টিচার্স রুমের বাইরে। দীপংকরদা ও অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা বেড়িয়ে এলেন। ''তোমরা পাঁচজন প্রতিনিধি, প্রতি সংগঠনের একজন করে, ভেতরে এসো কথা বলবো''। গেলাম। দাবি নিঃশর্ত ক্ষমা। অধ্যাপক বি বি বললেন ''কোন প্রশ্নই নেই। আমি প্রিন্সিপালকে বলেছি ওই দুটি ছেলেকে কলেজ থেকে বার করে দিতে। অন্যথায় ওরা ক্ষমা চাইবে আগে, তারপর বিবেচনা''। দীপংকরদা ধীরস্থির ভাবে আমাদের বোঝাতে লাগলেন ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের শ্রদ্ধা-বিনয়শীলনের ভারতীয় পরম্পরার কথা এবং ''শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে অমর্যাদার কিছু নেই। তোমরা ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও''। আমরা একঘন্টা সময় চেয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ছাত্ররা নারাজ। পারদ চড়াবার প্রতিযোগিতায় আমরা বাম ছাত্রসংগঠকরা চাইলেও ছাত্র পরিষদ নারাজ। একজন গিয়ে ভেতরে জানিয়ে এলো, না, আগের দাবিই রইল। এইবার দীপংকরদার নেতৃত্বে শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ওঁরাও কেউ বাড়ি যাবেন না। অধ্যাপক বি বি-র পাশেই থাকবেন যতক্ষণ না ঘেরাও উঠছে। সারারাত? তাই সই। আমরা বিব্রত, প্রিয় অধ্যাপকরা কষ্ট পান চাইনি— এদিকে জঙ্গিপনার চূড়ান্ত। আমরা খানিকটা সিঙ্গারা, বিস্কুট, চা পাঠাতে চাইলাম শিক্ষকদের ঘরে। একাংশ রে রে করে উঠলো। আবারো দীপংকরদা বেরিয়ে এসে দৃঢ়ভাবে বললেন, ''তোমরা যদি এরকম অকারণ আন্দোলন চালিয়ে যাও কাল থেকে আমরাও ক্লাশ নেবো না। উনি শিক্ষক— তোমাদের কোন অধিকার নেই এভাবে শিক্ষকদের অমর্যাদা করার। ঐ দুটি ছাত্র কোথায়?'' ভীড়ের মধ্যে খুঁজে আনা হলো এদেরকে। দুজনের দুটি হাত ধরে দীপংকরদা ওদের নিয়ে গেলেন শিক্ষকদের ঘরে। কী যে হয়েছিল ভেতরে জানিনা। মিনিট পাঁচেক পরে ছাত্র দুটি ফিরে এলো। চোখে জল, পিছনে সহাস্য তৃপ্ত দীপংকরদা। ইশারায় বললেন ''জিজ্ঞাসা করো''।

ছাত্র দুটি তার আগেই সমস্বরে বলে উঠলো আমরা আর আন্দোলন চাই না, তোমরা ঘেরাও তুলে নাও। আমরা খুশি, অন্যরা বিড়ম্বিত— কিন্তু কলেজ সংকটমুক্ত। একে একে শিক্ষকরা বেড়িয়ে এলেন ঘর থেকে। সহমর্মিতা ও স্বধর্মে স্থিতধী, সাইকেল হাতে বাড়ির পথে দীপংকরদার মুখে চওড়া হাসি।

বিজ্ঞান ক্লাসের ছাত্র হয়েও দীপংকরদা ও শক্তিনাথ ঝা-র সুযোগ পেলেই আমরা কয়েকজন পেছনের বেঞ্চে বসে পড়তাম। ভেতর থেকে এত স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব, যাকে বলে প্রদীপ্ত করার নাছোড় উৎসাহ ছিলো দীপংকরদার ভেতরে। সেবার কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদক হয়েছি— ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দীপংকরদা। বললেন, তোমাকেও লিখতে হবে। পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের দুর্মর বাসনা জাগিয়ে তুললেন। কী লিখবো? বললেন, "চে কে নিয়ে লেখো"। তখন বন্দী চে গুয়েভারা মার্কিন টমিদের হাতে বলিভিয়ার অরণ্যে হিগুয়েরা ক্যাম্পে ঝাঁঝরা। সফল বিপ্লবের পর কিউবার রাষ্ট্র পরিচালনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবলীলায় ছেড়ে দিয়ে রুকস্যাক আর রাইফেল হাতে সশস্ত্র বিপ্লবের বিশ্বাসে অটল এই ল্যাটিন মানুষটি বিশ্ব-যুবাদের কাছে বিস্ফোরক আদর্শ। দু একটি বই দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন কীভাবে সাজাতে হবে। পরীক্ষার রচনা ছাড়া আর কিছু রচনা না করা আমি লিখে ফেললাম, "ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসূর্য— চে গুয়েভারা"। কেটে-ছেঁটে-জুড়ে লেখাটিকে দাঁড় করালেন দীপংকরদা। ম্যাগাজিনের পাতায় ছাপার অক্ষরে প্রথম নিজের লেখা, আবেগতাড়িত হয়ে দীপংকরদাকে প্রণাম করলাম। বললেন, "শুরু হলো, যে কোন বিষয়ে লেখার চেষ্টা করে যাবে"। এরকমই আগলে রেখে এগিয়ে দিতেন দীপংকরদা। সময় গড়ালো। সাতষট্টির প্রথম যুক্তফ্রন্ট গড়া, কলকাতার লালদীঘির লালবাড়িতে প্রথম লাল পতাকা ওড়া। সরকার ভেঙে যাওয়া— রাষ্ট্রপতির শাসন, আটষট্টির প্রবল বন্যায় জলপাইগুড়ি শহর ও ডুয়ার্সে প্লাবন— নির্বাচন বাতিল, উনসত্তরে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার, নকশালবাড়িতে গুলি, সরকারের পতন, ধর্মবীর 'বাংলা ছোড়ো-আভি ছোড়ো', চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, পুলিশ তুমি যতই মারো মাইনে তোমার একশ বারো। একাত্তর। সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবাংলার ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বাহাত্তর। বারোটার মধ্যে ভোট শেষ। এই সব বুটের শব্দে ভারী ঝোড়ো উত্তাল প্রহর, বহরমপুর জেলে বন্দুকের গুলি ও বেয়নেটের আঘাতে বিচ্ছিরি সমাজটাকে বদলাতে চাওয়া যুবাদের লাশ হয়ে যাওয়া, নানা বাঁকে, দীপংকরদা প্রবল সক্রিয়। কখনো কাছ থেকে, কখনো দূর থেকে দেখছি। ছিয়াত্তরে মিসাবন্দী। জেলে দেখতে যেতাম আরএসপি-র কৃষক নেতা জয়ন্ত বিশ্বাসের জন্য চারমিনার এবং দীপংকরদার জন্য কিছু পত্রিকা-বই। সেই পর্বের পর মুক্ত দীপঙ্করদা আবার স্ব-ভূমিকায়। দীপংকরদা মানেই সংগঠন। কত যে সংগঠন গড়েছেন সারাজীবনে— বন্দীমুক্তি আন্দোলন, লিটল ম্যাগাজিন, সিনে ক্লাব, মানবাধিকার কমিটি, সাংবাদিক সঙ্ঘ, আরো কত। এবং 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ'-এর মতন পত্রিকা চালানো। যখন বহরমপুরের বাস ছেড়ে দিলেন, বাম-ডান সবার কাছেই মনে হলো শহরটা তেজ ও রং হারিয়ে বড় শূন্য হয়ে গেল। কলকাতা এসেও সেই সংগঠন ও পত্রিকা। মানবাধিকার, অনীক, পিবিএস ইত্যাদি। কিন্তু প্রিয় কর্মভূমি ও বহরমপুর শহরটাকে ভুলতে পারেননি। কৃষ্ণনাথ কলেজের দেড়শো বছর। ঘড়ি মিনার সারাতে হবে, ভাঙা চোরা বর্ণহীন স্থাপত্যকে সারিয়ে রংদার পুরোনো জৌলুষ-আভিজাত্য ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রচুর ভালো আলোচনা, বিতর্কসভা এবং একটি ভালো সংরক্ষণযোগ্য স্মারকপত্রিকা, এত সব করতেই হবে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন দীপংকরদা। প্রণববাবু তখন যোজনা কমিশনের দায়িত্বে। দীপংকরদার প্রণোদনায় অশোক দাশগুপ্ত, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপংকরদা ও আমি প্রণববাবুর কাছে হাজির, সব শুনে বললেন একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন ও কলেজের অধ্যক্ষ মিলে প্রস্তাবসহ আবেদন করতে। লেগে পড়লেন দীপংকরদা। প্রজেক্ট রিপোর্ট বানানো হলো। বিধানসভায় নৌশের আলি হলে, বিজ্ঞাপন দিয়ে আহূত সভায় গঠিত হলো কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তনী সঙ্ঘ।

প্রাক্তনী সংঘের আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রতিশ্রুতি মতন প্রণববাবু যোজনা কমিশন থেকে মোট দু-কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা অনুমোদন করলেন যা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কলেজে পৌঁছলো। কলেজ ভবন মেরামত ও নতুন ভবন হোল সেই টাকায়। অনবদ্য স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হলো দীপংকরদার অপরিহার্য্য সম্পাদনায়।

এবার নেমে পড়লেন মুর্শিদাবাদ সম্মিলনী করতে। নজরুল ইসলাম, সুদেব রায়, বিকাশ সিংহ, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ বাজপেয়ী, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ জানা-অজানা প্রবাসী মুর্শিদাবাদীদের তালিকা, ফোন, প্যাডের পাতা, রাবার স্ট্যাম্প নিয়ে দীপংকরদার ব্যাগে মুর্শিদাবাদ সম্মিলনীর দপ্তর। নানা কারণে দানা বাঁধার পথে একটু ঢিলে পড়েছিল। সেই মুর্শিদাবাদ সম্মিলনী শেষ পর্যন্ত হলো। মোহরকুঞ্জে শেষ বিকেলের আলোয় জেলার কৃতী ছাত্রদের হাতে বই ও অনুদান তুলে দেবার সময় প্রধান উদ্যোক্তা প্রিয় দীপংকরদা আর নেই। মেডিক্যাল কলেজে দেহ রেখে গেছেন। মুর্শিদাবাদ সম্মিলনীর রাবার স্ট্যাম্পটা হয়তো অন্য কারুর কাছে।

অন্য মানুষ, হারানো প্রজাতির মানুষ ছিলেন তিনি। তীক্ষ্ণযুক্তির ঠাসবুনোটে অব্যর্থ শব্দসন্ধানী দীপংকরদার সব বক্তৃতাই নিখুঁত জ্যামিতিক নির্মিতি। আত্মদীপনের দীক্ষা। দীপংকারদার জ্বালানো দীপের শিখা অনির্বাণ থাকুক। যে কাজটি শেষদিন পর্যন্ত করছিলেন তা চলতে থাকুক— ছড়িয়ে পড়ুক— চারিয়ে যাক। দীপংকরদা তো থাকবেনই আমাদের মধ্যে।

# দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে

**হিরণ্ময় ধর**

মোবাইলে খবর পেলাম দীপংকর— দীপু— মারা গেছে— রাত সাড়ে নটায়। ঠিক বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা তখন। প্রেরকের নাম ছিল না, মোবাইলের নম্বর ছিল মাত্র। অনীকেরই কেউ খবরটা দিয়েছিল বোধহয়। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এবং অত্যন্ত দুঃখের কথা দীপুর চলে যাওয়া। সব কিছুর ইতি আছে— জীবনেরও। তবু এই রকম এক বহুমুখী, কর্মী বন্ধুর হঠাৎ অসময়ে চলে যাওয়া খুব-ই বেদনাদায়ক। তর্ক করার লোক কমে গেল। কলকাতায় আড্ডা মারার একটা জায়গা চলে গেল।

কবে দীপুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল মনে নেই। সম্ভবত ১৯৬০-এর দশকের একেবারে প্রথমদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ক্লাসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ তখন বরানগরে। ক্লাসের বন্ধু। বিভাগের ক্যান্টিনে চা এবং রাজনীতির সঙ্গে অন্য আরো অনেক কিছু চর্চা হত, যেটার জের প্রায়ই পৌঁছত কফি হাউস্ পর্যন্ত। এইভাবেই আমাদের পরিচয় শুরু।

বুদ্ধিমান ছাত্র ছিল। তখন থেকেই লেখার— বিশেষ করে বাংলা লেখার— জন্য নাম ছিল। নিয়মিত ক্লাসে আসত। তবে পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারটা বেশ সহজভাবে নিত। মনে আছে এম এ পরীক্ষার ফল বেরোবে। তখন দারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ নিচের তলায় পরীক্ষার রেজাল্ট টাঙানো হতো— তিনটের পর। কফি হাউসে বসে আছি— তিনটের পর রেজাল্ট দেখতে যাব। তিনটের একটু আগে দীপু এল। আমি ওঠার জন্য ব্যস্ত। আমাকে ধরে বসিয়ে বলল, 'এত ভাল পরীক্ষা দিইনি যে ফার্স্ট ক্লাস পাব, এমন খারাপ দিইনি যে ফেল করব, তবে চিন্তা কিসের, বস, কফি খা।' এই ধরনের কথাবার্তা ওর মুখে আমি অনেকবার শুনেছি। ছাত্র রাজনীতি করত চুটিয়ে। রাজনীতি চর্চায় ছিল সিদ্ধহস্ত।

আমাদের ছাত্র জীবনের প্রারম্ভিক সময়েই নকশালবাড়ির ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই নকশালবাড়ি এবং নকশালবাড়ির পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ আমাদের চিন্তাভাবনায়, বিশেষ করে রাজনৈতিক চিন্তায়, এবং কর্মজীবনে প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আমার ধারণায় আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা নকশালবাড়ি আন্দোলনের— বিশেষ করে গণআন্দোলনের— শিক্ষাকে নিজের কর্মজীবনে এবং নিজের চিন্তাধারায় নিজের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে দীপংকর চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একজন।

গত বছর জুলাই মাসে অরবিন্দ্ মেমোরিয়াল সেমিনারে দীপু লক্ষ্ণৌ এসেছিল— তিন দিনের জন্য। আমিও ছিলাম সেমিনারে। সেমিনারের পর দুটি সুন্দর সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম এক সঙ্গে— আমাদের পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্বের ইতিহাস রোমন্থনে।

দীপুর কথায় তিনটে কথার উল্লেখ ছিল বারবার। প্রথমটা ইংরেজিতে ওর ভাষাতেই ওরই প্রবন্ধ থেকে বলা যায়:

"the earnest and sincere hope... of a new orientation as well as program of action suitable... to achieve and secure the basic economic, social and cultural rights paving the way for the achievement.. of the civil and political right of the people."

(Dipankar Chakrabarti, "In search of a realistic approach towards the Human Rights Movement in India", paper presented in the 3rd Arvind Memorial Seminar, july 22-24, Lucknow)

অনীক-এর লেখক এবং পাঠকদের কাছে এর অর্থ অজানা নয়। অনীক-এর কথাও অনেকবার উঠেছিল। অনীকের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস আলোচলান্তে ও বলেছিল: "অনীকের ভবিষ্যতের চিন্তা আমার আর নেই"। অসুখের কথাও কয়েকবার উল্লেখ করেছিল। ইদানিং প্রায়ই লাংস-এর রোগের কথা বলত। বলত, সাবধানে থাকতে হচ্ছে। জানিনা সেই রোগই দীপুকে শেষ করল কি না।

**স্মরণ**

লাতিন আমেরিকার নব্য উদারবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো চ্যাভেজ প্রয়াত হয়েছেন ৫ মার্চ ২০১৩। বর্তমান পর্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার মাটিতে যে লড়াই জারি আছে তিনি ছিলেন সেই লড়াইয়ের অন্যতম স্থপতি। আজকের একমাত্রিক বিশ্বে কিউবা সহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সাথে তিনি 'দক্ষিণ-দক্ষিণ' সহযোগিতার যে উদাহরণ তৈরি করেছেন তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলায় আগ্রাসী পুঁজিবাদ বিরোধিতার ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের যে অনুশীলন চলছিল তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনীক তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিরলস যোদ্ধা কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী

**সন্তোষ রাণা**

১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হল। পশ্চিমবঙ্গ নামে নতুন রাজ্যের জন্ম হল। ক্ষুধা ও দারিদ্রে জর্জরিত সেই রাজ্য। ১৯৪২-এর দুর্ভিক্ষের রেশ তখনো থেকে গেছে। থেকে গেছে বুভুক্ষু কৃষক— জমিদার ও মহাজনরা যাদের রক্ত শুষে নিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ কৃষির উৎপাদনশীলতা ছিল নিতান্তই কম। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে চালের উৎপাদন ছিল মাত্র ৩৫ লক্ষ টন (এটা ২০০১ সালের উৎপাদন ১৩০ লক্ষ টনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ)। তার উপর দেশভাগ জনিত কারণে শুরু হল উদ্বাস্তু স্রোত। সব মিলিয়ে স্বাধীনতার উষালগ্নেই পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য সংকট দিয়ে যাত্রা শুরু করল।

এই খাদ্য সংকট সমাধানের একমাত্র রাস্তা ছিল কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। সেটার প্রাথমিক শর্ত ছিল আমূল ভূমি-সংস্কার। কৃষি জমির প্রায় ৪০ শতাংশ চাষ করতেন ভাগচাষিরা, যাদের জমির উপর কোন স্বত্ব ছিল না। জমিদার যখন খুশি তাদের জমির থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা তারও বেশি জমিদার নিয়ে নিত। খেতমজুর গরিব কৃষক ও ভাগচাষিরা ছিলেন মূলত নিম্নবর্ণের। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক নিপীড়নের ফলে এদের মাথা তোলার সুযোগ ছিল না।

পরাধীন ভারতবর্ষেই কৃষকরা ভূমিসংস্কারের দাবি তুলেছিলেন। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই আন্দোলন নতুন তেজে বিকশিত হয়েছিল। কৃষকরা ভেবেছিলেন যে দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে তখন তাঁরাও জমির অধিকার পাবেন। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতাসীন নতুন সরকার তেভাগাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল আলিপুরের তৃতীয় ট্রাইবুন্যাল মামলা (রাষ্ট্র বনাম কংসারি হালদার ও অন্যান্যরা)। কংগ্রেস সরকার ভূমি সংস্কার করতে অস্বীকার করায় খাদ্য সংকট সমাধানের কোন পথ রইল না। খাদ্যের দাবিতে মানুষ পথে নামল। তৈরি হল ১৯৫৯ ও ১৯৬৬-র ঐতিহাসিক খাদ্য-আন্দোলন। মাঝে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টা হল এবং কমিউনিস্টদের জেলে ভরা হল। কিন্তু যে মানুষ সমাজের পরিবর্তন চাইছিলেন, তাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা গেল না। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন এক গণ-বিদ্রোহের রূপ নিল। এবং শেষ পর্যন্ত নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান আবার আমূল ভূমি-সংস্কারের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এল।

কমঃ দীপংকর চক্রবর্তী দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিলেন এবং পশ্চিম বাংলার গড়ে ওঠা এই সব গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৬২ সালে যুদ্ধের সময় সঠিকভাবেই তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং জীবনভর ভারত-চীন মৈত্রীর অক্লান্ত সৈনিক ছিলেন।

সিপিআই(এম) তৈরি হওয়ার পর প্রথম থেকেই বামপন্থী কমিউনিস্টরা নেতৃত্বের সংশোধনবাদী মনোভাব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং অনেক বিপ্লবী গ্রুপ তৈরি হচ্ছিল। আমি যতদূর জানি, কমঃ দীপংকর যে গ্রুপটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা ভারতীয় বিপ্লবের স্তরকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বলে মনে করতেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যখন নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান ঘটল তখন তার পাশে দাঁড়াতে তাঁর কোন দ্বিধা হয় নি। সিপিআই(এম এল) তার গঠনের দিন থেকেই যে কতগুলি অতি-বাম লাইন নিয়েছিল, তিনি সেগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। একদিকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং একই সঙ্গে বাম হঠকারী লাইনের সমালোচনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাটা বেশ কঠিন কাজ। কেউ কেউ বাম হঠকারী লাইনের সমালোচনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্নে কমঃ দীপংকর চক্রবর্তী সঠিক অবস্থান নিয়েছিলেন। ২০০৯ সালে জঙ্গলমহলে মাওবাদী আন্দোলনের সময়েও তিনি এই ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন।

১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থা ভারতীয় জনগণের কাছে আর এক অগ্নিপরীক্ষা ছিল। অনেকেই জরুরি অবস্থার সময় চুপচাপ থেকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দীপংকর চক্রবর্তী সে ধাতের মানুষ ছিলেন না। 'অনীক' পত্রিকায় তিনি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লিখে জেলে গেলেন এবং গোটা জরুরি অবস্থা জেলে কাটালেন।

১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসালেন। এই সরকার গোড়ার দিকে গণতন্ত্রের প্রসারে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা নিল কিন্তু তারপর দলীয় শাসন কায়েম করার চেষ্টায় গণতন্ত্রের উপর আঘাত শুরু করল। কমঃ দীপংকর চক্রবর্তী এই পর্যায়েও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ালেন। তিনি সিপিআই(এমএল)-এর কোন গ্রুপের সদস্য না হলেও এই গ্রুপগুলি তাঁকে বন্ধু ও পরামর্শদাতা হিসাবে সম্মান করত। তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি এই সম্মান অর্জন করেছিলেন। অবশেষে বামফ্রন্ট সরকার যখন বামপন্থার বিপরীতে দাঁড়িয়ে

এর পর ৪০ পৃষ্ঠায়

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# আদ্যোপান্ত এক রাজনৈতিক চরিত্র

**প্রশান্ত রায়**

দীপুদার মতো এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে আমি খুবই কম দেখেছি। অথচ চিরাচরিত অর্থে রাজনীতি করা বলতে যা বোঝায় তা তিনি প্রায় কোন দিনও করেন নি। কিন্তু রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্ভাব্য প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর সে স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস বিচরণ তার সবগুলিকে যে অন্তঃশীল সূত্র গেঁথে রেখেছিল তা ছিল তাঁর সুস্পষ্ট, অবিচল এবং বলিষ্ঠ একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস। পত্রিকা সম্পাদনা থেকে প্রকাশনা, মানবাধিকার আন্দোলন থেকে উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন, ফিল্ম সোসাইটি থেকে গণসংস্কৃতির মঞ্চ গড়ে তোলা— তাঁর এই বহুবিচিত্র উদ্যোগকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রেখেছিল ঐ রাজনৈতিক বিশ্বাসটিই। এটিই ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্মক্ষমতা এবং ঈর্ষণীয় প্রাণবন্ততার প্রধান উৎস। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কথায় ও কাজে যে গভীর প্রত্যয়ের একটি ছাপ থেকে গিয়েছিল— যে প্রত্যয় এমনকি তাঁর তরুণতর প্রজন্মের সহকর্মীদের উজ্জীবিত করে তুলতো— তারও মূলে ছিল সেই স্বতঃপ্রবহমান রাজনৈতিক বিশ্বাস। এটা বেশ খানিকটা বিস্ময়কর তো বটেই যে যখন তাঁর সমসাময়িক বন্ধু ও কমরেডদের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, এমন কি তাঁদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দল করেছেন— তাঁরাও যখন বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস খুইয়ে হয় রাজনীতি ছেড়েছেন নয়তো একদা পরিত্যক্ত সংশোধনবাদী রাজনীতির নিরাপদ উষ্ণতায় আশ্রয় নিয়েছেন— তখন কীভাবে তিনি ভূপাতিত বাহিনীর মধ্যে ঋজু দাঁড়িয়ে রইলেন অটল, নিঃসংশয়!

একথা মনে করার কোন কারণ দেখি না যে দীপুদার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিকদল করার ব্যাপারে কোন স্বভাবজাত প্রতিরোধ ছিল, বা বিপ্লবী রাজনীতির ঝঞ্ঝাবাত্যায় কোন ভয় ছিল। জরুরি অবস্থার মধ্যে দীর্ঘকাল গ্রেপ্তার হয়ে থাকা বা মুচলেখার বিনিময়ে ছাড়া পাওয়ার সরকারী প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত। ১৯৬৭-র মে মাসে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন মধ্য দিয়ে ভারতে যে কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয় তার সঙ্গে একাত্ম হতে দীপুদা কালক্ষেপ করেননি। আবার এই আন্দোলন যখন অচিরেই বিশেষত সিপিআই(এমএল) গঠনের সময় থেকেই বিচ্যুতির শিকার হয়ে পড়ে তখন তার বিরোধিতা করতেও এক মুহূর্ত দ্বিধা করেন নি। ১৯৭১ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেই সিপিআই(এমএল)-এর অতিবাম রাজনীতির বিরুদ্ধে তৎকালীন পার্টির অনেকেই সোচ্চার হন এবং একটি বড় অংশ 'পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি' নাম দিয়ে নতুন করে চলার চেষ্টা করে। দীপুদা তখন এই অংশটির সাথে একাত্ম হতে কোনও বাধা বোধ করেননি। এই সময় দীপুদা মনস্থ করেন যে এই অংশটির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে সংগঠিত করার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করবেন। এই পর্যায়ে তিনি কঠোর গোপনীয়তার মধ্যেই 'পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির' সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কার্যক্রম নিয়ে একাধিক বৈঠক করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে এবং তারও কিছু পরে এই সংগঠনটিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় থেকেই দীপুদার রাজনৈতিক উপলব্ধির দুটি বিষয় স্পষ্ট রূপ পায়, তিনি এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে গভীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করেন। একই সঙ্গে এই আন্দোলনের বিপ্লবী অন্তর্বস্তুকে রক্ষা করাটাকেও এক জরুরি কর্তব্য বলে মনে করতে থাকেন। আর ঠিক এখানেই দীপুদা অন্তত অনেক সাথীর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, কিন্তু দমলেন না। দমলেন না কারণ এই বিশ্বাস তাঁর গভীরে প্রোথিত হল যে এই অবস্থানটিই রাজনৈতিকভাবে সঠিক এবং আগামী দিনে ভারতীয় বিপ্লবের জন্য সঠিক লাইন উৎসারিত হবে এই অবস্থান থেকেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীপুদা এই অবস্থানে অটল ছিলেন।

দীপুদার এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দেবার জন্য এবং তাকে আরও বিকশিত করার জন্য একেবারে রেডিমেড হাতিয়ার মজুদ ছিল। সেটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'অনীক'। এই পত্রিকাটি কোনও গ্রুপের মুখপত্র না হওয়ার কারণে এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবী গ্রুপের এবং ব্যক্তির মতপ্রকাশের এক অবাধ ক্ষেত্র হবার কারণে অচিরেই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো। কালক্রমে এটি বিপ্লবী শিবিরের এক অভিন্ন মুখপত্র হয়ে উঠলো এই অর্থে যে এটি সংশোধনবাদবিরোধী ও অতিবাম বিরোধী সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভূমিকা রাখতে শুরু করলো। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি 'অনীক' হাতে নিল তা হলো পূর্বে উল্লেখিত ঐকমত্যের উপর দাঁড়িয়ে এই পত্রিকা বিভিন্ন শিবিরভুক্ত গ্রুপ ও ব্যক্তির রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এমনকি কখনও কখনও সাংগঠনিক প্রশ্নে পারস্পরিক বিতর্কের সূত্রপাত করলো। আর এই কাজটিই ছিল এই মুহূর্তে সব চেয়ে জরুরি। ভারত সহ সমগ্র পৃথিবীতেই যখন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় চলছে, মার্কসীয় তত্ত্বের সারবত্তা যখন গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন এবং সর্বোপরি যখন মার্কসীয় তত্ত্ব অনুশীলনে উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়, তখন তো এই উদ্যোগটিই প্রয়োজন। 'অনীক' তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে যে এই কাজটি বহু বছর ধরে চালিয়ে যেতে পারলো তার সিংহভাগ কৃতিত্বই ছিল

দীপুদার। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও "অনীক" সংকীর্ণতা-বর্জিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন মতকে ধারণ করে গেছে কিন্তু বরাবরই তার নিজস্ব একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক ভাবনা ছিল। সেটা 'অনীক' কখনই তীক্ষ্ম ও উচ্চস্বরে ঘোষণা করে নি, অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই কখনও ছিল না। শ্রেণী সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত যে সেটা পারা যায় না সেটা 'অনীক' বুঝতো। 'অনীক' যে তার সীমাবদ্ধতা ভালভাবেই বুঝতো সেটাই ছিল তার সবলতা।

জন্মক্ষণ থেকেই আমাদের দেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের (জনবোধ্য ভাষায় যাকে 'নকশালপন্থী আন্দোলন' বলে) সব চেয়ে বড় অভিশাপ ছিল তার প্রায় অসংশোধনযোগ্য মতান্ধতা। আশ্চর্যজনকভাবে 'অনীক' ও তার সম্পাদক ছিলেন এই ব্যাধি থেকে মুক্ত। পুরনো ধ্যানধারণার যা কিছু বাস্তবের সঙ্গে খাপ খেত না, অন্ধের মতো অনুসরণ করা পুরনো যে স্বতঃসিদ্ধগুলিকে চলমান জীবন প্রত্যাখ্যান করছে, তাদের বর্জন করে নতুনভাবে ভাবার সহজাত একটি ক্ষমতা দীপুদা অর্জন করেছিলেন। রণনীতিগতভাবে নির্বাচন বয়কট করা যখন এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান একটি রাজনৈতিক লাইন ছিল, তখন দীপুদা তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে সেই লাইনের যাথার্থ্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস দেখালেন এবং ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই ভারতের মতো দেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। আজ বোঝা যাবে না, অত বছর আগে এ কথা বলতে কী ধরনের হিম্মত প্রয়োজন ছিল। 'খতম'-এর লাইনের তো প্রথম থেকেই বিরোধী ছিলেন, প্রথম থেকেই গণ-আন্দোলন গণ-সংগঠন বর্জনের লাইন তিনি সজোরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর যখন নির্বাচনের অংশগ্রহণের কথা বলেন তখন অতিবাম রাজনীতির বিরোধিতার একটি বৃত্ত তিনি সম্পূর্ণ করলেন। কিন্তু এখানেই থেমে তাকলেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ খোলা মনে ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে স্বীকৃতি দিতে দিতে গেছেন। যেখানে বিতর্ক প্রয়োজন বিতর্ক করেছেন। যেখানে বিভিন্ন মতের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সত্যকে উদঘাটিত করার প্রয়োজন, সেখানে তার সুযোগ করে দিয়েছেন। অনীকের "কৃষি-বিতর্ক সংখ্যা" যার চমৎকার উদাহরণ। এটি ছিল তাঁর সম্পাদনায় 'অনীক'-এর শেষ বিশেষ সংখ্যা।

দীপুদাদের সংখ্যা এখন বিরল হয়ে গেছে। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বলতে যা বোঝায় তা এখন কোথায়? কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা বা ঐ আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে যারা খানিকটা তত্ত্বচর্চা করতেন তাঁদের এক বড় অংশ ঐ আন্দোলনের ভুলগুলি বিশ্লেষণ করতে করতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আসলে সিপিএম-এর প্রয়োগগত কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দিলে তার মৌলিক রাজনীতিই ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সঠিক লাইন। তাঁদের এই উপলব্ধির পিছনে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই পার্টিটি ১৯৬৭ সালের পর থেকে আর ভাঙ্গেনি এবং বাম মনোভাবাপন্ন মানুষদের এক বড় অংশকে সে তার পতাকার নীচে ধরে রাখতে পেরেছে। ভারতীয় বিপ্লবের মৌল সমস্যা— ক্ষমতা দখলের সমস্যা বা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েমের সমস্যাকে সিপিএম কীভাবে মোকাবিলা করার কথা ভাবছে তা নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথাই নেই। বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন কেন মুখ থুবড়ে পড়েছে তা নিয়েও এদের কোন উদ্বেগ দেখি না। হয়তো এগুলি নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের কাছে বিপজ্জনক মনে হয়, কারণ তা করতে গেলেই terms of reference হিসেবে বারে বারে উঠে আসবে নকশালপন্থী আন্দোলনই, পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা মডেল নয়। বুদ্ধিজীবীদের অপর একটি অংশ তো অধঃপতনের আরও একধাপ নেমে হয়েছেন 'পরিবর্তনপন্থী'। এ রকম একটি দুঃসময়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দৃশ্যমান ছিলেন দীপুদা— যিনি প্রকৃত অর্থেই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে আজীবন ধরে রেখেছিলেন। আর সেই কারণেই তার চলে যাওয়াটা এত বড় শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল।

দীপুদা-হীন 'অনীক' দীপুদার মতই খোলা এবং অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ভারতীয় বিপ্লব ও গণআন্দোলনের সমস্যাগুলি নিয়ে যদি নির্ভীক চর্চা চালিয়ে যেতে পারে তবেই তাঁর স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হবে।


**পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা**

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৬)
নিয়মাবলীর ৮নং ধারা অনুযায়ী

পত্রিকার নাম ❑ অনীক
প্রকাশের স্থান ❑ প্রযত্নে: পিপল্‌স বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার
কলকাতা ৭০০০০৯
প্রকাশকাল ❑ মাসিক
প্রকাশক, মুদ্রক ও স্বত্বাধিকারী ❑ মীরা চক্রবর্তী
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা শ্যামবিহার, ব্লক ৫, ফ্ল্যাট ১/ডি
রঘুনাথপুর, কলকাতা - ৫৯
সম্পাদক ❑ প্রণব কুমার দে
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা ২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড
ফ্ল্যাট নং ১৬, কলকাতা - ৫৪

*আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।*

স্বাক্ষর : মীরা চক্রবর্তী

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে কয়েকটি কথা

অসীম চট্টোপাধ্যায়

কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী আর নেই। বিতর্কের গন্ধ পেলেই সেই এক মাথা কাঁচা-পাকা অবিন্যস্ত চুল নিয়ে বঙ্কিম গ্রীবার বেয়াড়া ভঙ্গি, চশমার কালো ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে তির্যক দৃষ্টি, ব্যতিক্রমহীন শানিত যুক্তির বয়ান এবং বিতর্ক শেষে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল আলো করে উদার, নির্মল হাসি— অতঃপর অতি-পরিচিত এই ভঙ্গির অভাব অনুভব করবো পরিচিত মহলের আমরা সকলেই। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি অনুভূত হবে তাঁর অনন্য ভূমিকার অনুপস্থিতি— কয়েক দশক ধরে কমিউনিস্ট বিপ্লবী ও প্রগতিশীল সকল মহলে কমরেড দীপংকর অনস্বীকার্যভাবে যে বিবেকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। চারপাশের গড্ডলিকা প্রবাহের মাঝে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাথা উঁচু করে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী।

অসম্ভবপ্রায় কাজগুলিকে অসম্ভব জেদ নিয়ে সম্ভব করতেন তিনি। প্রকাশনা জগতের সাথে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে কোন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করে যাওয়া কত কঠিন। রাজধানী কলকাতা থেকে প্রকাশনাই দুরূহ, কিন্তু সুদূর মফঃস্বল শহর থেকে এমন উদ্যোগ অসম্ভবপ্রায় প্রয়াস। এই অসম্ভব কর্মটিই কমরেড দীপংকর সুদূর বহরমপুরে ১৯৬৪ সাল থেকে প্রথমে 'পুনশ্চ' পরে 'অনীক' লাগাতার আমৃত্যু প্রকাশ করে সম্ভব করেছিলেন। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে আগামী প্রজন্ম তাঁর এই অসম্ভবপ্রায় প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে এবং এ থেকে অনুপ্রেরণা পাবে।

কমরেড দীপংকরের সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভবত ১৯৭৬ সালে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে। তার আগে অনীক'-এর মাধ্যমে তাঁকে জানতাম— সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। হাজারিবাগ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আমি আলিপুরে আসি ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার পর গ্রেপ্তার হয়ে দীপংকর কিছুদিন পর আলিপুরে আসেন। এখানে আমাদের দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ মেলে। মনে আছে যে জরুরি অবস্থা জারির ঠিক আগে তিনি 'অনীক' পত্রিকায় 'ঝড় আসছে' শীর্ষক যে গুরুত্বপুর্ণ সম্পাদকীয় লেখেন, তা আমাদের আলোচনাকে অনেকাংশে মসৃণ করে। ফল হয় এটাই যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এমনকি সিপিআইএমএল দলের মূল্যায়নের প্রশ্নেও আমরা অভিন্ন অবস্থানে ছিলাম। এই সময়কালেই কমরেড সৌরেন বসু ও কমরেড কানু সান্যাল অন্ধ্র থেকে আলিপুরে চলে আসায় আমাদের আলোচনা আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাই ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে কমরেড দীপংকর ছাড়া পাওয়ার পর আমার প্রত্যাশা ছিল যে তিনি আমাদের অবস্থান নিয়ে বাইরে লড়ে যাবেন। বলতে দ্বিধা নেই যে আমার এই প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। বলা প্রয়োজন যে এই প্রত্যাশা মোটেও ভিত্তিহীন আশাবাদের ফল ছিল না। কারণ স্মরণ করা যেতে পারে যে আমাদের অনুসৃত 'খতম' লাইন ও গণ-সংগঠন, গণ-আন্দোলন বয়কটের প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছিলেন কমরেড দীপংকর। তাই, আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এই সত্য যে আমরা যখন এইসব সামাজিক সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত ছিলাম, তখন কমরেড দীপংকর সঠিক অবস্থান নিয়ে কমঃ নাগি রেড্ডি, কমঃ ডি ডি রাও, কমঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, কমঃ অসিত সেন, কমঃ মণি গুহ, কমঃ বনবিহারী চক্রবর্তীদের মতোই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একাংশকে রক্ষা করেছিলেন।

কমরেড দীপংকরের জীবনাদর্শ ছিল সরল, অনাড়ম্বর, কর্মময়, সংযমী ও চিন্তাশীল জীবন। নিজে চিন্তার জগতে বিচরণ করে দীপংকর বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন চিন্তার সংঘর্ষই চিন্তার বিকাশকে সুনিশ্চিত করে এবং নিত্যনতুন ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে। তাই চিন্তার সংঘর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রত তিনি আজীবন লালন করে গেছেন। আজ যখন অনুশীলিত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে দুনিয়া জুড়ে মতাদর্শগত সংকট অনিবার্য হয়েছে, তখন তাঁর এই প্রয়াস নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সামগ্রিক পরিবেশে নিহিত সহনশীলতাই চিন্তার সংঘর্ষ ও নতুন চিন্তার বিকাশকে লালন করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত ছোট্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে এই স্মৃতিচারণ শেষ করবো। তাঁর প্রয়াণের অল্প কয়েকদিন আগে অসুস্থ শরীরে কমরেড সুমিতাকে সাথে নিয়ে কমরেড দীপংকর আমার বাড়িতে এসেছিলেন। লেখার অনুরোধ নিয়ে অনেক সম্পাদকই এমন এসে থাকেন। তাই আমি ভেবেছিলাম যে 'অনীক' পত্রিকায় লেখা দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে তিনি এসেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে *অনীক*-এ লেখার তাগিদে নয়, আমার সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনার হদিশ পাওয়ার জন্য অসুস্থ শরীরে স্বয়ং সম্পাদকমশাই হাজির হয়েছেন আমার দরজায়!

এটাই কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী।

লালসেলাম, কমরেড।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# মার্কসীয় তত্ত্বচর্চার বিশিষ্ট সূত্রধরকে মনে রেখে

**অরিন্দম সেন**

দুঃসংবাদটা এসেছিল যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। এই তো সেদিন ফোনে কথা হল। বলছিলেন পত্রিকার আগামী সংখ্যার লেখা দেওয়ার কথা। এর আগে যতবার বলেছেন, প্রায় প্রত্যেক বারই সোৎসাহে সাড়া দিয়েছি। এবার বলতে হল, কিছু ব্যস্ততায় এই মুহূর্তে পেরে উঠছি না। তখন কি জানতাম, আন্তরিক উষ্ণতায় ভরা সেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না! আফশোষ রয়ে গেল, অগ্রজ অগ্রণী সাথীর শেষ আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয়ে উঠল না।

প্রথমটায় যতই খারাপ লাগুক না কেন, পরে অন্যভাবে ভেবেছি। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে দীর্ঘকাল কাটিয়ে যাওয়ার চাইতে এইভাবে রণক্ষেত্রে শেষ শ্বাস নেওয়াটাই বোধহয় দীপংকরদার মত আজীবন-অনীকের পক্ষে মানানসই ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, জেল খেটেছেন আরও অনেকের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর বিশেষ ও দীর্ঘকালীন কাজটা ছিল বামপন্থী আন্দোলনে অধুনা-অবহেলিত তাত্ত্বিক সংগ্রামের ময়দানে। এখানে তিনি সক্রিয় ছিলেন একেবারে শেষ পর্যন্ত।

আজ থেকে প্রায় ১৪০ বছর আগে 'জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ' বই-এর ভূমিকায় এঙ্গেলস বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের তিনটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্রের কথা বলেছিলেন, তাদের যথাযথ সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন তত্ত্বগত, রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক অর্থনৈতিক। এর পর ১৯০২ সালে 'কী করতে হবে' বইতে লেনিন এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখলেন— আমরা তো সচরাচর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা বলে থাকি। এঙ্গেলস কিন্তু এ-দুয়ের পাশে সমান গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন তাত্ত্বিক সংগ্রামের কথা। লেনিন আরও লিখলেন, আজকের রাশিয়ায় যখন একদিকে সুবিধাবাদী প্রচার আর অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'ব্যবহারিক কাজ' প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে, তখন এই কথাটাই সবচেয়ে জোর দিয়ে বলতে হবে যে, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোন বিপ্লব হতেই পারে না।

এঙ্গেলস ও লেনিনের এই পথ নির্দেশ বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতেও সমধিক প্রযোজ্য। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমরা অনেকেই এটা অনুশীলন করতে পারি নি। কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী এদিকে নজর দিয়েছেন। এখানেই কেন্দ্রীভূত করেছেন নিজের উদ্যম। একাজে সামিল করেছেন আর অনেককে। তার দায়বদ্ধ পরিচালনায় ''অনীক'' হয়ে উঠেছে বিপ্লবী মার্কসবাদী তত্ত্বচর্চার সদাসক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য মঞ্চ। এক মুক্ত মঞ্চে যেখানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে, আবার সংগঠন-বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গও খোলামেলা মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে পাঠকদের সমৃদ্ধ করেন। যেখানে বিশেষ করে বুনিয়াদী তত্ত্বগত প্রশ্নগুলো, যা অন্যত্র তেমন গুরুত্ব পায় না, নিয়মিত চর্চিত হয় বর্তমান দেশকালের প্রেক্ষিতে। এমন এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান সংগঠক রূপে এবং একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী প্রবন্ধকার রূপে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস কমরেড দীপংকর চক্রবর্তীকে মনে রাখবে।

এ পত্রিকার প্রাণ মানুষটি আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন অফুরন্ত প্রেরণাস্রোত হয়ে। তাই তো প্রত্যয় জাগে, 'অনীক' থামবে না। সৈনিকের সংগ্রাম চলতে থাকবে বিজয় অবধি।

---

## গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিরলস যোদ্ধা

৩৬ পৃষ্ঠার পর

জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ শুরু করল তখন সাচ্চা বামপন্থীদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হল। কমঃ দীপংকর চক্রবর্তীও দাঁড়ালেন। কিন্তু তৃণমূলের সহযোগী হয়ে কিছু সুযোগসুবিধা আদায়ের লক্ষ্য তাঁর ছিল না। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বন্দীমুক্তির প্রশ্নে যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, তখন কমঃ দীপংকর তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ একটা গণতান্ত্রিক বিকল্প খুঁজছে। তৃণমূল দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে। কিন্তু সিপিএম রাজত্বের শেষের দিকের ভয়ংকর দিনগুলো মানুষ ভুলতে পারছেন না। এই রকম অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে একটা গণতান্ত্রিক বিকল্পের প্রয়োজন খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। যেসব মানুষ জীবনভর গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন, এই সময়ে তাঁদের খুব দরকার ছিল। তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে সাহস মানুষের অনেক কাজে লাগত। ঠিক সেই সময়ে কালের নিয়মে দীপংকর প্রয়াত হলেন।

তাঁর সংগে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৭২ সালের গোড়ায়। তার আগে আমরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির লোকেরা বাম-লাইনের বিরোধিতা করেছিলাম এবং কম সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে ''রিভাইভ্‌ড সিসি'' অধীনে কাজ শুরু করেছিলাম। গণ-সংগ্রাম শুরু করার প্রশ্নে তিনি কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর অল্পদিন পরেই আমি গ্রেপ্তার হই এবং জরুরি অবস্থার পর ছাড়া পাই। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সব বিষয়ে সর্বদা একমত না হলেও তাঁর সঙ্গে কথা বলাটা ছিল আনন্দের।

বাংলায় বামপন্থা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে মানুষ বরাবর কম দীপংকর চক্রবর্তীকে মনে রাখবে।

# কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে

প্রদীপ সিংহ ঠাকুর

কমরেড দীপংকর চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যু ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের এক গুরুতর ক্ষতি।

প্রয়াত কমরেড দীপংকর চক্রবর্তীকে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই নানান ভাবে অভিহিত করা হয়। অভিহিত করা যায় গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগণ্য সংগঠক হিসেবে, অভিহিত করা যায় অধঃপতিত বামপন্থার বিরুদ্ধে এবং সংগ্রামী বাম আন্দোলনের পক্ষের সাথী হিসেবে। কিন্তু আমার মনে হয় প্রয়াত কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী প্রথম ও প্রধান পরিচয় হলো, তিনি তৃতীয় ধারায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখপত্র, *অনীক*-এর সম্পাদক।

কমরেড চক্রবর্তী লিখেছিলেন— ''আমরা... ষাটের দশকের বামপন্থী গণ-আন্দোলনের বা সত্তর দশকের আত্মদানকারী অকুতোভয় বিপ্লবী লড়াই-এর আবহে যৌবনের দিনগুলি কাটিয়েছি।''

এটি যেমন তাঁর স্বীকারোক্তি, তেমনি আমাদের সকলের স্পষ্ট স্বীকৃতি হলো এই যে, কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই যৌবনের আবহে গড়ে ওঠা মর্মতেজকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষা করে গেছেন। আর তা রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল *অনীক*।

*অনীক* তার প্রায় পঞ্চাশ বছরের যাত্রাপথে নিজেকে অনেক পাল্টেছে এবং পাল্টেছে ইতিবাচকভাবে। এই পাল্টানোর প্রক্রিয়ায় অতীতের যা কিছু ইতিবাচক, তা রক্ষিত হয়েছে এবং সময়ের পরিবর্তন যে সব পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে, *অনীক* তাও করেছে সৃজনশীলভাবেই। এই সমগ্র কর্মকাণ্ডের সাথে কমরেড চক্রবর্তী অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তিনিই সারথী।

কমরেড চক্রবর্তী শুধুমাত্র ষাটের দশকের বামপন্থী আন্দোলনের ও সত্তর দশকের আত্মদানকারী অকুতোভয় বিপ্লবী লড়াই-এর ঐতিহ্যকেই রক্ষা করেননি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষভাবে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে যে মহাবিতর্ক পরিচালিত হয়েছিল, সে মহাবিতর্কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাও সেতুঙ নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, সেই মহাবিতর্কে কমরেড চক্রবর্তী সক্রিয়ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পক্ষে এবং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে নানান পরিবর্তন সত্ত্বেও সাধারণভাবে সেই অবস্থানেই অটল ছিলেন।

ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে সিপিএম নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার পর কমরেড চক্রবর্তী দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন নকশালবাড়ি সংগ্রামের পক্ষে এবং নয়া সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে। পরবর্তী বছরগুলোতে আমাদের দেশে ও বিদেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু কমরেড চক্রবর্তী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই অবস্থানেই অটল ছিলেন।

প্রয়াত কমরেড চক্রবর্তী যেমন নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্তরের দশকের অকুতোভয় বিপ্লবী লড়াই-এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, তেমনি সেই লড়াই-এর অভ্যন্তরে যখন তখন ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের বিপদ মাথাচাড়া দিয়েছে, সেই সময় তিনি তার সোচ্চারে বিরোধিতাও করেছেন। এই নীতিভিত্তিক মতাদর্শগত অবস্থানের মধ্য দিয়ে কমরেড চক্রবর্তী লেনিনের সেই অমূল্য শিক্ষাকেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন— ''শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে সুবিধাবাদী পাপের প্রায়শই এক ধরনের শাস্তি হল নৈরাজ্যবাদ। এই দুই দানব একে অপরের পরিপূরক।''

কমরেড চক্রবর্তী এবং *অনীক* যেমন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুবিধাবাদ ও নৈরাজ্যবাদ— এই দুই দানবের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, তেমনি আবার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবিরের বহুধা বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও একক সাচ্চা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির বিষয়ে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রয়াস। *অনীক* পত্রিকা এই বিষয়টিতে শত মত উপস্থিত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই বিশ্বাস থেকে যে এই মত বিনিময় একে অপরকে প্রভাবিত করবে এবং বিভক্ত অবস্থার অবসান ঘটবে। সেটা ঘটেনি। তার কণামাত্র দায় প্রয়াত কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী ও *অনীক*-এর নয়। তার দায়, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই আমাদের, আমাদের সকলের।

একইভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কমরেড চক্রবর্তী ও *অনীক*-এর পক্ষ থেকে গভীর বিপ্লবী আশাবাদ, যখন তাঁরা 'সমাজ পরিবর্তনের আবশ্যিকতার' গুরুত্ব সজোরে উত্থাপন করেন আর তার প্রয়োজনই 'প্রয়োজনীয় অনুশীলনের প্রতি' আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কমরেড চক্রবর্তী বলেন— ''কোনও সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সেই সমাজ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি গড়ে তোলা দরকার''। আর এই কাজটি আমাদের দেশের ''সমাজ সচেতন মানুষেরা

বিশেষত এই লক্ষ্যে অনুশীলনরত বিপ্লবীদের পক্ষেই করা সম্ভব'', তাও কমরেড চক্রবর্তী ও *অনীক* মুক্ত কণ্ঠে জানিয়ে দেয়। আর এভাবেই তিনি তৃতীয় শিবিরের সাথে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ককে স্পষ্ট করে দেন।

তিক্ত শোনালেও এটা বাস্তব যে, যদিও আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বয়স নব্বই বছরের বেশি, নকশালবাড়ী সংগ্রামের সময় থেকে ধরলে পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি, কিন্তু আজও আমরা ভারতীয় বিপ্লবের নিয়ামক নিয়মগুলির বিষয়ে বহুলাংশে পরাধীনতার জগতেই বসবাস করছি।

মাও সেতুঙ তাঁর দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, দুটি সফল বিপ্লব এবং দুটি ব্যর্থ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সারসংকলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা চীনা বিপ্লবের নিয়ামক নিয়মগুলিকে সূত্রবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং এই পরাধীনতার জগত থেকে স্বাধীনতার জগতে তাঁদের উত্তরণ ঘটেছিল।

প্রয়াত কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী ভিন্ন এক প্রসঙ্গে 'নতুন পথের অন্বেষণের আর্তি'-র কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন 'সব কিছুর নতুন করে মূল্যায়ন করার'। ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে বর্তমানে যে বিশাল মতাদর্শগত-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চলছে, তার সুষ্ঠু নিরসনের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় 'নতুন পথের অন্বেষণ', 'একান্ত দরকার' সব কিছুর নতুন করে মূল্যায়ন করার। অবশ্যই তার অর্থ কখনোই এই নয় যে, স্নান করার জলের সাথে বাচ্চাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।

সময়ের পরীক্ষায় যে সব অবস্থান উত্তীর্ণ হয়েছে, তাকে দৃঢ়ভাবেই সুরক্ষিত রাখতে হবে, আবার সময়ের পরীক্ষা যে সব অবস্থানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন অনিবার্য করে তুলেছে, তাও দৃঢ়ভাবেই করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের বাস্তবতা থেকেই শুরু করতে হবে এবং তথ্য থেকেই সত্যে পৌঁছাতে হবে।

কমরেড চক্রবর্তী এবং *অনীক* বলেছিলেন— ''কোন সমাজের আমূল পরিবর্তন— বিপ্লব-সফল অন্য কোন দেশের অনুকরণ করে সম্ভব হতে পারে না। তাহলে আমাদের দেশে বহুদিন আগেই বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যেতো।''

এই উপলব্ধির প্রতি আমরা আমাদের একশো শতাংশ মতৈক্য ঘোষণা করছি। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের, বিশেষভাবে কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের বর্তমান দুরবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী একদিকে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সম্যক গভীর উপলব্ধির অভাব। অন্যদিকে বিপ্লব-সফল দেশগুলোর অনুকরণের বারংবার প্রচেষ্টা।

সফল বিপ্লব পরিচালনার স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সম্যক গভীর উপলব্ধি এবং ভারতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভারতীয় বিপ্লবের পথের অন্বেষণ। তাই একদিকে যেমন জুতোর মাপে পা কাটা বন্ধ করতে হবে, তেমনি আবার জুতো ছাড়াই হাঁটার ভাবনাও পরিহার করতে হবে।

প্রয়াত কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সেটি হল— আমাদের দেশের আমাদের রাজ্যের অতীতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা উদাহরণ হিসেবে বাংলার রেনেসাঁসের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই বিষয়টিতে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে যেমন দেখা গিয়েছিল সমালোচনাহীন সপ্রশংস মূল্যায়ন, তেমনি দেখা গিয়েছিল সমালোচনাহীন বা প্রায় সমালোচনাহীন সামগ্রিক বর্জন। মাও সেতুঙ-এর শিক্ষা হচ্ছে: ''যে কোন প্রশ্নকেই বিশ্লেষণমূলকভাবে বিচার কর। কোন কিছুকেই বাতিল করো না।''

কমরেড চক্রবর্তী ও *অনীক* এই শিক্ষাটিকেই উর্ধ্বে তুলে ধরে বাংলা রেনেসাঁস ও অন্যান্য বিষয়াদি, ব্যক্তি সংক্রান্ত মূল্যায়নের এক দৃষ্টান্তযোগ্য ধারা গড়ে তুলেছিলেন।

কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের মধ্যে থেকে গেলেন প্রয়াত কমরেড চক্রবর্তী মার্কসবাদের পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রামে, অবক্ষয়ী বামপন্থার প্রতি তীব্র ঘৃণায়। আমাদের মধ্যে কমরেড চক্রবর্তী থাকবেন ভারতীয় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের বিষয়ে তাঁর যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তার বাস্তবায়নের মধ্যে।

কমরেড দীপংকর চক্রবর্তীর প্রয়াণে তৃতীয় শিবির হারালো এক অত্যন্ত দায়িত্বশীল সহযোদ্ধাকে। তিনি আমাদের সকলের কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলেন তার বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেই আমরা তাঁর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখবো।

তার জন্য মার্কসবাদকে বেদবাক্য হিসেবে নয়, কাজের দিশারি হিসেবেই দেখতে হবে। তার জন্য বাঁধা-ধরা ছক, প্রাণহীন সূত্র ও মন গড়া নক্সার ধারা থেকে আমাদের বের হতে হবে। আমরা যা চাই, কিন্তু এখনও যা নেই, তাই বাস্তবে আছে বলে চালাবার চেষ্টা থেকে আমাদের নিবৃত্ত হতে হবে।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# সময়ের প্রেক্ষিতে অপরিবর্তিত দীপংকরদা

**অপরাজিতা মুখার্জী**

বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে আজ অবধি ভারতবর্ষে সংসদীয় বাম রাজনৈতিক ধারার পাশাপাশি অপর একটি ধারা বিপ্লবী কাজকর্ম ও তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় থেকেছে। কখনও কখনও এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, আবার পরবর্তীকালে তত্ত্বগত বিভ্রান্তিজনিত অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সামনে পর্যুদস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। বহু মানুষ এই ধারাবাহিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকেছেন। অনেকে প্রাণ দিয়েছেন, কেউ বা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে যুক্ত হয়ে গেছেন অথবা বিভ্রান্তির মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থান নিয়েছেন। এই বিশেষ সময়কালটি আবার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আপাত বিপর্যয়ের মধ্যে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ নতুন রূপে উপস্থিত হয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসে নতুন মেরুকরণের সৃষ্টি করেছে। এই পর্যায়ে অল্প কিছু মানুষকে দেখা গেছে সরাসরি বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও বরাবর বিপ্লব, গণতন্ত্র ও প্রগতির পক্ষে কাজ করে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বিপ্লবী শিল্প সংস্কৃতি ও তত্ত্বের অগ্রগতি ও প্রচারের ক্ষেত্রে কাজ করে এঁরা বিপ্লবের অতি গুরুত্বপূর্ণ সহকারী ভূমিকা পালন করে গেছেন। দীপংকর চক্রবর্তী ছিলেন তেমনই একটি ব্যক্তিত্ব যিনি সারা জীবন একনিষ্ঠভাবে ভারতবর্ষের বিপ্লবী ধারাটির কাছাকাছি অবস্থান করে অতি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে গেছেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বা তত্ত্বগত বিভ্রান্তি তাঁকে কখনই বিপরীত মেরুর দিকে ঠেলতে পারে নি। তাঁর কাজ ছিল মূলত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত তত্ত্ব ও প্রয়োগের ওপর মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ও বিতর্কগুলিকে সাধারণের কাছে নিয়ে আসা; সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার প্রচার ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সচেতনতার প্রসার ঘটানো।

সময়টা ছিল ষাটের দশকে শেষ দিক। তখনও সিপিআই (এমএল) সংগঠিত দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। সিপিআই(এম)-সিপিআই প্রমুখ সংসদীয় বাম দলগুলি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে অনেক বিপ্লবী গ্রুপ আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের সংগঠিত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। নকশালবাড়ীর বজ্রনির্ঘোষে উত্তাল বাম ছাত্র-যুব সমাজ সংসদীয়-অসংসদীয় বিভাজনে দ্রুত বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেক দলই আবার নতুন করে চীন বিপ্লবের শিক্ষা ও চীনের নয়াগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বোঝবার চেষ্টায় গভীরভাবে চর্চা ও বিতর্ক চালানোর প্রয়োজন বোধ করছে। ভারতীয় সমাজের চরিত্র ও শ্রেণী বিশ্লেষণ, বিপ্লবের স্তর ও প্রধান দ্বন্দ্ব নিয়েও তুমুল আলাপ-আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে ভারতীয় সমাজের চরিত্র আধা-সামন্ততান্ত্রিক-আধা-ঔপনিবেশিক ও বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক— এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সিপিআই(এমএল) পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো ও অসংসদীয় বিপ্লবপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ বিশাল অংশ এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু সব দল এদের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ও সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করছেন এমন বেশ কিছু বিপ্লবেচ্ছু অনুসন্ধিৎসু তরুণ বিপ্লব সংক্রান্ত অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা বিতর্ক চালানোর, চীনের নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর গঠন প্রক্রিয়া ও এরই সঙ্গে ভারতীয় সমাজের চরিত্র ও বিপ্লবের স্তর নিয়ে ভিন্ন বিশ্লেষণ ও চর্চার প্রয়োজনবোধে ছোট দল হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। তেমনই একটি দল ছিল 'পূবের হাওয়া' গ্রুপ, যারা ভারতীয় সমাজ পুঁজিবাদী ও বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক— এই মত সামনে রেখে মূলত অধ্যয়ন, অনুশীলন, চর্চা ও বিতর্ক ও শহরের যুব-ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার মধ্যে নিজেদের যুক্ত রাখত। এই দলের রাজনৈতিক মুখপত্র 'পূবের হাওয়া' পত্রিকাটি প্রকাশনার কাজে যিনি প্রধানত দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি দীপংকর চক্রবর্তী। দীপংকর চক্রবর্তী এর আগে থেকেই *'পুনশ্চ'*— (যা পরে *'অনীক'* নামে প্রকাশিত হয়) এই সাংস্কৃতিক পত্রিকাটি সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক গ্রুপের মুখপত্র হিসেবে 'পূবের হাওয়া' প্রকাশনা সেই সময়ে মোটেই সহজসাধ্য কাজ ছিল না বরং যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ এই পত্রিকায় শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজের চরিত্র, প্রধান দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবের স্তর নিয়ে আলোচনা হত না, সিপিআই(এমএল) পার্টির বিপ্লবী রণকৌশল— গণ-সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে মুক্তাঞ্চল তৈরির আশু কার্যক্রম এবং সেই কাজে ব্যক্তিহত্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার রাজনীতিকে— সরাসরি তীক্ষ্ণভাষায় সমালোচনাও করা হত। ফলে ঝুঁকি ছিল তিন দিক থেকে, একদিকে রাষ্ট্র, অন্যদিকে সিপিআই(এম) ও সরাসরি সশস্ত্র কার্যকলাপে লিপ্ত সিপিআই (এমএল)। দীপংকরদা এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। যদিও লেখাপত্র রচনা ও সম্পাদনার কাজটি করত

এই প্রায় সন্ত্রাসবাদী পার্টির মত অতিশয় কর্তৃত্ববাদী, আমলাতান্ত্রিক গোপন সংগঠনটির তত্ত্বগত মস্তিস্ক স্বরূপ একদল তুখোড় তাত্ত্বিক ও তাদের উপরে অবস্থানকারী একদল কর্তৃত্ববাদী তাত্ত্বিক নেতা — এদের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ গোপন। দীপংকরদা তাঁর সাংস্কৃতিক পত্রিকা *'অনীক'*/*'পুনশ্চ'*-এর পাশাপাশি গোপন পত্রিকা *'পূবের হাওয়া'* প্রকাশ করতেন। তাঁর পরিচয় ছিল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক *'অনীক'* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। সেই সময়েই দীপংকরদার সঙ্গে আমার পরিচয়। যদিও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল খুবই স্বল্প তবুও মনে হত এত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুকৌশলে চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যাঁর হাতে— নিজেকে জাহির করা বা অহেতুক নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার যে চেষ্টা সর্বত্র দেখা যায়— তিনি কীভাবে নিজেকে এসবের বাইরে সরিয়ে রাখেন। তাঁর কথাগুলি ছিল স্পষ্ট, আমার মতো নতুনদের কাছেও নিতান্ত সহজবোধ্য; তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় জুনিয়ার বা অনভিজ্ঞ হিসেবে নিজেকে কখনও ছোট মনে হত না। এইখানে অন্য অনেকের সঙ্গে তাঁর তফাৎ বুঝতাম।

*'অনীক'* পত্রিকার চরিত্র ছিল প্রধানত বাম ও গণতান্ত্রিক; গ্রুপগত সংকীর্ণতার ছায়া এই পত্রিকার উপর সরাসরি প্রকটভাবে পড়ত না। তাই এই পত্রিকা বাম ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বিশ্লেষক, কবি, সাহিত্যিক ইত্যাদি অনেক মানুষের চিন্তাভাবনা ধারণ করতে পারত।

'অনীক'-এর এই বিশেষ চরিত্রের জন্যই হয়ত এই পত্রিকা নানা ঝড় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তার মান বজায় রাখতে পেরেছে। সিপিআই(এমএল)-এর বিপ্লবী ঝঞ্ঝায় এক সময় বাকি অনেক ছোট ছোট গ্রুপের মতো 'পূবের হাওয়া' গোষ্ঠীও অস্তিত্ব হারিয়েছে। পরবর্তীকালে সিপিআই(এমএল) এর ভাঙ্গন ও বহু দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, সংসদীয়-অসংসদীয় পথের সম্মেলনে নতুন পন্থার অনুসরণ ও কৌশলগত প্রশ্নে পুরোনো অবস্থান থেকে সরে এসে নতুন করে গণ-আন্দোলন, গণ-সংগঠনের ভূমিকার গুরুত্ব আরোপ— বিপ্লবী দলগুলির অধিকাংশের চিন্তায় ও কর্মসূচিতে এই সব নানা পরিবর্তন ঘটেছে।

*'অনীক'* পত্রিকা এসবের মধ্যে তার সাধারণ প্রগতিশীল বাম ভূমিকা পালন করে গেছে। বিপ্লবী শিবিরের চরম ছত্রভঙ্গ অবস্থা ও বিভ্রান্তির মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল নিয়মনীতি, আগ্রাসী ভূমিকা ও অগণতান্ত্রিক পন্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে *'অনীক'*-এর ভূমিকা অপরিবর্তিত থেকেছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জনস্বার্থ-বিরোধী বিভিন্ন নিয়মনীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মতামত গঠনে *'অনীক'* উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। জরুরি অবস্থায় ভারত সরকারের সিকিম সংক্রান্ত আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করার জন্য *'অনীক'* সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হন ও বেশ কিছুকাল কারাবন্দী হয়ে থাকেন। কিন্তু এই ঘটনা তাঁকে 'অনীক' প্রকাশনার কাজ থেকে বিরত করতে পারে নি।

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ছিল তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একসময় তাঁর অনুদিত চিং চিন মাই-এর 'বিপ্লবের গান' সদ্য মার্কসবাদী মতাদর্শ বুঝতে আসা অনেক আনকোরাদের মধ্যে পার্টি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, প্রলেতারীয় জীবনযাত্রা, বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে অসাধারণ আবেগ মিশ্রিত উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। অত্যন্ত সাবলীল ও সহজবোধ্য এই অনুবাদটির মর্মস্পর্শী আবেদন ছিল অনস্বীকার্য। আধুনিক পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তত্ত্বের বিকাশকে সাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এসব সম্পর্কিত পল সুইজির মত বিভিন্ন প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের আলোচনা ও এই সম্পর্কিত বিতর্কগুলিকে নিজে যেমন অনুবাদ করেছেন তেমনি অন্যান্যদের অনুবাদগুলিকে নিয়ে সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সময়ের প্রেক্ষিতে এই কাজগুলির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই সব প্রকাশনার কাজের জন্য 'পিপলস বুক সোসাইটি' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

দীপংকর চক্রবর্তী তাঁর মৃত্যুর আগে অবধি কাজকর্ম ও বাম-গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশে তাঁর সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতার ছায়া থেকে বরাবর নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে নিঃশব্দে কাজ করে গেছেন। তাঁর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত কোন যোগাযোগ না থাকলেও তিনি আমাদের কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু একটা দিকে শূন্যতা সৃষ্টি করলো।

# দীপংকরদার স্মরণে

অমিতাভ ভট্টাচার্য

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। একটু একটু করে আকৃষ্ট হচ্ছি বিপ্লবের প্রতি। বাবার বইয়ের দোকানের সুবাদেই নানা ধরনের বই পড়ার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এমন সময়ে হাতে পেয়েছিলাম চীন বিপ্লবের বিপ্লবগাথা, 'বিপ্লবের গান'। প্রথম পাঠের রেশ যেন কোন এক অজানা ঘোরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল আমায়। কৈশোরের আবেগ আর স্পর্ধায় ওয়াং হয়ে ওঠার স্বপ্ন ডানা মেলল। আমার সঙ্গে ওয়াং হাই-এর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন দীপংকরদা। সেই তিরিশ বছর আগে আমি জানতাম না দীপংকরদাকে, কোথায় থাকেন, কী করেন— এসব কোনো কিছুই। 'বিপ্লবের গান'-এর অনুবাদক দীপংকরদা সেদিন আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এক তারুণ্যদীপ্ত বিপ্লবীর সমাজ পাল্টাবার আখ্যানকার হিসেবেই। কতদিন ভেবেছি একটা চিঠি লিখে আমার আবেগের কথা তাকে জানাই। যদিও তা আর হয়ে ওঠেনি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পারিবারিক বইয়ের দোকানে বসবার সুবাদে দীপংকরদা আমার জীবনে আবার ফিরে এলেন *অনীক* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। প্রতিমাসে দোকানে নতুন *অনীক* এলেই নতুন নতুন বিতর্কের সঙ্গে পরিচয়। রাজনীতি-অর্থনীতির নতুন নতুন পাঠ, নতুন কবিতা বা গল্প। সমসাময়িক রাজনীতিকে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থিত করার যে অনায়াস দক্ষতা *অনীক* ধারাবাহিকভাবে দেখিয়েছিল, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব দীপংকরদারই। তখন জানতাম না, পরে জেনেছি *অনীক*-এর পাতায় তরুণ রায়-এর কলমে তিনি মনীষী মূল্যায়নসহ একাধিক প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও অতিবাম হঠকারিতার বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই চালিয়ে গেছেন। বিপ্লবী রাজনীতিকে সমাজে উপস্থিত রাখার প্রশ্নে তিনি আপোষহীন ছিলেন।

এরও প্রায় বছর দশেক বাদে দীপংকরদার সাথে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। বিপ্লবী ছাত্র রাজনীতির কর্মী হিসেবে আমরা তখন মূল্যায়িত উত্তরপত্র ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের দেখতে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করেছি। দীপংকরদা সক্রিয় সমর্থন জানালেন আমাদের আন্দোলনকে। সোজাসাপটা আর বলিষ্ঠ সমর্থন। ক্রমশ চিনলাম তাঁর ভাবনা আর চলার ধরনটাকে, কনভেনশনে বলতে ডাকলে না পারলে সরাসরি না বলেন, মতপার্থক্য হলে মন কষাকষি না করে সেটা ব্যক্ত করেন স্পষ্টভাবে। আন্দোলনের প্রয়োজনে পথে নামতে কুণ্ঠাবোধ দেখিনি কখনো।

গত পনেরো বছরে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ছোট-বড় নানা আন্দোলনে দীপংকরদাকে বারংবার পাশে পেয়েছি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের সরকার পরিচালিত অনেকগুলো কারখানাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ডিএফআইডি-র আর্থিক সহায়তায় বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারের এই শ্রমিক-নিধন যজ্ঞের বিরুদ্ধে হুগলীর ত্রিবেণীতে পালভার এশ কারখানার শ্রমিকরা লড়াই শুরু করলে দীপংকরদা অসুস্থ শরীর নিয়ে ত্রিবেণী ছোটেন। একদিকে নিজের উদ্যোগেই সরকারের ওপর চাপ তৈরি করার চেষ্টা করা, অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদেরকে এই ক্ষুদ্র আন্দোলনের পাশে দাঁড় করানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা, অন্যদিকে শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এই ছিলেন দীপংকরদা। প্রাক্ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে এরাজ্যের হাতে গোণা যে ক'জন একাজ করার স্পর্ধা দেখাতেন, দীপংকরদা ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

সিঙ্গুর আন্দোলনে দীপংকরদার সামগ্রিক ভূমিকা নিয়ে নিশ্চয়ই আরো কেউ লিখবেন, তাই সে প্রসঙ্গে বিস্তারে গেলাম না। কেবল একটা ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে রয়েছে, তার উল্লেখ না করে পারছি না। ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর সকালে শ'য়ে শ'য়ে পুলিশ যখন মাঠের দখল নিচ্ছে, প্রতিরোধের শেষ ব্যারিকেডটুকুও ভেঙ্গে যাচ্ছে, পুলিশের নির্মম অত্যাচারে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে সিঙ্গুরের মাটি, তখন শুধু টিভি-র পর্দায় দেখা নয়, মাঠে আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলেছেন দীপংকরদা। সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ওই চরম বিপদঘন মুহূর্তে মাঠে উপস্থিত হওয়ার। তৎক্ষণাৎ চলে আসছেন আক্রান্ত সিঙ্গুরে। মাথায় রাখতে হবে তখনো এ রাজ্যের 'পরিবর্তনপন্থী' বিদ্বজ্জনেরা প্রায় কেউই এগিয়ে আসেননি।

সিঙ্গুর আন্দোলনে এরাজ্যে লড়াইয়ের যে নতুন বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল, নন্দীগ্রাম আন্দোলন তাতে অভূতপূর্ব মাত্রা সংযোজন করে, এই সময়েই ২০০৭ সালের ১১ মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গাড়ি তৈরির কারখানা হিন্দুস্তান মোটর্স-এর শ্রমিক-কর্মচারীরা বিড়লা মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর লড়াইয়ে নামেন। ১৩ মার্চ শুরু হয় লাগাতার ধর্মঘট। প্রায় ৪০০০ শ্রমিক-কর্মচারী এই ধর্মঘটে অংশ নেয়। ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম গণহত্যা চালায় সিপিএম-এর ক্যাডার আর পুলিশ বাহিনী। সব মিলিয়ে আবারও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল সেদিনের বাংলা। দীপংকরদাকে দেখেছিলাম 'সব্যসাচী'র মতো দুটো লড়াইয়েই সমান অংশ নিতে। হিন্দুস্তান মোটর্স-এর লড়াকু শ্রমিকদের প্রতি অপার ভালবাসা আর দায়বদ্ধতায় তিনি ছুটে গেছেন কলকাতার বিদগ্ধজনেদের কাছে, তাদের সমর্থনকে সোচ্চারভাবে তুলে ধরে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইকে শক্তিশালী করেছেন। সাথে সাথেই কলকাতার রাজপথে নন্দীগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসা শিল্পী-লেখক-বুদ্ধিজীবীসহ

এর পর ৫৬ পৃষ্ঠায়

## দীপঙ্কর

**সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়**

দীপংকরের সঙ্গে শেষ দেখা— ৪ঠা জানুয়ারি কলকাতার 'স্টুডেন্টস্ হলে' এক আলোচনা সভাতে। আমার এক বই প্রকাশ উপলক্ষে। সভা শেষে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন— "মনে রাখবেন, 'অনীক' ৫০ বছর পূর্ণ হ'তে চলেছে। একটা লেখা চাই।"

লেখাটা যে দীপংকরের স্মরণে লিখতে হবে ভাবতে পারি নি। দীপংকর ও '*অনীক*'— অবিচ্ছেদ্য দুই নাম। যদিও '*অনীক*' স্বনামে প্রথম বার হ'তে শুরু করে ১৯৬৬ নাগাদ, যতদূর মনে পড়ে, এর সূত্রপাত ১৯৬৪-এ '*পুনশ্চ*' নামে ত্রৈমাসিকে। তাই যথার্থই, '*অনীক*' অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হতে চলেছে। এই অর্ধ শতাব্দী ধরে '*অনীক*'-এর দুঃসাহসিক অভিযানে মূল কাণ্ডারী ছিলেন দীপংকর। হাল ধরেছিলেন নানা রাজনৈতিক ঘটনার জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়ে— ১৯৬৪-এ কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন; ১৯৬৭-এ নির্বাচনে বামপন্থী বিজয় ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা, এবং তার পরক্ষণেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের শুরু; ষাটের দশকের বামপন্থী রাজনীতির রক্তাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্রশক্তির পাশবিক দমননীতি; ১৯৭৫-৭৭-এ মুক্তি পাবার পর '*অনীক*' পুনঃ-প্রকাশিত হয়, এবং তখন থেকে এক নাগাড়ে এই আশ্চর্য পত্রিকাটি বাঙালি রাজনৈতিক পত্রিকার জগতে এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বামপন্থী আন্দোলনের ভিতর থেকে এক সজাগ সমালোচনার নজির স্থাপন করেছিলেন দীপংকর। তাই দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট আমলে সরকারের শিল্পায়নের নীতি নিয়ে '*অনীক*'-এ বিতর্কের অবতারণা ('উন্নয়নের বামপন্থী ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ'), নকশালবাড়ী আন্দোলন ('ভারতে মাওবাদ') বিষয়ে প্রবন্ধের সংকলন, ও তার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ('বিশ্বায়ন ও প্রতিরোধের বিশ্বময়তা'; 'সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ'; 'পরিবেশ: অর্থনীতি রাজনীতি বিজ্ঞান')। আবার বামফ্রন্ট সরকারের অবসান পরবর্তী নতুন জমানাতে তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী কাজকর্মের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে '*অনীক*' তৎপরতার সঙ্গে।

আসলে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন— সে যে কোন সরকার-ই করুক— এ বিষয়টা নিয়ে দীপংকর বরাবরই প্রতিবাদী ছিলেন। অতীতে কংগ্রেস আমলে, পরে বামফ্রন্ট সরকারের সময়, এবং বর্তমানে তৃণমূল শাসনে, ধারাবাহিক পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দীপংকর শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছিলেন এপিডিআর-এর নেতৃত্ব দিয়ে। তাই দীপংকরের আকস্মিক তিরোধানে শুধুমাত্র বামপন্থী সমালোচনা সাহিত্য নয়, গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই-এর প্রাঙ্গন-ও একজন নির্ভীক যোদ্ধাকে হারালো। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর একমাত্র পথ— '*অনীক*'-কে বামপন্থী বিতর্ক ও আলোচনা নিরপেক্ষ মঞ্চ রূপে দীপংকর যেভাবে তৈরি করেছিলেন, সেই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে বলবৎ রাখা।

---

## দীপংকরদা: চমৎকার এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবী

**বার্নার্ড ডি'মেলো**

স্মৃতি আমার সঙ্গে যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, *অনীক*-এ আমার প্রথম লেখা বেরোয় ১৯৯০ সালে। কিন্তু দীপংকরদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে। দেখা হয়েছিল কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের কাছে অপারেশন গ্রিন হান্টের বিরুদ্ধে একটি গণ-প্রতিবাদ সভায়। সেবছর নভেম্বরে MRZine-এ আমার প্রবন্ধ 'মাওবাদ কী' প্রকাশিত হয়েছিল। দীপংকরদা ঐ লেখাটার প্রশংসা করেন। বারবার উনি ডায়াসে গিয়ে অপারেশন গ্রিন হান্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখতে বলেন। আমি যথারীতি কুণ্ঠিত ছিলাম। দীপংকরদার আহ্বানে পরে *অনীক*-এ মনে হয় আমি তিনটি লেখা দিয়েছিলাম। ই-মেলেও আমাদের মধ্যে কিছু কথা চালাচালি হয়, তাতে আমি মানুষটিকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি। *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*-তে তাঁর শেষ লেখাটি ('দি হিউম্যান রাইট্‌স মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া: ইন সার্চ অফ এ রিয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ') আমি যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করি। এই লিখাটিতে, আরও অনেক বিষয়ের মধ্যে নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামকে একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়েছে। এ সব ব্যাপার, নকশালবাড়ি সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর লেখাপত্র ও তাঁর ধারালো লেখনীর কারণে আমি বলবো, তিনি ছিলেন চমৎকার এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবী। তাঁকে আমি রাখবো সুশীতল রায়চৌধুরীর পাশে। দীপংকরদা যদিও সুশীতল রায়চৌধুরীর মতো কখনো সিপিআই(এমএল)-এ যোগ দেননি, নকশালবাদী রাজনীতির কিছু কিছু দিক নিয়ে তাঁর সমালোচনাও ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের মতো করে টাকার কুমীরদের বিরুদ্ধে ভারতের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হৃদয়, তাঁর চিন্তা ছিল শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের পক্ষে।

লাল সেলাম, দীপংকরদা।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# কাজটা ঠিক করোনি বস্

**শুভেন্দু দাশগুপ্ত**

দীপুদার স্মরণসভার বলেছিলাম কাজটা ঠিক করোনি বস্। এখন দীপুদার স্মরণলেখায় লিখছি কাজটা ঠিক করোনি বস্।

এখন বড়ো দুঃসময়। রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। পুঁজি শক্তিমান হয়ে চলেছে। আক্রমণ বেড়েই যাচ্ছে। বিরুদ্ধতা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ অতটা প্রস্তুত হতে পারছে না। এই মুহূর্তে চলে গিয়ে দীপুদা ঠিক করেনি।

এখন বেজায় কঠিন সময়। রাষ্ট্রের, সরকারের, সরকারে থাকা দলের লোকজন নানা ছলছুতোয় এটা বলে, সেটা দিয়ে, ওটা বানিয়ে বিপরীতে থাকাদের সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছে। বিরুদ্ধতা জটিল হয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে না থেকে দীপুদা কাজটা মোটেই ভালো করেনি।

এখন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বদলে ঘরে ঢুকে পড়ার কাজ। এর ওর ঠেলা মারায়, টেনে নেওয়ায় যখন যেখানে গেছি দেখি দীপুদা পৌঁছে আছে। সেই কবে থেকে ছোট পত্রিকা বানানো, ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট, ভারত চীন মৈত্রী সমিতি, শিক্ষক আন্দোলন, এপিডিআর। দীপুদা কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বুঝিয়ে বলেছে, কী বলতে কী করতে হবে। সববার মেনেছি এমন নয়। তবুও শুনেছি, কাঁধে হাত থাকুক চেয়েছি। এখন কোথাও আগে থেকে পৌঁছে, দাঁড়িয়ে না থেকে, চলে গিয়ে, কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বেশ খারাপ কাজ করল দীপুদা।

সোজা কথা, কঠিন কথা, দরকারি কথা, রাগের কথা, কাউকে তোয়াক্কা না করে বলে ফেলায় দীপুদা। সঙ্গে আমাদের নিয়ে নেওয়া। দীপুদা আছে, মানে চলে যাওয়া যায়। এমন রাগহীন, ভরসাহীন সময়ে দীপুদার থেমে যাওয়া বেজায় ভুল হয়েছে।

আমাদের পারিবারিক অভিভাবকরা চলে গেছেন। আমাদের কোনও রাজনীতিক অভিভাবক নেই, আমরাও বানাইনি। আমরা সাংস্কৃতিক অভিভাবক চাইনি। তবুও একজন অভিভাবক থাকলে কোথাও একটা স্বস্তি লাগে, একটা আশ্রয় থাকে। দীপুদা সকালে ফোন করে কাজের কথা বলতো। রাতে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতো শরীর কেমন। আমরা দুজন তো কাছাকাছি অসুখের রোগী। একই ক্লাবের সদস্য। শুভেন্দু কেমন আছো। দীপুদা তুমি কেমন আছো। অকাজের কথা বলাবলি। হাসি ঠাট্টা। এমনভাবে ছোট ভাইকে না বলে কয়ে অভিভাবক দাদার চলে যাওয়াটা মোটেই ঠিক হয়নি।

সেদিন পিস হাভেন থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত দীপুদার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এই কথাগুলো দীপুদাকে বলেছিলাম এখন *অনীক*-এর পাঠক-পাঠিকাদের।

কাজটা ঠিক করলে না বস্।।

---

# দীপংকরদা

**গৌতম নাভলাখা**

দীপংকরদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কলকাতায়, গত ৪ জানুয়ারি। সুমন্ত ব্যানার্জীর একটি বই প্রকাশ উপলক্ষে তিনি সভা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর ভাষণ, বিশেষ করে যে আবেগ নিয়ে তিনি ভারতে, বিশেষ করে বাংলার বামপন্থী আন্দোলন নিয়ে বলছিলেন, তাতে তাঁর অসুস্থতার কোনো চিহ্ন ছিল না। সভার পর যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে তখন তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, বারবার তাগাদা সত্ত্বেও *অনীক*-এ একটা লেখা আমি দিতে পারি নি। মনে করিয়ে দিলেন যে *অনীক* প্রকাশের এবছর ৫০ বছর পূর্ণ হবে, ইউএপিএ নিয়ে আমি কলকাতার একটা সভায় যেকথা বলেছিলাম সেই লাইনে একটা লেখা পাঠাতে হবে। আমি তাঁকে বলার চেষ্টা করলাম যে আমার লেখা সহজে হয় না, সময় লাগে, এবার আমি লেখা দিতে পারব না। এক তুড়িতে আমার এসব অজুহাত উড়িয়ে দিয়ে বললে, ''চেষ্টা করো। তাড়াতাড়ি কিছু একটা পাঠিয়ে দিও।'' ওনার একটা মহৎ গুণ ছিল এই যে তিনি হাসিমুখে ধমক দিতে পারতেন, দাবি জানাতে পারতেন। আমি লজ্জিত যে আমি তাঁর দেওয়া কাজটা করতে পারি নি। তখন তো আর জানতাম না পরের বার যখন কলকাতায় যাবো তখন তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবো। আরও দুঃখের কথা হলো, ''আমি দীপংকরদা বলছি, সময় থাকলে দেখা কোরো''— এই ফোন আর পাবো না।

আমাদের কত কথা না বলা থেকে যায়, পরস্পরের প্রতি কত অঙ্গীকার অব্যক্ত থেকে যায়। বড্ড দেরি হয়ে যায়। দীপংকরদা ও *অনীক* সম্পর্কে যদিও আমি বহু দিন ধরেই জানি, মাত্র গত কয়েক বছর ধরেই আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেছি।

ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকগ্রস্ত। তাঁকে যে কারণে আমি সম্মান করতাম সেটা হলো দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এপিডিআর-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, আর *অনীক*-এর মাধ্যমে ৫০ বছর ধরে বিপ্লবী বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। দুটি ক্ষেত্রেই একক কিন্তু কমিটেড রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি ছিলেন চোখে পড়ার মতো। এজন্য তিন বামপন্থীদের সব ধারার সঙ্গেই, বিশেষত বিপ্লবী ও র‍্যাডিক্যাল ধারাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতেন এবং রাখতেন— তাদের সঙ্গে ভিন্নমত হলেও যোগাযোগ রাখতেন। লিটল ম্যাগাজিন অনেক আছে। *অনীক* কিন্তু তার র‍্যাডিক্যালজমের জন্য বিশেষভাবে নজর কাড়ে। লেখক ও কবিদের, বিশ্লেষক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের উৎসাহ দিয়েছে অনীক। বৈচিত্র্য বিতর্ককে সম্পদশালী করে, উজ্জীবিত করে। এই স্পিরিট, এই অঙ্গীকার তিনি রেখে গেছেন আমাদের অনুসরণের জন্য।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# দীপংকরদা বেঁচে থাকবেন

**নব দত্ত**

১৯৭৪, ২০ জুলাই, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মিছিল সবে শুরু হবে। সারিবদ্ধ ভাবে ব্যানার পোস্টার নিয়ে দাঁড়ানো চলছে। হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হল। মিছিলের মধ্যে কাউকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে সাদা পোষাকের পুলিশ। পুলিশের কালো গাড়িতে তাকে দেখা যাচ্ছে। ছেড়ে দেবার আবেদন নিয়ে পুলিশের কাছে বেশ কয়েকজন কথা বলছেন। অতর্কিতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল উপস্থিত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মীদের উপর। নিমেষে ছত্রভঙ্গ যে যেদিকে পারছে ছুটছে। ধর্মতলা চত্বরে খোলা রিভলবার নিয়ে সাদা পোশাকের কিছু পুলিশ দৌড়াচ্ছে। সেই মিছিলে এসেছেন এমন কেউ কেউ বাসে উঠে পড়েছেন পুলিশের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে। বাস থেকে ধরে নিয়ে এসে তাকেও প্রকাশ্যে বেপরোয়া মারধোর করা হচ্ছে। রাজভবনের সামনের চত্বর, কার্জন পার্ক তখন পুলিশের রণক্ষেত্র। প্রবীর দত্তকে ঐ পুলিশের লোকগুলো মারতে মারতে পিটিয়ে মেরে ফেলল। ধর্মতলা চত্বরে তখন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাতজোড় করে অনুরোধ করছেন অসহায়ভাবে— আপনারা থামুন— আপনারা মারবেন না। সেদিন দীপংকর চক্রবর্তীকে দেখেছি অসম্ভব সাহস নিয়ে রক্তাক্ত বধ্যভূমি ছেড়ে চলে যাননি।

সত্তর দশকে কোন হলে সভা করলেও পুলিশের নজরদারিকে পড়তে হোত। শুধু তাই নয়, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ, ভয়ভীতির শিকার হতে হতো। এমনই এক মিটিংয়ে রাজবন্দীদের ও পার্বতীপুরম ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সভায় দীপংকরদার সাথে পরিচয়। সেই থেকে প্রায় চার দশক ধরে দীপুদার সাথে আমার পরিচয় বজায় থেকেছে। তাঁকে জানতাম। খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এপিডিআর-এ, আশির দশকে। যতদিন ঐ সংগঠনে ছিলাম, সংগঠন প্রশ্নে আমরা প্রায় একই রকম মতামত পোষণ করতাম। তবে আজ স্বীকার করছি যে দীপুদা আমার এপিডিআর ছেড়ে চলে আসা পছন্দ করেননি। নাগরিক মঞ্চ-র কাজকে উনি ভীষণভাবে পছন্দ করতেন, সমর্থন করতেন।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম পর্বে আমাদের ঘন ঘন দেখা হোত, কথা হত। মনে পড়ছে যেদিন সিঙ্গুরের গ্রামে প্রথম পুলিশ ঢুকল, প্রতিরোধকারী গ্রামবাসীদের ওপর পুলিশের নৃশংস অত্যাচার চলছে, এক বন্ধু ফোন করে বললেন, কোথায় আছ? সম্ভব হলে টিভি খুলে দেখ। টিভিতে দেখছি ঘটনা— সত্যি কথা, ভাবছি, নিশ্চয় দীপংকরদা খবর পেলে চলে যাবেন। বিকালে শুনলাম, দীপংকরদা, অমিতদ্যুতি কুমার, মেধা পাটকার এঁরা সব ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন।

বামফ্রন্টের সাড়ে তিন দশকের শাসন শেষ হয়েছে। পালাবদলের পর প্রত্যাশিত ছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির। প্রতিশ্রুতি রক্ষা তো দূর অস্তু, নানান অসম্মানজনক শর্ত যখন সরকারের পক্ষে এবং সরকার-সহযোগীদের তরফে বলা হচ্ছে, তখন দীপংকরদা শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এপিডিআর-এর উদ্যোগে সরকারের ঐ সব শর্তের বিরোধিতায় নিজেকে সক্রিয়ভাবে সামিল করলেন। দাবি করলেন, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি।

আমি তাঁকে রাজ্যে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস শাসনাধীন তিনটি সরকারের সময়কালে দেখেছি। ক্ষমতাসীন সরকারের নানান জনবিরোধী কাজের বিরোধিতায় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক স্তরে, আলোচনায় নিজেকে যুক্ত রাখেননি। পাশাপাশি মিছিলে, মিটিং-এ, জনসভায় প্রতিবাদে সর্বদা নিজেকে সামিল করেছেন। দীর্ঘ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রাষ্ট্রের যে কোন ধরনের অন্যায় অবিবেচক অপরাধকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের দৃষ্টি থেকে ন্যায্য প্রতিবাদে সঠিক অবস্থানে নিজেকে হাজির রাখা খুবই শক্ত কাজ। দীপংকরদা সেটা পেরেছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি এতটা তন্নিষ্ঠ হয়েও এতটা গণতান্ত্রিক বোধ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই ব্যতিক্রম।

দীপুদার মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে শূন্যতা অনুভব করছি। রাজনৈতিক চর্চায়, অনুশীলনে ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে দীপংকর চক্রবর্তীর মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এই চলতি ব্যবস্থায় আরও অনেকবার কৃষকের জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়ার মত ঘটনা ঘটবে। সরকারের তরফে সংগঠিত সন্ত্রাসের আরও অসংখ্য নজির সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্র তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে খুন করবে, যেমন তাঁরা কিষানজিকে করেছে। সেদিন বড় প্রয়োজন থাকবে দীপংকর চক্রবর্তীর মত আদর্শনিষ্ঠ, সাহসী মানুষের। আক্ষেপ থাকবে দীপংকরদাকে আর পাওয়া যাবে না।

যখনই যাক, চলে যাওয়া বড় দুঃখের। আবার সেই যাওয়াটা যদি দীপংকরদার মতো মানুষের হয়।

দীপংকরদার সঙ্গে ফোনে আমার শেষ কথা হয় যেখানে দীপঙ্করদা বলেছিলেন, 'অনীক কি বন্ধ করে দেবো'। *অনীক* চলবে, দীপংকরদা যা চেয়েছিলেন তা বেঁচে থাকবে। আমরা পাশে থাকবো।

# অধিকার আন্দোলন ও দীপংকরদা

অমিতদ্যুতি কুমার

১৯৭২-এর জুন মাসে মূলত কলকাতার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নাগরিক অধিকার সচেতন যে সব মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর) গঠন করে সমসময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্যসাধারণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই বেঁচে নেই আজ। প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাদের সম্ভবত চারজন এখনো জীবিত— কিন্তু বিভিন্ন কারণে এপিডিআর-এর সঙ্গে আর তাঁদের যোগাযোগ নেই। কলকাতার উদ্যোগের পরপরই, উদ্যোক্তারা যে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেন তাকে ভিত্তি করে '৭২-৭৩ সালেই পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় গণতান্ত্রিক মানুষ নাগরিক অধিকারের দাবিতে সংগঠিত হতে থাকেন। এই সব অ-কলকাতা প্রথম উদ্যোগগুলির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন দীর্ঘ চল্লিশ বছর এপিডিআর-এর পথ চলার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী থেকে গিয়েছিলেন। এই চল্লিশ বছরের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রগুলির অন্যতম ছিলেন দীপংকরদা। গত ২৭ জানুয়ারি তাঁর আকস্মিক জীবনাবসান এই গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রের একটি গ্রন্থি আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।

পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক আন্দোলনে দীপংকরদাকে শুধু চল্লিশ বছরের এক নিষ্ক্রিয় যোগসূত্র বলে ভাবাই যেতে পারে না। বন্দীজীবনের ১৯ মাস, সঙ্গে এপিডিআর-এর 'নিষিদ্ধ' হয়ে থাকাটুকু বাদ দিয়ে এই পুরো সময়টা ধরেই দীপংকরদা ছিলেন অধিকার আন্দোলনের একজন 'এ্যাক্টিভিস্ট', সংগঠক, মুখপাত্র এবং নেতা, যিনি ঐ ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবেই সক্রিয় ছিলেন।

সে হিসেবে এই সময়কালের শেষ যোগসূত্র কি দীপংকরদাই?

বাহাত্তরের জুনে কলকাতায় উদ্যোগের যোগসূত্র ধরেই মুর্শিদাবাদে এপিডিআর গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়— যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭২-এর ডিসেম্বরে মুর্শিদাবাদ জেলা এপিডিআর প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। উদ্যোক্তা অবশ্যই ছিলেন 'এ্যাক্টিভিস্ট' এবং সংগঠক দীপংকরদা। ঐ সভা থেকে মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যক্তিত্ব অনন্ত ভট্টাচার্যকে আহ্বায়ক করে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তার প্রথম কাজগুলির একটি ছিল নাগরিক অধিকারের ও বন্দীমুক্তির দাবিতে ও পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া। সারা পৃথিবীর প্রায় ৮০০ বিশিষ্ট মানুষ ভারতে গণতন্ত্রের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আবেদন করেছিলেন, 'জাগ্রত বিশ্ববিবেক' নামে সেই বিবৃতি ঐ প্রস্তুতি কমিটি ব্যাপকভাবে প্রচার করে।

আদর্শগতভাবে দীপংকরদা মার্কসবাদী— আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং মতবাদের অনুসারী। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও আজীবন তিনি নিজের আদর্শে অবিচল থেকে গেছেন। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকাই শুধু নয়, তাঁকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুসরণের দাবিদার কোনো রাজনৈতিক দলের 'কাছের লোক' বা 'সমর্থক' বলেও চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না— ফলে যথার্থ গণতান্ত্রিক পরিসর সৃষ্টি করা এবং তাতে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিলেন দীপংকরদা। আবার মাও সে-তুং মতবাদের অনুসারী ছিলেন— স্বাভাবিকভাবেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল অন্তর্বস্তুর প্রতি তাঁর সমর্থন সুস্পষ্ট ছিল— কিন্তু এই আন্দোলনের প্রেরণায় গড়ে ওঠা কোনো রাজনৈতিক দল/গোষ্ঠীর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন না। ফলে তিনি ও তাঁর সঙ্গে যে নামটি একাকার হয়ে আছে সেই 'অনীক' পত্রিকা এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নানান তাত্ত্বিক বিতর্ককে ধারণ করতে পারতো। তা ছাড়া সংস্কৃতি, কবিতা, অন্য সিনেমার জগত, ভারত-চীন মৈত্রীর মতো বিষয় নিয়ে তাঁর কাজকর্ম আরো বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে রেখেছিল। এই সব কিছুই গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার চেতনাকে সংগঠিত করার যথার্থ পরিবেশ— সুসংগঠক দীপংকরদার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদের অধিকার আন্দোলন তাই দ্রুতই সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে জরুরি অবস্থার অবসানে। পারে শাসকের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে পথে নামতে। ১৯৭৭-এর ৭ এপ্রিল কলকাতায় এক কনভেনশনে বন্দীমুক্তির দাবিকে সামনে রেখে গঠিত হল 'বন্দিমুক্তি ও গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি'। তার আগে থেকেই গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাতেই, সারা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির' দাবিতে মিটিং-মিছিল-সমাবেশ চলছিল। বহরমপুরে '৭৭-এর ৬ মে 'বন্দীমুক্তি ও গণদাবি কমিটি'র আহ্বানে এক বিশাল গণ-কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের সময় এপিডিআর-এর কর্মীরা প্রায় সকলেই ঐ কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৭৭-এ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ জমানার অবসান এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'বন্দীমুক্তি ও গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি'র নেতৃত্বের বেশিরভাগ মনে করলেন এই কমিটির আর প্রয়োজন নেই।

এপিডিআর-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁরা ও আরো অনেকেই উপলব্ধি করছিলেন, নিজের মত ও বিবেক অনুযায়ী রাজনীতি করার মৌলিক অধিকার এবং ক্ষমতাসীনদের বিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীদের রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গণতান্ত্রিক জনমতকে সংগঠিত করার প্রয়োজন আগামী বহুদিন থাকবে। ইতিমধ্যে সম্ভবত ১৯৬৯ সালে সর্বপ্রথম SICHRN নামে একটি সংস্থা এবং ১৯৭১ সালে সিপিআই(এম)-এর সাংস্কৃতিক সংগঠন 'গণতান্ত্রিক লেখক ও কলাকুশলী সংঘ' সহ আরো বিভিন্ন উদ্যোগে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' বাংলায় অনুদিত হয়ে কিছুটা প্রচার লাভ করেছে। এপিডিআর-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও মমতা ব্যানার্জীর বর্তমান উপদেষ্টামন্ডলীর অন্যতম দেবাশিষ ভট্টাচার্য এক জায়গায় বলেছেন, ১৯৭৭ সালে ঐ ঘোষণাপত্র এপিডিআর-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বন্দীমুক্তি আন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন অতীতের মত সময়ে সময়ে গড়ে উঠবে, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে অবলুপ্ত হবে, না নাগরিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে অলঙ্ঘনীয়, অবিভাজ্য, অনপনেয় মানবাধিকারের দাবিগুলি নিয়ে বর্তমান রাজ্য-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে চলমান থাকবে— এই বিতর্কে দীপংকরদার অবস্থান প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ ছিল না আমার। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এই অধিকার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে— এই উপলব্ধি তাঁর ছিল। তাই বামফ্রন্ট সরকারের সর্ব অঙ্গে ক্ষমতার দম্ভের সঙ্গে যুক্ত অধিকার হরণ/লঙ্ঘনের বসন্তগুটিকা একটি-দুটি দেখা যেতেই অন্য সব অধিকার কর্মী/সংগঠকদের মতো দীপংকরদাও পথে নেমে পড়েছিলেন। সেই থেকে অবিচ্ছিন্নভাবেই দীপংকরদা অধিকারের মতাদর্শের মতে ছিলেন, আন্দোলনের পথে ছিলেন।

বিগত ৪০ বছরের এপিডিআর-এর সমবয়সে এরাজ্যের ইতিহাসে রাষ্ট্রের হাতে সবথেকে বেশি নির্যাতিত হয়েছে নকশালপন্থী বিভিন্ন মতবাদের মানুষ ও সংগঠন। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এপিডিআর-এর সোচ্চার হওয়াকে বুদ্ধদেব থেকে মমতার সরকার সকলেই এপিডিআর নকশালপন্থী মতবাদের সমর্থক বা মাওবাদী এই ছাপ লাগানোর চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ আবার মনে করেন, মার্কসবাদীরা মানবাধিকার আন্দোলনের আদর্শ কর্মী হতে পারেন না। দীপংকরদার জীবন ও কাজ এই বিতর্কের একটি যোগ্য জবাব। মার্কসবাদ চর্চার একটি পদ্ধতি তিনি নিজে অনুসরণ করতেন, যা মূলত তাত্ত্বিক ও অ্যাকাডেমিক প্রকৃতির। অধিকার আন্দোলনে দীপংকরদা যা করেছেন, এই আন্দোলন নিয়ে যা লিখেছেন, সভা সমিতি সেমিনারে, এপিডিআর-এর ভিতরে ও বাইরে যা বলেছেন তা অধিকারের মৌলিক ধারণার বিরোধী বা মার্কসবাদের মৌলিক ভাবনার বিরোধী নয়। বস্তুতন্ত্রে আস্থা থাকলে এটাও স্বীকার করা সম্ভব নয় যে মানবাধিকার চর্চা স্ববিজ্ঞাপিত গান্ধীবাদীদের একচেটিয়া বিচরণক্ষেত্র।

তাঁর একাত্তর বছরের জীবনের শেষের কটা বছর কর্মজীবনের অবসরান্তে কলকাতাবাসী হয়েছিলেন দীপংকরদা। সে সময় তিনি কেন্দ্রীয় এপিডিআর-এর কাজকর্মে আর তার সঙ্গে কলকাতা ও তার আশেপাশে অধিকার-কেন্দ্রিক সামাজিক/রাজনৈতিক আন্দোলনে আরো একটু বেশি অংশ নিতে পারছিলেন।

যখন দীপংকরদা কলকাতায় এলেন, তার পর পরই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় পরপর ঘটে চললো। চলমান আন্দোলনগুলি নিয়ে অধিকার আন্দোলন যতটা ভূমিকা পালন করা দরকার ছিল তা পারছিল না। এই সময় দীপংকরদা এবং 'অনীক' বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। সিঙ্গুরের ঘটনা নিয়ে এপিডিআর হুগলি জেলা কমিটির জুন-অক্টোবরের (২০০৬) তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রথম লেখাটি *অনীক*-ই প্রকাশ করে (নভেম্বর ২০০৬)। অক্টোবরের ২৭ তারিখ এপিডিআর সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন-গণসংগঠনের মিলিত উদ্যোগে সংহতি উদ্যোগ সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে গণশুনানির আয়োজন করে। (তখনো পর্যন্ত সিঙ্গুর আন্দোলনের নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেস কব্জা করেনি।) সেই গণশুনানিতে মাত্র ২ দিনের নোটিশে দীপংকরদা অন্যতম প্যানেলিস্ট ছিলেন। গণশুনানির রিপোর্ট ইংরাজিতে প্রকাশ করা হয়। 'অনীক' অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে। ২০০৭ এর মার্চ থেকে, বিশেষ করে ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম গণহত্যার পর পশ্চিমবাংলার 'নাগরিক সমাজ' কার্যত সক্রিয় হয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলন ত্রয়ী ২০১১-র 'পরিবর্তনে'র অনুঘটক বলে সকলেই প্রায় স্বীকার করেন। এই সময়কালে অনীকের সূচিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট লেখাগুলি উল্টে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে এই 'পরিবর্তনের' রসায়নে *অনীক*-এর ভূমিকা কী ছিল। এই ভূমিকা শুধু যে অধিকার কেন্দ্রিক বিষয়ের পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বৃহত্তর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেও পাঠককে সচেতন করার— দিশা অন্বেষণে অনুসন্ধিৎসা জাগানোর চেষ্টা ছিল সম্পাদনা পরিকল্পনায়।

লালগড়ে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যত যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে তা এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও বিরল এবং অভূতপূর্ব। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে কার্যত লেজে গোবরে পরমাণু চুক্তি সহ কর্পোরেট জগতের কাছে দেওয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি বিশ বাঁও জলে— একমাত্র কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে কর্পোরেটরা আইটি, আবাসন ইত্যাদি করে খাচ্ছে, গ্রাম বাংলা কর্পোরেট বিশ্বায়নের ভবিতে ভুলছে না— অবস্থাটা ছিল

এমনই। এই অবস্থায় লালগড় আন্দোলনকে 'মাওবাদী আন্দোলন' বলে দমন করা রাষ্ট্রের এবং এরাজ্যের বামফ্রন্টের কাছেও একমাত্র পথ ছিল। আন্দোলনের চাপে সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলল। কার্যত কথা বলতে বলতেই তারা UAPA আইন জারি করে যৌথবাহিনী নামিয়ে দিল। ঐ অঞ্চলে বহু মানুষই পুলিশের অত্যাচারে ঘর-ছাড়া হন। এই সময় এপিডিআর-কে অধিকার আন্দোলনের এবং মানবাধিকারের মূল নীতিগুলিতে অবিচল থাকার জন্য যে বিতর্ক চালাতে হয়েছিল তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন দীপংকরদা। দীপংকরদা এ বিষয়ে সহমত ছিলেন যে অন্ধ্রের Concerned Citizen ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া গেলে এখানেও একটা সুস্থ ও সচেতন কণ্ঠস্বর গড়ে তোলা সম্ভব। এই সময়ে লালগড় আন্দোলন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'অনীক'-এ যে সমস্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি এখন আর একবার পড়ে দেখলে খানিকটা বোঝা যায় এ রকম ব্যাপকতার একটি গণ-আন্দোলনকে রাষ্ট্র যেভাবে দমন করতে পারল তাতে 'নাগরিক সমাজ' এবং বিশেষ করে অধিকার আন্দোলনের কোনও দায় ছিল কিনা।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলন এবং তার সঙ্গে POCA, AFSPA, UAPA-র মত আইন, যৌথবাহিনী-সালোয়া জুদাম এগুলিকে সঠিক তাৎপর্যে বুঝতে গেলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে এবং রাষ্ট্রসংঘ সহ সমস্ত 'আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশে নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনীতি ও 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে'র পরিপ্রেক্ষিতটাও বোঝা দরকার। এই উপলব্ধি না থাকলে নয়াচরে কেমিক্যাল হাব-এর বদলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ ইকোপার্ক নামের কর্পোরেট বিনিয়োগকে 'জয়' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে। যৌথ বাহিনী-UAPA-NIA ইত্যাদির সঙ্গে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে'র সম্পর্ক নিয়ে যথাযথ উপলব্ধি না থাকায় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা, বেকার যুবকদের সালোয়া জুদামের পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্করণে জুড়ে ফেলার মতো ঘটনাগুলিও ঘটতে পারলো।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর আগে দেশকে জানিয়েছেন 'মাওবাদীরাই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রধান বিপদ'। আর এই মার্চের গোড়াতেই তিনি পরিবেশ মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন কর্পোরেটদের খনিজ সম্পদ আহরণে পরিবেশ, মাওবাদী, আদিবাসী কোনো বাধাই মানলে হবেনা— একমাত্র তাতেই নাকি ভারতের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে, জিডিপি চড়চড়িয়ে এগোবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এপিডিআর-এর আলোচনা ও কনভেনশনে আদিবাসী-মাওবাদী-খনিজসম্পদ-কর্পোরেট লুট-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এগুলির আন্তসম্পর্ক দীপংকরদা সহ অন্যান্যরা তুলে ধরেছেন। 'অনীক'-এর লেখাগুলিতে কিছুটা ধরা হয়েছে— কিন্তু তার বাইরে বিশেষ করে UAPA আইন ও যৌথবাহিনী নিয়ে বেশ কিছু 'বিদগ্ধ' জনের অন্যভাবে প্রকাশিত লেখায় তা অনুপস্থিত।

এই অনুপস্থিতি আসলে উপলব্ধির অনুপস্থিতি। বামফ্রন্টের বকলমে সিপিআই(এম) দলের কার্যত একদলীয় শাসনে শ্বাসরুদ্ধ, নির্যাতিত মানুষ ঐ সরকারের অবসান চাইছিলেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ দলীয় পতাকাকে সচেতনভাবে প্রত্যাখান করে রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে আগামী শাসকদের দলীয় পতাকার নীচে সমবেত করার দায় বা দায়িত্ব এপিডিআর-এর ছিল না, কোনো রাজনৈতিক দলকে শাসন ক্ষমতা দখল করতে বা তার বজায় রাখতে সাহায্য করা এপিডিআর-এর উদ্দেশ্য নয়— এটি এপিডিআর-এ বহু দিন চর্চিত নীতি।

সিপিএম দল তথা বামফ্রন্টের চর্চিত তথা বিজ্ঞাপিত বামপন্থা যে বামপন্থা নয় এই সত্যটি যাঁরা উপলব্ধি করতেন এবং পুঁজিবাদকে যাঁরা একমাত্র বিকল্প (TINA) মনে করতেন না, দীপংকরদা তাঁদের অন্যতম। ঐ সময়ে 'অনীক'-এ পরিবর্তন সম্পর্কে প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে, তা বহুলাংশে অধিকার আন্দোলনের ধারণাকেই প্রতিফলিত করেছে। এই সমস্ত সময়ে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া জানাতে বিশিষ্টজনদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার যে দায়িত্ব এপিডিআর-এর নেতৃত্বে থেকে দীপংকরদা পালন করেছেন, তার কোনো বিকল্প এই মুহূর্তে ভাবতেই পারা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতা 'পরিবর্তনের' সময়কালে, ১৯১১-র মে মাসে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট অপশাসনের অবসানে অধিকারের দাবিগুলি উপেক্ষিত হতে যাচ্ছে, এই উপলব্ধি থেকে অধিকার কর্মীরা ও বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের সংগঠকরা বন্দীমুক্তির দাবিকে জোরদার করার ওপর জোর দিতে চান। অসুস্থ শরীরেও দীপংকরদা সমস্ত বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। যখন আসতে পারেননি লিখিতভাবে বা অন্য উপায়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন। ব

বন্দীমুক্তির দাবির প্রত্যুত্তরে সরকার একটা রিভিউ কমিটি তৈরি করলো। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক (গোপন) শাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এই কমিটির ৬ মাসের কাজ দেড় বছরে করেছে। কী করেছে কেউই জানে না— রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবি যে মানা হয়নি বাস্তব তাই বলে।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির জন্য একটি ব্যাপক ঐক্যের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দীপংকরদার ভূমিকা যখন খুবই প্রয়োজনীয়, সেই সময় তাঁর জীবনাবসান

বন্দীমুক্তি আন্দোলনেরও অপূরণীয় ক্ষতি করল। জানুয়ারির মাঝামাঝি বন্দীমুক্তি আন্দোলন নিয়ে প্রস্তাবিত একটি কনভেনশনকে কেন্দ্র করে যে সব প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল, এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে তার একটি প্রত্যুত্তর তৈরির আলোচনায় দীপংকরদা সুস্পষ্টভাবে তাঁর মতামত রেখেছিলেন— ফোনে, মুখোমুখি কথাবার্তা, ই-মেলেও। ২২ জানুয়ারি, অর্থাৎ জীবনাবসানের ৫ দিন আগে একটি ই-মেলে তিনি যে মতামত রেখেছিলেন তা স্পষ্ট, দৃঢ় এবং একটি নীতিনিষ্ঠ অবস্থানের দ্যোতক। সেই ই-মেলটি ছিল এরকম—

The note is fairly good, but some extra points — informations should have been added.

1. Clear descriprion of some civil-right activists' opposition to the demand of 'Unconditional Release of All Political Prisoners' and also the opposition to the movement programmes;
2. Their efforts to sabotage the movement;
3. Consequently adoption of a position of dependence of the Civil Rights Movement on a Government of any particular political party;
4. Present position, when there is a basic reluctance to organize a joint movement in West Bengal on that issue; and
5. The insistence on the inclusion of some foreign-funded organizations;
6. And some relevant figures like the actual number of Political prisoners in West Bengal and the identity and number of Pol. Prisoners released, and the method terms of their release.

Dipankar Chakrabarti
22 January, 2013.

'পরিবর্তন'-রিভিউ কমিটি, শান্তি আলোচনা, মতপ্রকাশ-আন্দোলন-সংগঠন গড়ার অধিকারের ওপর নিত্য নতুন আক্রমণ, জঙ্গলমহলে প্রায় ৫ বছর ধরে যৌথবাহিনী, পাহাড়ে আধা সামরিক বাহিনী, রাজনৈতিক বন্দীরা কেউ কেউ ৮-১০ বছর কার্যত বিনা বিচারে জেলে, জেলখানাগুলি উপচে পড়ছে বিচারের জন্য অপেক্ষমান বন্দীদের চাপে, হেফাজতে হত্যা, ভুয়া সংঘর্ষে হত্যা এসবেতেই 'পরিবর্তনের' সরকারের অধিকার হরণের ইতিবৃত্তের এক ধরনের সম্প্রসারণ। এ সব সাম্প্রতিক প্রশ্নে গণতান্ত্রিক মানুষ যাঁদের এপিডিআর-এর সঙ্গে এক করে ভাবেন তাঁদের মতামত ও কাজকর্মে একটা স্পষ্ট পার্থক্য জনমানসে চলে এসেছে। ব্যক্তি যখন নিজেকে সংগঠনের উর্ধ্বে স্থাপন করে, নিজেকে সংগঠনের থেকে বড় বলে ভাবতে শুরু করে, সেই মেগ্যালোম্যানিয়া-র সঙ্গে আপস না করে অধিকারের দাবিগুলি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন জরুরি— এটাই ঐ ই-মেলের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

এপিডিআর বহুস্বরত্বকে ধারণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ— বহুস্বরত্ব আছে বলেই মতপার্থক্য আছে। বহুস্বরত্ব মানে একজনেরই মতামতকে শিরোধার্য করা নয়। মৃত্যুদণ্ড প্রথা রদ নিয়ে দীপংকরদার একটা ভিন্নমত ছিল— কোনদিনই সে মত তিনি সংগঠনের উপরে বা কোন ব্যক্তি সদস্যের ওপরও চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। পুঁজিবাদী আগ্রাসনকে 'সাম্রাজ্যবাদ' বলতে দু'একজন সদস্যের আপত্তি ছিল— কারণ তাঁদের মতে সাম্রাজ্যবাদ হল মার্কসবাদী শব্দভাণ্ডারের নিজস্ব শব্দ। তাঁদের সংখ্যালঘু মতকে মর্যাদা দিয়েই এপিডিআর-এর কাজকর্মে এই শব্দটি তিনি এড়িয়েই যেতেন।

বিতর্কের সময় দীপংকরদা নিজের মতামতে স্পষ্ট ও ঋজু থাকলেও যুক্তির কাছে অনমনীয় ছিলেন না। এটা আমরা দীপংকরদার কাছে পুরো শিখে উঠতে পারিনি। স্পষ্ট ও ঋজু থাকার অর্থ যে রূঢ় এবং অভব্য হওয়া নয়, অন্যের জ্ঞান বা জানার সীমাবদ্ধতাকে ব্যঙ্গ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা নয়, এটাও তাঁর কাছে শেখবার। একবারই এক আলোচনায় বয়সে প্রায় অর্ধেক বয়সের এক সদস্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দীপংকরদা যা বলেছিলেন তাতে সংশ্লিষ্ট সদস্য আহত হয়েছিলেন। পরে দীপংকরদা নিজের ভুল স্বীকার করতে ও দুঃখ প্রকাশ করতে দ্বিধাও করেন নি।

দীপংকরদা কবি, লেখক, সাহিত্য-সংস্কৃতি-চলচ্চিত্র জগতের হালফিল খবরাখবর রাখতেন। অর্থনীতি-সমাজবিজ্ঞান-রাজনীতি-অধিকার আন্দোলনের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করতেন। লিটল ম্যাগাজিন, পত্র পুস্তক প্রকাশনাকে একটা আন্দোলন এবং তা বৃহত্তর সামাজিক অধিকার আন্দোলনের অংশ— এই বোধ ছিল তাঁর। দুই বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অংশের, এমনকি ভারতের বাইরেরও মানুষের কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যথেষ্ট নিবিড় যোগাযোগ ছিল তাঁর। অধিকার আন্দোলন যে মানুষের সামাজিক মুক্তির, একটি সত্যিকার ভয়হীন, পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে সম মর্যাদায় বেঁচে থাকার আন্দোলনের অংশ, এই বোধেই তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সামাজিক পরিচিতি, সাংগঠনিক ক্ষমতাকে তিনি কাজে লাগাতেন— অন্যদের তাতে উৎসাহিত করতেন।

অনেক কাজের, বহু বিচিত্র দায়িত্বের মধ্যেও এপিডিআর-এ যে ভূমিকা পালন করতেন দীপংকরদা তার কোনো বিকল্প সত্যিই নেই।

'৬৬-৬৭ থেকে অনীক/ফিল্ম সোসাইটি/ভারত-চীন মৈত্রী আন্দোলন/অধিকার আন্দোলন, এসবকে ঘিরে আমার সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তার অনেক খণ্ড-বিখণ্ড স্মৃতি চিত্র আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে।

সহযোদ্ধার সশ্রদ্ধ অভিবাদন দীপংকরদাকে।

১১/৩/২০১৩

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# দীপংকরদাকে আরও বড় ফোরামে দেখলে ভালো লাগত

**দেবাশিস ভট্টাচার্য**

১৯৭১ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি। তখন সবে লোকসভা ভোট হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তদানীন্তন নব কংগ্রেস দল ৩৫২টি আসন জিতেছে। তখন লোকসভার আসন ছিল ৫২২। প্রায় ৬৮ শতাংশ আসন পেয়েছিল নব কংগ্রেস। খবরের কাগজে লেখালেখি হচ্ছিল 'গরিবি হঠাও' শ্লোগান দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভোটের লড়াইয়ে চুটিয়ে জিতেছেন। বিরুদ্ধে ছিল আদি কংগ্রেস-স্বতন্ত্র পার্টি-জনসংঘ-ভারতীয় ক্রান্তি দল সবাইয়ের মহাজোট, সেবার একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার অন্তর্বর্তী ভোট হয়। সেই ভোটের পর অজয় মুখার্জি তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। সেই সরকারকে বলা হতো ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার, সেই সরকার মাত্র একশো দিন টিকেছিল। তারপর পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন হয়।

আমরা কতিপয় আঠারো-কুড়ি-বাইশ বছর বয়সী যুবক পুলিশের তাড়া খেয়ে বাড়ি ছেড়ে সেসময় আত্মগোপন করেছিলাম। কারণ ছিল, ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা সিপিআই(এমএল) দলের হয়ে কিছু অ্যাকশান করেছিলাম। সেইসব কেসে পুলিশ আমাদের খুঁজছিল।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকেই সিপিআই(এমএল) দলের লাইনের যৌক্তিকতা, যথার্থতা নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে আমরা বলতে গেলে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, চূড়ান্ত কথাটাই বলছি, আমাদের মধ্যে তখন চারু মজুমদারের প্রতিটি লেখা নিয়ে প্রশ্ন জাগছে। পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ কমরেডদের চোখ বলে দিচ্ছিল, শত্রুকে কাগুজে বাঘ মনে করা ভুল হচ্ছে। তখনই আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, বৈপ্লবিক অবস্থা পরিপক্ক বলে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক কিনা। সংসদীয় গণতন্ত্র বর্জন করা ঠিক কিনা। যে রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে অ্যাকশান করে পুলিশের তাড়া খাচ্ছি তার যৌক্তিকতা দিয়ে প্রশ্ন জাগলে হতাশা কতটা হতে পারে, তা আমরা ওই কতিপয় যুবক তখন বুঝেছিলাম। কতিপয় বলছি, এই কারণে তখন মোট জনসংখ্যার তুলনায় আমরা সংখ্যায় অতি নগণ্য ছিলাম।

এমন হতাশার সময় একদিন রাতে একজন কমরেড একটা বই পড়তে দিলেন। বইয়ের নাম 'বিপ্লবের গান'। সেই উপন্যাসের ওয়াং হাই চরিত্র আমাদের কিছুটা চাঙ্গা করলো। বইটায় দেখলাম অনুবাদকের নাম দীপংকর চক্রবর্তী। অনুবাদের মুন্সিয়ানাও আমাদের চাঙ্গা করেছিল। সে সময় আর একটা বইও পড়েছিলাম। চিন মিন হুয়া-র ডায়েরি। পকেটবুক সাইজের বই, তবে 'বিপ্লবের গান'-এর অনুবাদ খুব উঁচুমানের। তখন আমরা অনেকে বলাবলি করতাম, অনুবাদক হিসেবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সরোজ দত্ত, ননী ভৌমিক, দীপংকর চক্রবর্তী, অরুণ ঘোষ অমর হয়ে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৭৮ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও আলবেনিয়ার পার্টি অফ লেবারের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের তত্ত্ব নিয়ে একটা বিতর্ক হয়। এই লেখক দু পক্ষের বক্তব্য অনুবাদ করে একটি পুস্তিকা বার করেছিলেন। নাম 'চীন ও আলবেনিয়ার মহাবিতর্ক', তার পরেই '*অনীক*' পত্রিকাতেও একই জিনিষ প্রকাশিত হয়। সেদিন দীপংকরদার কাছে স্বীকার করেছিলাম, আপনার অনুবাদ কতটা শিখেছি তার পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু আপনার তুলনায় তা অত্যন্ত নিচুমানের অনুবাদ। রোমা রঁলা'র I will not rest-এর বাংলা করা সরোজ দত্তের 'শিল্পীর নবজন্ম', দীপংকর চক্রবর্তীর 'বিপ্লবের গান' অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শেল্টারে 'বিপ্লবের গান' পড়ার সময় থেকে দীপংকর চক্রবর্তীর নাম মনে গেঁথে গিয়েছিল। তখন সিপিআই(এমএল) সমর্থক দু-চারজন বুদ্ধিজীবীর কাছে দীপংকরদার নাম বললে ওঁরা বলতেন, 'ওঁদের সঙ্গে মিশবে না। দীপংকর চক্রবর্তী, রতন খাসনবিশ, সঞ্জয় ছেত্রী, রাঘব চ্যাটার্জী, নিমাই করণ, নবারুণ রায় এঁরা সব এস-আর, মানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলে, পিডিআর মানে না।' সেইসব বুদ্ধিজীবীদের কথা শুনিনি।

১৯৭১ সালের পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। তখন আমরা আত্মগোপন করছি। কিন্তু সিপিআই(এমএল) ছেড়ে দিয়েছি। আমরা ১৯৭১ সালের মাঝ থেকেই মনে করতাম ওই দল গঠনের ভিত্তিই ভুল। সেসময় '*অনীক*' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যা হাতে এল। পড়লাম উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ওরফে স্বর্ণ মিত্রর উপন্যাস 'গ্রামে চলো'। ওই সংখ্যা থেকেই *অনীক* মাসিক পত্রিকা হয়। ১৯৭২-৭৩ সময়কালে হতাশ নকশালপন্থীদের কিছুটা চাঙ্গা করতো '*অনীক*' পত্রিকা। বাহাত্তরের মাঝামাঝি দীপংকরদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেদিন প্রথম কথা হয় কলেজ স্ট্রিটের একটা জায়গায়, সঙ্গে ছিলেন নবারুণদা। তারপর দীপংকরদা, নবারুণদা, অজয়দারা (সেনগুপ্ত) মিলে বার করলেন 'পূর্বতরঙ্গ' পাক্ষিক পত্রিকা।

১৯৭৩ সালেই দীপংকরদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় এপিডিআর,

ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গড়ে তোলেন। '*অনীক*' পত্রিকায় সিকিমের ভারতভুক্তির ন্যায্যতা নিয়ে দীপংকরদা লেখেন। এজন্য দীপংকরদাকে জরুরি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

দীপংকরদার সঙ্গে বহু জেলায় বহু সভা করেছি। দীপংকরদা ছিলেন একজন বড় মাপের সংগঠক ও নেতা। বহু গুণের অধিকারী, সুবক্তা, চাঁচা-ছোলা ভাষায় বলতেন, যেমনই লম্বা ছিলেন তেমনই সোজা ছিল তাঁর মেরুদণ্ড। দীপংকরদা যে মাপের সংগঠক, নেতা, তেমন বড় সংগঠন তিনি পাননি। '*অনীক*' পত্রিকার পাঠকরা রাগ করবেন জানি, তবু তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি দীপংকরদাকে আরও বড় ফোরামে দেখতে পারলে ভাল লাগত। অর্জুন সেনগুপ্তর মতো যদি রাজ্যসভায় নির্দল সদস্য হতেন মানুষের অনেক উপকার হতো। আমাদের অনেকের মতোই দীপংকরদা ১৯৭০-এর দশকে চীনের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। এপিডিআর-এর মধ্যে ব্যক্তি সন্ত্রাস বনাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নিয়ে মতবিরোধ দীপংকর আমাদের মতই ভাবতেন। কী সেই ভাবনা? দুটোকে সমান করে দেখতেন না, রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস বেশি বিপজ্জনক, আবার ব্যক্তি-সন্ত্রাসকেও নিন্দা করতেন। '৮০-'৯০ দশকে সিপিআইএম বা বামফ্রন্ট সরকারকে কী চোখে দেখা হবে তা নিয়ে দীপংকরদার সঙ্গে মতভেদ হত। বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ১০/১২ বছর যে কিছু ভাল কাজ করেছে, সিপিআইএম যে দেশের মূল বামপন্থী শক্তি, এসব নিয়ে দীপংকরদার সঙ্গে বহুদিন বিতর্ক হয়েছে, নকশালপন্থী গোষ্ঠীর নেতাদের মতো দীপংকরদা অন্ধের হস্তি দর্শন করতেন না। বহু ব্যাপারে মতভেদ হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মাঝরাতে জরুরি অবস্থা জারি হয়। তারপর পুলিশ দীপংকরদাকে গ্রেপ্তার করে মিসা ১৬(ক) ধারায়। এটাকে জরুরি অবস্থার মিসা বলা হত। অন্য ধারার মিসায় আটক হলে রিভিউ কমিটির কাছে হাজির হতে হতো। বন্দীর বাড়ির লোক হাইকোর্টে হেভিয়াস কর্পাস পিটিশন করতে পারতেন। কিন্তু মিসা ১৬(ক) ধারায় গ্রেপ্তার হলে সে সুযোগ পাওয়া যেত না। সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারকে পুলিশ সেসময় ওই ধারায় গ্রেপ্তার করে। কুলদীপ নায়ার সুপ্রিম কোর্টে হেভিয়াস কর্পাস পিটিশন করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চান, কেন ওঁকে আটক করা হয়েছে? তদানীন্তন অ্যাটর্নি জেনারেল নীরেন দে কোর্টে বলেন Ground of Detention জানাতে সরকার বাধ্য নয়।

১৯৭৭ সালের মার্চে লোকসভা ভোট হয়। ২১ মার্চ সন্ধ্যে থেকে ফল বেরুতে শুরু করে। মাঝরাতে বোঝা যায় কংগ্রেস হারছে। ২২ মার্চ ভোরবেলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠক ডেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। অস্থায়ী (Acting) রাষ্ট্রপতি বি ডি জাত্তি তাতে সই করেন, জরুরি অবস্থা উঠে যায়। ফলে মিসা ১৬(ক) ধারায় আটক সকলে ওইদিন দুপুরের মধ্যে ছাড়া পান। দীপংকরদাও মুক্তি পান, দীপংকরদা যখন জেলে ছিলেন তখন এপিডিআরও নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৫ সালের ৪ জুলাই রাজ্য সরকার এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ (Ban) করে। জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর এপিডিআর-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে দীপংকরদা সহ আমরা কয়েকজন বসে ঠিক করি যে এপিডিআর-কে পুনর্গঠিত করা হবে। তখন ১৯৭৭ সালের ৭ এপ্রিল তৈরি বন্দীমুক্তি ও গণদাবি কমিটি প্রায় গুটিয়ে গিয়েছিল। বন্দীমুক্তি ও গণদাবি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন শৈবাল মিত্র ও পীযূষ দে। ১৯৬৩ সালে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য ওই নামে কমিটি গঠিত হয়েছিল। শৈবালদা ছাত্রনেতা হিসেবে তখন যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার শপথ নিয়ে ৫ মিনিটের একটি ক্যাবিনেট বৈঠক করে, সেদিন মাত্র পাঁচজন মন্ত্রী শপথ নেন। সিপিআইএম-এর পক্ষে জ্যোতি বসু, কৃষ্ণপদ ঘোষ, অশোক মিত্র, ফরওয়ার্ড ব্লকের কানাইলাল ভট্টাচার্য, আরএসপি-র যতীন চক্রবর্তী। ওই ক্যাবিনেট বৈঠকে দু'টি সিদ্ধান্ত হয়েছিল: (১) স্নেহাংশুকান্ত আচার্যকে অ্যাডভোকেট জেনারেল নিয়োগ করা হয়; (২) দলমত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্তে মুক্তির সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ বিচারাধীন, বিনা বিচারে আটক (মিসা), ও দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের বলি, রাজনৈতিক কর্মীদের বলে রাজনৈতিক বন্দী। কিন্তু বিনা বিচারে আটক বিচারাধীন, দণ্ডিত সব রাজনৈতিক কর্মীদের বলে রাজবন্দী। যাইহোক, বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর বন্দীমুক্তি ও গণদাবী কমিটি আর টিকিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা তা নিয়ে ১৯৭৭ সালের ২১ আগস্ট বৈঠক হয়। হুগলীর সনৎ রায়চৌধুরী সেই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সনৎদা তখন সব জেলে জেলে গিয়ে বন্দীদের নামের তালিকা তৈরি করছিলেন। ওই সময়েই সনৎদা, দীপংকরদা, অমিয়া রায় চৌধুরী (সুশীতল রায়চৌধুরী স্ত্রী), ঝর্ণা ভৌমিক, এবং এই লেখক বহুবাজারে ১৮, মদন বড়াল লেনে (আজও এপিডিআর-এর অফিস সেখানেই আছে) কপিল ভট্টাচার্যের বাড়িতে বসে এপিডিআর-কে পুনরুজ্জীবিত (Revive) করার সিদ্ধান্ত নিই। তারপর আমরা বীরেন রায়, সুবোধ দাশগুপ্তকে সংগঠনে যুক্ত করি। প্রথম বৈঠকে আমার প্রস্তাব ছিল ১৯৭২ সালের জুনে এপিডিআর তৈরির সময় যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তা আজ নেই। এখন সংগঠনকে সিভিল লিবার্টিজ (ব্যক্তি স্বাধীনতা) ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার চেয়ে ব্যাপকতা বাড়িয়ে মানবাধিকার সংগঠন করা হোক,

সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এপিডিআর-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims & Object) নতুন করে লেখার ভার পড়ে সুবোধ দাশগুপ্ত ও এই লেখকের উপর। ভিত্তি ঠিক হয় ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে গৃহীত ও মানবাধিকারের ৩০ দফা দাবি সনদ, ১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে গৃহীত ও মানবাধিকারের ৩০ দফা দাবি সনদ। ১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর কলকাতায় এপিডিআর ট্যাবলো সহ মানবাধিকার নিয়ে মিছিল করে।

১৯৭৮ সালে নকশালপন্থীদের বেশিরভাগ গোষ্ঠী জড়ো হয়ে তৈরি করেছিল 'গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সমিতি'। এপিডিআর-এ আর তখন মাত্র কয়েকজন। দু'টো সংগঠনের মধ্যে মতাদর্শগত বিতর্ক দেখা দিল। 'প্রতিষ্ঠা সমিতি'-র বন্ধুরা বলতেন, দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়নি, তাই গণতান্ত্রিক অধিকার নাগরিকদের নেই। 'রক্ষা সমিতি'-র পক্ষে আমরা বলতাম, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না এলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে। ১৯৫০ সালের ২১ জানুয়ারি চালু হওয়া সংবিধানে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক নেতিবাচক দিকও আছে। তাই আমাদের বক্তব্য ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণ করতে হবে। পাঁচশো নকশালপন্থীর বিরুদ্ধে এই মতাদর্শগত সংগ্রামে সেদিন আমাদের মত পাঁচজন এপিডিআর-পন্থীরা জিতেছিলেন। আমাদের যুক্তি আমরা রাখতাম এবং ভুল চিন্তার বন্ধুদের সঠিকটা বোঝার সুযোগ দিতাম। এজন্য আমরা তাঁদের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি করতাম। সেই সংগ্রামে এপিডিআর জিতেছে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সমিতির নেতারা এসে এপিডিআর-এ যোগ দিয়েছেন। ওই সমিতির দুই প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক প্রয়াত শান্তি রায় এবং সদ্যপ্রয়াত সুধাংশু পালিত আসেন। ১৯৮১ সালেই 'প্রতিষ্ঠা সমিতি' গুটিয়ে যায়। বাম হঠকারি চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে সেদিনের ওই লড়াইয়ে দীপংকরদা ছিলেন আমাদের পক্ষের একজন নির্ভরযোগ্য নেতা। এমন বিতর্ক ফের দেখা দিয়েছিল ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৩ সালের ৯-১০ আগষ্ট আমরা কলকাতায় India Civil Liberties Conference করি উদ্দেশ্য ছিল, দেশের প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সমধর্মী সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। সে কাজটা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল বহু সংগঠনের পেছনে ছিল নকশালপন্থী কোনও না কোনও গোষ্ঠী। পেছনে ছিল তো কম বললাম, বলতে গেলে ওইসব পলিটিক্যাল কোর থেকে ওইসব সংগঠন চালাতে হতো। একমাত্র এপিডিআর এর ব্যতিক্রম ছিল। ভারতে সংগঠিত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন ও সংগঠন প্রথম শুরু হয় ১৯৩৬ সালে : All India Civil Liberties Commitee। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্যকরী সভাপতি ছিলেন সরোজিনী নাইডু। আমরা এপিডিআর থেকে প্রস্তাব করলাম ১৯৮৬ সালে সিভিল লিবার্টিজ আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হোক। অন্ধ্রপ্রদেশের সিভিল লিবার্টিজ আন্দেলনের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হোক। অন্ধ্রপ্রদেশের সিভিল লিবার্টিজ কমিটি, নাগপুরের কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস্ আপত্তি করে। ওঁরা বলেন ১৯৭৭ সালের পর থেকেই সিভিল লিবার্টিজ আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে দীপংকরদা সহ আমরা লড়েছিলাম। ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে জরুরি অবস্থার সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল Peoples Union for Civil Liberties and Democratic Rights-এর সভাপতি ছিলেন মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ভি এস তারকুণ্ডে। আহ্বায়ক ছিলেন কৃষ্ণকান্ত। এঁরা একটু জনতা পার্টি ঘেঁষা ছিলেন সেজন্য মোরারজি দেশাই সরকারের আমলে বড় বড় মানবাধিকার হরণের ঘটনায় এরা কিছু বলেননি। ১৯৮০ সালে তারকুণ্ডে এপিডিআর নেতৃত্বকে বলেছিলেন পিইউসিএল-এর মধ্যে মিশে যেতে। দীপংকরদা সহ আমরা তখন সেই কথা শুনে গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসাইনি। এসব নিয়ে যখন আলোচনা হত তখন দীপংকরদার মূল্যবান মতামতগুলো এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। দীপংকরদা শুধু 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না। *'অনীক'* পত্রিকা আগে বের হত *'পুনশ্চ'* নামে। বহরমপুর থেকে বার করতেন পাক্ষিক *'মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা'*। পরে তার নাম হয় *'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ'*। চার পাতার ট্যাবলয়েড। কিন্তু জেলার কাগজ হিসেবে উঁচু মানের কাগজ ছিল। সেই সুবাদে তিনি জেলা প্রেস ক্লাবের সংগঠকও ছিলেন। বহরমপুরে বই মেলার সংগঠক দীপংকরদা, সেখানকার ফিল্ম সোসাইটি তৈরির উদ্যোক্তাও দীপংকরদা, সেখানকার ফিল্ম সোসাইটিগুলোর মধ্যে একমাত্র বহরমপুরেই আছে সোসাইটির নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ 'ঋত্বিক সদন', কারণ ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি ছিল বহরমপুরে। বহরমপুরে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন কমিটির সংগঠক ছিলেন সেই দীপংকরদা। তৈরি করেছিলেন প্রগতিশীল বইয়ের প্রকাশনা সংস্থা পিপলস বুক সোসাইটি। এমন ব্যক্তিত্বের প্রতি মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাতে পারলে নিজেরই ভালো লাগে।

# দীপশিখা দীপংকর

অনিল আচার্য

আমরা হয়তো অতীশ দীপঙ্কর নামটির সঙ্গে পরিচিত, শুনেছি তাঁর মাহাত্ম্যের কথা, কিন্তু সেই সত্য যা রচিবে তুমির সঙ্গে দূরত্ব যোজন যোজন। তাঁর জ্ঞানগম্যির কথা পৌরাণিক এবং অশারীরিক, সুতরাং বাস্তবিকতার উর্ধ্বে।

আমি অন্য এক দীপংকরের কথা বলব। আমাদের বন্ধু দীপেশ চক্রবর্তী বলে থাকেন, মনুমেন্ট যেমন ইতিহাসের অন্যতম উপাদান, একটি জলজ্যান্ত মানুষের জীবন নিজেই একটা ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে। আমার কেন জানি মনে হয় আমি দীপংকর চক্রবর্তী এই নামে যে রক্তমাংসের মানুষটিকে দেখেছি চিনেছি কথা বলেছি, তিনি সে-রকমই একজন মানুষ।

দীপংকর চক্রবর্তীকে যদি সামনে এসব বলতাম, তিনি হেসে ফেলতেন, পরের মুহূর্তে ঝলসে উঠত তাঁর যুক্তিবাদী মন, ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা মনঃপূত হত না তার। তিনি হয়তো বলতেন, মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস হলো আসল ইতিহাস। ও সব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্লেখানভীয় ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন না তিনি।

তিনি ছিলেন 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদক। *অনুষ্টুপ* এবং *অনীক* একসময় একবাক্যে উচ্চারিত হতো সত্তর দশকে, কিন্তু পুরোভাগে থাকতো 'অনীক' পত্রিকার নাম। সরাসরি সমালোচনা, রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ, সেই সময় সংঘটিত হত্যা, অত্যাচার ও পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন দীপংকর। এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের পরিণতিতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তিনি সিদ্ধার্থ সরকারের আমলে। তৎকালীন সম্পাদকদের মধ্যে কাউকে এভাবে কারান্তরালে যেতে হয় নি।

'অনীক' পত্রিকা তবুও বন্ধ হয়নি। ইমার্জেন্সি শেষ হবার পর তিনি মুক্ত হলেন। 'অনীক' বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও স্বকীয় চরিত্র বজায় রাখল। সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বহুদিন বঞ্চিত ছিল 'অনীক'। সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে অর্থনীতির এই অধ্যাপক অর্ধশতকেরও বেশি সগর্জনে ও আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সম্পাদনা করেছেন।

একজন প্রাবন্ধিক হিসেবেও দীপংকর চক্রবর্তী অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনার কারণে 'অনীক'-এই বেশি লেখালেখি করতে হত তাকে। কিন্তু উনবিংশ শতক ও রামমোহন সম্পর্কে প্রবন্ধের বই ছাড়াও অনুষ্টুপ ও অন্যান্য পত্রিকায় তিনি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।

শেষ জীবনে এপিডিআর-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে অর্থাৎ তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে অগ্রগামী ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী।

আমার মতে একটি মহীরুহ ও এক অগ্নিযুগের ইতিহাস নির্বাপিত হল দীপংকর চক্রবর্তীর প্রয়াণে।

---

## দীপংকরদার স্মরণে

৪৫ পৃষ্ঠার পর

আপামর মানুষের আবেগ-আকাঙ্ক্ষাকে সক্রিয়ভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। দীপংকরদা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও একজন আপাদমস্তক বিপ্লবী বামপন্থী রাজনীতির একজন সক্রিয় প্রচারক হিসেবে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিজস্ব ভাবনা ও সক্রিয়তা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই অনন্যতাটাই আজকের সময়ে বিরল হয়ে উঠেছে। তার এইম গোটা পথ চলায় বহু বন্ধু তার কাছে এসেছেন, বড়ো মন নিয়ে তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন, চরম ধৈর্যে বিতর্ক চালিয়েছেন— কিন্তু মতাদর্শগত আর রাজনীতির প্রশ্নে দীপংকরদা আপসহীন থেকেছেন।

বড় হয়ে যাচ্ছে স্মৃতিচারণাটা। দীপংকরদা সে অর্থে কোনো দলীয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, ছিলেন না চালু অর্থে বিদ্বজ্জন বা তত্ত্বকার, কিন্তু রাজনীতি আর তত্ত্বচর্চা দুটোতেই অনায়াস যাতায়াত ছিল তার। আর এই কাজটা করতে ভালবাসতেন কোনো শুদ্ধ বৌদ্ধিক দায় থেকে নয়, সমাজের শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত-অবহেলিত জনগণের মুক্তির প্রশ্নটাকে জীবন্তভাবে খুঁজতে খুঁজতে এগোনোটাই ছিল তার কাছে বাঁচা। *অনীক* পত্রিকাকে গড়ে তুলেছিলেন বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে বিপ্লবী রাজনীতির প্রতিনিধিস্বরূপ। এরাজ্যের অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী আর পাঠকবর্গ সমসাময়িক রাজনীতির ভাষ্যের জন্য যে অনীক-এর অপেক্ষায় থাকতেন, তা তাঁর সাফল্যই বটে।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম-কে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে পারলে বিপ্লবী আন্দোলন তথা গণআন্দোলনের বন্ধ আগলটা খুলে যাবে বিশ্বাস করে যারা তথাকথিত 'পরিবর্তন'-এর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে করতেও দীপংকরদাকে কখনো ইতস্তত দেখেছিলাম। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনের পর যত দিন গেছে, আগের অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে দীপংকরদাকে কখনো নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা দেখিনি। এই সেদিনও অসুস্থ অশক্ত শরীর নিয়ে ছুটে গেছেন নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের কাছে। মাওবাদী নেতা কিষাণজীর হত্যা অথবা বন্দীমুক্তি, মণিপুরের সংগ্রাম অথবা মারুতি শ্রমিকদের লড়াই— দীপংকরদা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বেঁচেছেন নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতায়। পুঁজিবাদের শোষণ-জোয়াল থেকে মানবমুক্তির স্বপ্নকে মননে-বিশ্বাসে স্থায়ী সঙ্গী করে তাঁর আমৃত্যু পথচলা আমাদের উদ্বুদ্ধ রাখুক বাকি পথচলায়।

# একজন দীপংকর চক্রবর্তী

তিমির বসু

একে একে বাতি নিভছে। ষাটের দশকের শেষ আর সত্তরের দশকের শুরু— এই উত্তাল সময়ের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শ বিতর্কে নতুনের সন্ধানে, বিকল্প রাস্তা খোঁজার ব্যাপারে, আন্দোলনে সংশোধনবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার তাগিদে যারা হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করছে, দীপংকর চক্রবর্তী তাদের অন্যতম। আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার এই চলায় বিরাম ছিল না। সন্দেহ নেই স্থবির কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'নকশালবাড়ি' একটা গতি এনে দেয় আর এই গতির সংগে তাল মিলিয়ে দীপংকর চক্রবর্তী বরাবরই তার অবস্থানে দ্বিধাহীন থেকেছেন, যদিও কোন পার্টিতে তিনি কখনই ঐভাবে যোগ দেন নি। অর্থাৎ পার্টির কার্ড তাঁর ছিল না, কিন্তু রাজনীতির বাইরেও তিনি আসেন নি।

ছাত্র আন্দোলনে থাকার সময় দীপংকর চক্রবর্তীর নাম শুনতাম, কিন্তু আমার সংগে তেমনভাবে পরিচিত হবার সুযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে কানাঘুষা শোনা যেত যে বহরমপুরের দীপংকর চক্রবর্তী এবং তার সহকর্মীরা SR (Socialist revolution) line দেবার চেষ্টা করছে। ফলে যারা PDR (People's Democratic revolution)-এর প্রবক্তা তাদের কাছে ব্যাপারটা একটা আদর্শগত ব্যবধান তৈরি করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যদিও আমার কাছে বিপ্লবের এই স্তর নিয়ে মারামারির তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কারণ বিপ্লব সম্পর্কে ধারণাটাই তখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট। আজকের সচেতনতা নিয়ে সেদিনকার অবস্থা বিচার করতে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। ফলে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় শ্লোগান উঠল— 'শহরে চে, গ্রামে মাও'। যদিও চে এবং মাও নিয়ে তুলনামূলকভাবে কোন আলোচনা তেমনভাবে কখনই হয়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সভা এবং রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রে দীপংকর চক্রবর্তীর সংগে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কথা হয়েছে ফ্রন্টিয়ার নিয়ে। অনেক সময় ফোনেও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। শান্তিপুরে 'প্রতিবাদী চেতনা'র ঘরোয়া সভায় দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে সাঁওতালডি'র বিদ্যুৎকর্মী ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল তার বিভিন্ন জায়গায়। সরাসরি কোন পার্টিকর্মী না হয়েও 'নকশালবাড়ি' সূত্রে আবর্তিত রাজনীতির চিন্তনের ক্ষেত্রে একজন সর্বক্ষণের পার্টিকর্মীর মত কাজ করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত।

'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে দীপংকর চক্রবর্তী খুব যে বেশি এসেছেন ঘটনা এমন নয়। খুব কমই এসেছেন। সমরবাবুর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হত ঠিকই কিন্তু তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা হতে দেখিনি। সমরবাবুর সংগে তার আলোচনা মূলত হয়েছে শারীরিক অবস্থা এবং 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সমস্যা নিয়ে। অনেক সময় বুদ্ধিজীবীদের আবেদনপত্রে সই-এর জন্যও দীপংকর চক্রবর্তী এসেছেন কিম্বা ফোন করেছেন। রাজনীতি-সচেতন এক ব্যাপক বাঙালী পাঠকের কাছে দীপংকর চক্রবর্তীর 'অনীক' যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কে সমরবাবুর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে 'অনীক'-এর পাতায় বিতর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে দীপংকর চক্রবর্তী একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছেন একথা তার সমালোচকরাও স্বীকার করে থাকেন। ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে সুভাষ বোস এখনও এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। আর এই সুভাষ বোস নিয়ে দীপংকর চক্রবর্তীর পুনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। *'অনীক'*-এ সুভাষ বোস নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করবার পরিপ্রেক্ষিতে দীপংকর চক্রবর্তী যাদের সংগে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন প্রমোদ সেনগুপ্ত। প্রমোদবাবুর বেকবাগানের বাসায় একদিন আলোচনায় সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। পরে আরো আলোচনা হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। জেল থেকে বেরবার পর প্রমোদ বাবুর ডেরায় আমি প্রায়ই যেতাম। ওঁর কিছু পুরানো লেখার সংকলন বের করবার প্রয়াস চলছিল। আমি সহায়তা করছিলাম। দীপংকর চক্রবর্তী আসলে উৎসাহী ছিলেন প্রমোদবাবু জার্মানি থাকাকালীন সুভাষ বোস নিয়ে যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার। প্রমোদ বাবু জার্মানি থাকার সময় প্রগতিশীল ভারতীয়দের নিয়ে একটা পত্রিকা বের করতেন। তার বাঁধাই করা সমস্ত সংখ্যাই প্রমোদ বাবুর কাছে ছিল। বলা বাহুল্য, সুভাষ বোস সম্পর্কে তার সমকালীন অন্যান্য কমিউনিস্টদের মতো বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন না তিনি। প্রসঙ্গত নির্বাচনে অংশগ্রহণের স্বপক্ষে থাকায় প্রমোদবাবু তখন 'নকশাল' মহলে প্রায় একঘরে, বলা ভাল প্রায় অচ্ছ্যুৎ, অথচ এমন সব নকশাল নেতা ওঁর ওখানে আসতেন যারা কট্টর নির্বাচন বিরোধী এবং সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য মরিয়া। একদিন এমনই একজন, অমূল্য সেন, হাজির। 'দক্ষিণ দেশ' তখনও এমসিসি (MCC) হয়নি কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে তারা তখনই চরমপন্থী। অনেক আলোচনা হবার অমূল্য সেন প্রমোদবাবুকে বললেন— ''আপনি আমাকে বোঝান শহরের ছাত্ররা গেরিলা কায়দায় আন্দোলন না করে আর কী করতে পারে!'' প্রমোদবাবু অবশ্য কোন উত্তর দেননি। আর উত্তর দেবারই বা কী আছে। যখন একদল ভাবছে তারা একমাত্র সঠিক

এর পর ৬২ পৃষ্ঠায়

# দীপংকর চক্রবর্তী

**সুভাষ আয়কাত**

দীপঙ্কর চক্রবর্তী 'অনীক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। 'অনীক' যখন ৫০ বছরে পা দিচ্ছে, তখন তিনি চলে গেলেন। তার অনুপস্থিতি শুধু কাছের লোকেরাই নয়, 'অনীক' পত্রিকার পাঠকরাও অনুভব করবেন। 'অনীকে'র সাথে, সেভাবে বললে দীপংকর চক্রবর্তীর সাথে, 'মান্থলি রিভিউ' নিউইয়র্কের সখ্যতা বহু পুরানো। 'অ্যানালিটিক্যাল মান্থলি রিভিউ' বের করার সুবাদে আমার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত, সেটা অনেক পরে, নব্বই এর দশকে। নানান কারণে ওনাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। ফলে ওনাকে যেটুকু বুঝেছি, সেটা *অনীক*-কে কেন্দ্র করে।

দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে, নানা ঝড়-ঝাপটার মোকাবিলা করে, একটা পত্রিকা সম্পাদনা করে নিয়মিত বের করা খুব সহজ কাজ নয়। এই কাজটা উনি খুব দক্ষতার সাথেই করে গেছেন, তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা একটা দিক। অন্য দিকটা হল, এই পত্রিকর মাধ্যমে পাঠকদের (যার মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীরাও আছেন) কাছে বিভিন্ন বিষয়কে, বিতর্ক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) হাজির করে চিন্তাভাবনা করার অফুরন্ত মালমসলা যোগান দিয়ে গেছেন। বিশ্ব পরিস্থিতিকে জানাবোঝার জন্য বহু বিখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধের অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য হাজির করার ব্যবস্থা করেছেন। বেটেলহেম, হিন্টন, সুইজি ইত্যাদিদের নাম যার মধ্যে উল্লেখ করার মত। এই সাথে সত্তরের দশকের বিখ্যাত চীনা উপন্যাস 'বিপ্লবের গান' অনুবাদ করে অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেই একই সময়ে পিপলস্ বুক সোসাইটি-এর পরিচালনার মাধ্যমে বই প্রকাশনার জগতেও অবদান রেখেছেন। দীপংকরদার এই ভূমিকাকে সেলাম করতেই হবে।

তবে যখন দীপংকরদাকে নিয়ে ভাবছি তখন একটা প্রশ্ন মনে ভেসে উঠছে, না বলে পারছি না। অন্যান্য দেশে কী হয় জানি না তবে এখানে (where this type of venture heavily depends on 'labour of love') পত্রিকা প্রকাশনার সাথে যুক্ত থাকার মধ্যে দিয়ে এটা বুঝতে পারি যে দীপংকরদার সময়ের একটা বড় অংশই লেখা যোগাড় করা, তাগাদা দেওয়া, সম্পাদনা করা, সম্পাদকীয় লেখা থেকে শুরু করে প্রেস থেকে বেরোনো ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করতেই চলে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি না আমি ভুল বুঝে থাকি, সাহায্যকারী হিসাবে অনেকে থাকলেও কেউ চাক বা না চাক শেষ পর্যন্ত দায়িত্বটা সেই একজনের ঘাড়েই চলে যায়, কারণ যে কোন ভাবে পত্রিকাটা নিয়মিত বের করাটাই তখন মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এটা শুধু দীপংকরদার ক্ষেত্রেই নয়, সারা ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে এ ধরনের পত্রিকার সাথে যারা যুক্ত তাদের সবার ক্ষেত্রেই সত্যি। প্রশ্নটা হচ্ছে দীপংকরদাকে (বা তার মতো যারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত এ ধরনের পত্রিকা বের করে যাচ্ছেন) এই সময়টা যদি না দিতে হতো তাহলে কি তিনি সমাজ পরিবর্তনের লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে আরো বড় ভূমিকা রাখতে পারতেন না? উদাহরণ হিসাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিদ্যমান নানা তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিকে কাটানোর কাজে হাত লাগাতে পারতেন, দু দুটো সফল বিপ্লবের পরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অভিযান যে সাময়িক পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে সেখানে থেকে বেরোনোর দিশা অনুসন্ধানের কাজে যুক্ত হতে পারতেন— এ কাজের যোগ্য তিনি ছিলেন না এটা আশা করি কেউ বলবেন না। এটা হল না তার কারণ দীপংকরদার ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়, সাধারণ ভাবে সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতার ফল বলেই আমার মনে হয়।

সব কিছু সত্ত্বেও, নিয়মিত প্রায় ৫০ বছর ধরে যে ভাবে অনীকের সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ করে গেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। অন্তত এই কাজের মধ্যে দিয়েও প্রগতিশীল প্রকাশনার জগতে দীপংকর চক্রবর্তী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

---

# দীপংকরদা

**সরোজকান্তি দাস**

দীপংকরদা হঠাৎ চলে গেলেন। এই ক্ষতি অপূরণীয়। *অনীক*-এর দপ্তরে, পিবিএস-এ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য কিছু বাক্যালাপ হয়েছে। দীপংকরদা আমাকে বলেছিলেন, তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তি। দীপংকরদার মতো স্নেহপ্রবণ মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। তবে স্নেহপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কোনো অন্যায় প্রশ্রয় কোনোদিন পাইনি। দীপংকরদা তাঁর নাতনির জন্মদিনে খুব খুশি হয়ে আমাদের সন্দেশ খাইয়েছিলেন। আমি যে একটা বাড়তি সন্দেশের দিকে হাত বাড়িয়েছি সেটা তাঁর নজর এড়ায়নি। বকা খেয়ে বাড়তি সন্দেশটা আমার আর খাওয়া হয়নি।

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# দীপংকরদাকে স্মরণ করে

সন্দীপ দত্ত

২৮ জানুয়ারি। দীপংকরদার মৃত্যুর খবরটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমরা  কেউই। লিটল ম্যাগাজিনের একজন অভিভাবকের এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছিলাম না। কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, অধ্যাপক, সুবক্তা, গণতন্ত্রী আন্দোলনের অগ্রণী মানুষ 'অনীক' নিয়মিত রাজনীতি-প্রধান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক দীপংকরদার চলে যাওয়ায় সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তাশীল জগতে বড় ক্ষতি হয়ে গেল।

দীপংকরদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ সম্ভবত ১৯৮৭ সাল নাগাদ মে মাসে। ব্যাপারটা হয়েছিল এইরকম। বহরমপুরের একটি লিটল  ম্যাগাজিন 'রৌরব'-এর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রৌরবকে সমর্থন করে লাইব্রেরির (লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র) পক্ষে একটি প্রচারলিপি ছাপি। দীপংকরদা আমাকে ফোন করে ও চিঠি পাঠিয়ে জানান, আপনি এক পক্ষের কথা শুনেছেন, অন্যপক্ষের কথাও শুনতে হবে। আমি বহরমপুর ইন্দ্রপ্রস্থে দীপংকরদার বাসভবনে পৌঁছে যাই। শুনেছিলাম ভারতের চার মাও-তাত্ত্বিকদের মধ্যে উনি একজন। নিশ্চই খুব গম্ভীর হবেন। কিন্তু সাক্ষাতে বুঝলাম তা তো নয়ই, সদালাপী, রসিক ও যুক্তিবাদী। ওনার বক্তব্য শুনি এবং জানাই আমি সত্যেই আছি, অন্ধ সমর্থক নই। পরে রৌরব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলি। লাইব্রেরিতে 'অনীক' নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন '৮০-এর দশক থেকেই। বিভিন্ন পুরনো বইয়ের স্টল থেকে ওঁর সম্পাদিত 'পুনশ্চ' ও 'অনীক' কিছু যোগাড় করেছি '৬০ এবং '৭০-এর দশকের।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ২৬ কোতোয়ালী রোডে ১৯৬৪ সালে তিনি সহমর্মী বন্ধুদের সঙ্গে গড়ে তোলেন 'পুনশ্চ সাংস্কৃতিক পরিষদ'। এই পরিষদেরই পত্রিকা 'পুনশ্চ'। 'বহরমপুর চলচ্চিত্র সংস্থা' গড়ে তোলেন ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে। পুনশ্চ থেকে 'অনীক' ৪৯ বছর পথ চলা। রতন খাসনবিশের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক হয়ে নিয়মিত পত্রিকার কাজ করে গেছেন। বিস্মিত হতে হয় 'অনীক'-এর কাজের বিস্তৃতি উপলব্ধি করলে। কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০০৩ নাগাদ কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতাই হয় পত্রিকা প্রকাশের ঠিকানা। আমি 'অনীক'-এর পাঠক হিসেবে নির্বাচিত বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ করছি এখানে। সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ-কে নিয়ে সংখ্যাগুলি ছাড়াও কিছু বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ করছি—

স্তালিন সংখ্যা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৯
কৃষি সমস্যা কৃষক বিদ্রোহ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
কার্ল মার্কস সংখ্যা, মার্চ এপ্রিল ১৯৮৪
ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেস, সেপ্টে-অক্টো ১৯৮৫
বিশেষ স্পেন সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬
বামফ্রন্টের দশবছর, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৭
সমাজতন্ত্রের সমস্যা, অক্টো-নভেম্বর ১৯৮৮
পুঁজিবাদ ও সংশোধনবাদের সমস্যা, সেপ্টে-অক্টো ১৯৮৯
সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ, সেপ্টে-অক্টোবর ১৯৯০
সাম্রাজ্যবাদ ও ইরাক যুদ্ধ, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯১
নব্বই দশকের ভারত, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯১
সমাজতন্ত্রে শ্রেণী সংগ্রাম, ফেব্রু-মার্চ ১৯৯২
নকশালবাড়ির পঁচিশ বছর, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯২
ধর্মীয় মৌলবাদ ও রাষ্ট্র, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৩
মাও সেতুঙ জন্মশতবর্ষ, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৩
গ্যাটচুক্তি ও নয়া আর্থিক নীতি , এপ্রিল-মে ১৯৯৪
কানোরিয়া আন্দোলন ও চটশিল্প, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৫
তেভাগা ও ভূমি সংস্কার, মার্চ এপ্রিল ১৯৯৭
স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৭
পল রবসন, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৮
জন্মশতবর্ষের আলোয়, এপ্রিল ১৯৯৯
গৈরিক ফ্যাসিবাদ, মার্চ-এপ্রিল ২০০০
মৌলবাদ ও জাতীয়বাদ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৩
পল সুইজি, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪
পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-১, মে ২০০৪
পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-২, জুন ২০০৪
বর্তমান বিশ্বে বামপন্থী আন্দোলন, অক্টো-নভেম্বর ২০০৪
আজকের চীন, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
রাষ্ট্র বিশ্বায়ন প্রতিরোধ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬
প্রসঙ্গ সিঙ্গুর, নভেম্বর ২০০৬
জাতীয় জমি গ্রাস প্রকল্প, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৭
নন্দীগ্রাম লড়াই, মার্চ ২০০৭
সমাজ বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রাম, জুলাই ২০১০
ফিরে দেখা: সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, সেপ্টেম্বর ২০১০

বলাবাহুল্য এখানে অনেক সংখ্যার কথাই থাকল অনুল্লেখিত। সমকাল, বিশ্বরাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সর্বত্র উঁকি দিয়েছে অনীক-এর চোখ। ১৯৯১ থেকে দীপংকরদা 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' নামে আর একটি পত্রিকা শুরু করেন যে পত্রিকার বিষয় ভাবনা মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ। দীপংকরদার কাজ থেমে থাকবে না। তাঁর আদর্শেই বেঁচে থাকবে 'অনীক'। দীপংকর চক্রবর্তী আর 'অনীক' আসলে একই মেলবন্ধন।

# লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী

**প্রেমাংশু দাশগুপ্ত**

প্রয়াত দীপংকর চক্রবর্তী সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ব্যক্তিগত কিছু কথা অবধারিতভাবে এসেই পড়বে। এই জন্য *অনীক*-এর সম্পাদকমণ্ডলীকে এবং পত্রিকাটির পাঠকদের আগে থেকেই সেটা জানান দিয়ে রাখা শ্রেয় বলে আমার মনে হয়েছে।

শোষণ মুক্তির স্বপ্নকে সামনে রেখে ষাটের দশকের শেষ ভাগে দেশময় যে উত্তাল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার উত্তাপ থেকে ছাড় পেয়েছে এমন মধ্যবিত্ত যুবক বা ছাত্র হয়ত সেই সময়টাকে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। বর্তমান লেখক তখন ছাত্র এবং এমন একটি কলেজের যেখানে রাজনীতি নিয়ে চর্চাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করা হত। অথচ দেখা গেল, বসন্তের সেই বজ্রনিনাদে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া প্রায় সমস্ত ছাত্রদেরই মনোজগতে কিরকম একটা ঝড় বয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানিকে উপেক্ষা করে পড়াশোনা ছাড়ল এবং সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ল। মার্কসীয় তত্ত্ব নিয়ে কোনও আগ্রহ আমার এর আগে ছিল না। শিক্ষাকে ত্যাগ করার মত কলজের জোর না থাকলেও সময়টা অন্য অনেকের মতো আমাকেও গ্রাস করে ফেলল। তাই নকশালবাড়ির আন্দোলনেকে ঘিরে বিপুল তর্ক-বিতর্কমূলক লেখা সমৃদ্ধ করছিল যে সব পত্রপত্রিকাগুলিকে, তা আমরা গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। ঠিক এই রাস্তা বেয়েই একটা সময়ে 'অনীক' পত্রিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই, মার্কস-লেনিন পড়ার চর্চা আগে থেকে আমার ছিল না। সেই সময়টাতে খুব বেশি গভীরে গিয়ে পড়াশোনা করার উপায়ও ছিল না। পড়াশোনা করার থেকে অ্যাকশনে তখন জোর দেওয়া হচ্ছে অনেক বেশি। মাও দেজং এর বিশেষ কিছু লেখা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ পেত। তাই তখন হাতে হাতে ঘুরত। মার্কসবাদ নিয়ে দৌড় তখন আমাদের অনেকেরই ঐটুকুই। অথচ বুঝতে চাই অনেক কিছু, জানতে চাওয়ার ইচ্ছেটাও প্রবল। মার্কসের বা লেনিনের মূল লেখা পড়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ। ঘটনার গতিবেগ তখন সেই অবকাশটা আমাদের দিতে পারছে না। অন্যদিকে এটাও বুঝতে পারছি, সময়টাকে বা আন্দোলনটাকে বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে। 'অনীক'ই তখন হয়ে উঠল আমাদের অনেকের কাছে এক হাতিয়ার। এর সঙ্গে আর একটা পত্রিকা ছিল আমাদের অবশ্যপাঠ্য। সেটা সমর সেন সম্পাদিত 'ফ্রন্টিয়ার'। রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোনো অতীত নেই, পড়াশোনাও তেমনি প্রায় নেইই, আমার মত এমন সব লোকেরা রাজনীতি চর্চাতে সদ্য হাতেখড়ি নিচ্ছে সেই উথালপাথাল করা সময়টাতে। দিক দেখাচ্ছে তখন 'অনীক' আর 'ফ্রন্টিয়ার'।

এই ভূমিকাটুকু না করলে এক ঐতিহাসিক সময়ে 'অনীক' ঠিক কী দায়িত্ব পালন করেছিল সেটা বুঝিয়ে ওঠা যেত না। দীপংকর চক্রবর্তী অনেক আন্দোলন, অনেক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও কেমন করে যেন 'অনীক' এবং দীপংকর চক্রবর্তী নামটা প্রায় সমার্থক হয়ে গেল। 'অনীক'-এর অন্য সম্পাদকরাও ছিলেন সব সময়েই। তাঁদের কাউকেই ছোট করছি না। কিন্তু দীপংকর চক্রবর্তী হয়ে উঠলেন 'অনীকে'র প্রধান মুখ। তাই 'অনীক'-এর মধ্য দিয়েই রাজনীতি-সচেতন ব্যাপক মানুষের সঙ্গে দীপংকর চক্রবর্তীর পরিচয় ঘটে গেল। আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। লিটল ম্যাগাজিন ঠিক কী জিনিস, কী-ই বা তার অন্তর্বস্তু, এটাও কিন্তু আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে 'অনীক'। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন অনেক দিনের পুরানো হলেও তার সঙ্গে পরিচয় ঘটবার একটা উপলক্ষ কারো কারো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। 'অনীক' আমার কাছে ছিল সেই উপলক্ষ্য। ব্যক্তি দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় কিন্তু এর অনেক পরে।

দেশে জরুরি অবস্থার অবসানের পর দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক অসহনীয় বন্ধ্যাত্ব। দুধের বদলে পিটুলিগোলা খাওয়ার মত শাসক শ্রেণী দ্বারা লালিত এবং অনুমোদিত এক বিকৃত বামপন্থাকে আমরা ক্লীবের মত সহ্য করে গেছি দীর্ঘ সময় ধরে। কোনও ধরনের কোনও নেতৃত্বই আর সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না। অথচ ব্যাপক জনগণের সঙ্গে অন্যায় ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। সে এক দম বন্ধ করা পরিস্থিতি। জরুরি অবস্থার ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস-বিরোধী যে অভ্যুত্থান ঘটে গেল, সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও তার মাথায় চড়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় গেড়ে বসল এমন একটা সরকার যার নেতৃত্বে ছিল সেই দলটি, যার নেতারা জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে বেশ রসে বশে শুধু দিন কাটাননি, ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা কর্মসূচিতে প্রগতিশীলতা দেখতে পেরেছিলেন।

চারিদিকে কেবল এক নীরব শূন্যতা। এই সময়, ২০০৬ সালে ঘটে গেল সিঙ্গুরে কৃষকদের এক প্রতিরোধ আন্দোলন। মহাপরাক্রম বলে মনে হচ্ছিল যে সরকারটিকে তারা একটা বড়-সড় ধাক্কা খেল এই কৃষক জনতার কাছে। সিঙ্গুরের জনগণ নিজেরাই নিজেদের সংঘবদ্ধ করে নিজেদের মত করে রুখে দাঁড়ালেন কর্পোরেট আর সরকারের মিলিত আক্রমণের বিপক্ষে। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের এতদিনের সঞ্চিত সব ক্ষোভের বাঁধ গেল ভেঙে। দিকে দিকে গড়ে উঠতে লাগল সিঙ্গুর আন্দোলনের সংহতিতে নানা সংগঠন। এই সময় সিঙ্গুরে এক জনশুনানির

আয়োজন হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী এবং মেধা পাটকারের সঙ্গে দীপংকর চক্রবর্তী ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের সামনের সারিতে। আন্দোলন আর দীপংকর চক্রবর্তীকে যে পৃথক করে রাখা যায় না সেটা এতদিনে টের পেয়ে গেছি আমরা। আন্দোলনের ময়দান আর দীপংকর চক্রবর্তী ততদিনে একাকার। ঠিক এই সময় ঘটল আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যার অভিঘাতে দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার সামনাসামনি প্রথম পরিচয়।

সিঙ্গুরের আন্দোলনের ঢেউয়ের আঘাতে পশ্চিমবঙ্গ তখন উত্তাল। লিটল ম্যাগাজিনগুলির বেশ বড় একটা অংশ তখন ভীষণই সরব সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণে সরকারি তৎপরতার বিরুদ্ধে। তারা প্রশ্ন তুলছে খোদ উন্নয়নের প্রচলিত সংজ্ঞাটা নিয়েই। এমন সময়েই কলেজ পড়ুয়া কিছু যুবক, যারা একটা পত্রিকা প্রকাশ করতো, তারা নন্দন চত্বরে সিঙ্গুরে সরকারি ভূমিকার নিন্দা করে পোস্টার লাগাল। ফল ফলল হাতে নাতে। তাদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সময়টা ২০০৬-এর নভেম্বর নাগাদ। ছাত্ররা ছাড়া পেয়ে গেল ঠিকই কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনগুলি থেকে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠতে লাগল। এই আওয়াজেই ভর করে একটা দাবি উঠে এল। নন্দনে আগামী জানুয়ারী সরকারি লিটল ম্যাগাজিন মেলাকে সব লিটল ম্যাগাজিনগুলি যেন বয়কট করে। এই ধরনের কোন আন্দোলন সংগঠিত করতে গেলে ম্যাগাজিনগুলিকে আগে তো এক জায়গায় সমবেত হতে হবে। অথচ সেই রকম কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না যা লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে একত্রিত করে মেলা বয়কটের ব্যাপারে মত বিনিময় সম্ভব করতে পারে। সময়ের চাহিদা মেনে তাই গড়ে উঠল লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাস তখন। এই আন্দোলনেও দীপংকর চক্রবর্তী তাঁর 'অনীক'-কে নিয়ে এক আগুয়ান সৈনিক। এই মঞ্চ পরিচালিত হতে থাকল প্রথম থেকেই একটা আহ্বায়কমন্ডলী দ্বারা। এই আহ্বায়কমন্ডলী গঠিত হল বিভিন্ন পত্রিকার কর্মী বা লেখক কিংবা পাঠকদের নিয়ে। স্বভাবতই বিভিন্ন জনের কাছ থেকে 'অনীক'-এর প্রতিনিধি হিসাবে দীপংকর চক্রবর্তীর নামটা প্রস্তাব হিসাবে উঠে আসে এই আহ্বায়কমন্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য। মঞ্চ তখন তার কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত। ব্যস্ত তখন অন্য লিটল ম্যাগাজিনগুলির মত 'অনীক'ও। 'অনীক'-এর মত জনপ্রিয় পত্রিকার সেই অস্থির সময়ে বিপুল চাহিদা। দীপংকর চক্রবর্তী শারীরিকভাবে ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত। কিন্তু পরিশ্রমের কোন বিরাম নেই। যেখানে তখন যত মিটিং, দীপংকর চক্রবর্তী হয় বক্তা হিসাবে নয়ত শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত। টিভি চ্যানেলের আলোচনায়ও ঘনঘন ডাক পড়ছে তাঁর। এই অবস্থা সামাল দিতে দীপংকর চক্রবর্তী প্রস্তাব দিলেন, আহ্বায়কমন্ডলীতে তাঁর না নাম রেখে 'অনীক'-কে রাখা হোক যাতে 'অনীক'-এর কোন না কোন এক প্রতিনিধি যেন আহ্বায়কমন্ডলীর সভাগুলিতে উপস্থিত থাকতে পারেন। ব্যবস্থা সেই রকমই হল। আহ্বায়কমন্ডলীর সভায় কখনো সুমিতা, কখনো বা সিদ্ধার্থ আর পরবর্তীকালে প্রণব দে উপস্থিত থেকেছেন। জরুরি প্রয়োজনে দীপংকর চক্রবর্তীও হাজির থেকেছেন কোনও কোনও সভায়। তবে সভায় যেই উপস্থিত থাকুন না কেন দীপংকর চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিকে বোঝা যায়নি কোনদিন কারণ তিনি না থেকেও ছিলেন সমান সক্রিয়। মঞ্চের অনেক সভা পরিচালনায় তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, কারণ কোন সংগঠন পরিচালনায় তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অপরিহার্য। ষাটের দশক থেকে তিনি নানা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে। তাঁর তুলনায় মঞ্চের অন্য আহ্বায়করা প্রায় শিশুতুল্য। এই মঞ্চ পরিচালনায় তাঁর মতামত খুবই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে তার সঙ্গে মঞ্চের মতের বিরোধিতাও ছিল। যে কোন গণতান্ত্রিক সংগঠনে সেটাই স্বাভাবিক। যে দুটি মূল বিষয় নিয়ে দীপংকর চক্রবর্তীর মঞ্চ পরিচালনার ব্যাপারে আপত্তি ছিল তার একটা মঞ্চের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আর অন্যটা মঞ্চকে কেবলমাত্র এক বাৎসরিক মেলার আয়োজক হিসাবে ব্যবহার করা নিয়ে।

মঞ্চের জন্মকালে একটা সিদ্ধান্ত হয় যে এই সংগঠনে উচ্চ নীচ পদাধিকার থাকবে না। থাকবে কেবল এক আহ্বায়কমন্ডলী, যেখানে সভাপতি বা সম্পাদকের অস্তিত্ব নেই। কর্মসূচি নিয়ে প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সাধারণ সদস্যরাই সাধারণ সভার মাধ্যমে। আহ্বায়কমন্ডলীর দায়িত্ব কেবল সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা। সাধারণ সভার সংগঠনের এক দিশা তৈরি হয়েছিল যেখানে কিছু কিছু বিষয়ে সাধারণ মত গঠিত হয়েছিল। খুব জরুরি অবস্থায় যখন সভা ডেকে ওঠার সময় পাওয়া যাবে না, আহ্বায়করা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেই সাধারণ মত অনুযায়ী এককভাবে বা অন্য কোন সংগঠনের সঙ্গে যৌথ বিবৃতি দিতে পারবেন কিংবা কোন মিছিল-মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দীপংকর চক্রবর্তীর মত ছিল, সংগঠনকে গতিশীল করতে গেলে এই ধরনের কাঠামো কাজ করবে না। আহ্বায়কমন্ডলী থাকুক, কিন্তু তার একজন মুখ্য আহ্বায়ক থাকা প্রয়োজন। এই মুখ্য আহ্বায়কের হাতে যদি যথেষ্ট ক্ষমতা বা স্বাধীনতা না থাকে তবে সংগঠন চলার পথে হোঁচট খেতে বাধ্য। সাধারণ সদস্যরা একাধিক সাধারণ সভায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার অধিকাংশই প্রধান কোন আহ্বায়ক রাখা নিয়ে দীপংকর চক্রবর্তীর মতের বিপরীতেই বলেছিলেন। তাই মঞ্চ এখনো সমান্তরাল সংগঠনের ধারণা নিয়েই চলছে। কিন্তু দীপংকর চক্রবর্তী এই ধারণাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি। আমৃত্যু মার্কসবাদী দীপংকর চক্রবর্তী প্রথাগত ধাঁচেই সংগঠন গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন, যে সংগঠনে পিরামিডের মাথার উপর থাকা এক শীর্ষ বিন্দুর মত একজন ব্যক্তিকে থাকতে হয়। লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই নন, আরও কেউ কেউ এই মতে

বিশ্বাস করেন। কিন্তু সংখ্যাধিকের সমর্থন না থাকার কারণে আপাতত সেই মতকে মেনে না নিলেও মঞ্চ সব সময়ই এই মতটার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে এবং চলতি যে ধারণা নিয়ে মঞ্চ চলছে তার পাশাপাশি এই মতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে।

মঞ্চকে নিয়ে অন্য যে আপত্তির কথা তিনি প্রায়শই বলতেন তা ছিল মঞ্চটার মেলা-সর্বস্ব হয়ে ওঠা। গড়ে ওঠার আদিকালটাতে মঞ্চ বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে। এককভাবে বা কখনো অন্য অনেক সংগঠনের সঙ্গে রাজ্যে ঘটে যাওয়া নানান বিষয়ে নিজস্ব মতামত সে রেখেছেই শুধু নয়, রাস্তায় নেমে নিজের মতের স্বপক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে বক্তব্যও প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই ধরনের উদ্যোগে সাম্প্রতিক কালে কিছু ভাটার টানও এসেছে। এর কারণটাও নানাবিধ।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর্যায়ে আমাদের মঞ্চের মত আরও অনেক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেই রকম প্রায় সমস্ত সংগঠনই হাল আমলে তাদের গতিবেগ হারিয়েছে। আমাদের মঞ্চ তার ব্যতিক্রম নয়। এই বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারি স্মরণে প্রখ্যাত কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র ভরসার স্থল লিটল ম্যাগাজিন। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত আছেন তাঁরা কেউই এই দায়িত্বের কথা অস্বীকার করেন না। বাংলা ভাষার স্বার্থে প্রশাসনিক কাজে ভাষাটাকে অবিলম্বে ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় বলে মঞ্চ মনে করে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে তৎকালীন সরকার এই মর্মে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু ৫২ বছর পরেও কোন সরকারই তা কার্যকর করেননি। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া কর্তব্য বলেই মঞ্চ মনে করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি পাঠাবার বাইরে মঞ্চ কিছুই করে উঠতে পারে নি। সরকারি কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে দীপংকর চক্রবর্তীর মত আরও কিছু সদস্য মঞ্চকে আর একটু বেশি উদ্যোগী হবার পরামর্শ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু দীপংকর চক্রবর্তী অভিযোগ করেছিলেন এই চিঠিটার প্রতিলিপি মঞ্চের প্রত্যেক সদস্যকে পাঠানো উচিত ছিল যাতে তারা সেটা তাদের নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন। মঞ্চ সেটা করে উঠতে পারেনি। দীপংকর চক্রবর্তী এই ব্যাপারে সঠিক কথাই বলেছিলেন বলেই আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি। বর্তমান রাজ্য সরকার তার অনেক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হবার কারণে সামাজিক স্তরে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তা নিয়েও মঞ্চ দায়িত্ব পালন করছেন না বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

দীপংকর চক্রবর্তী এইসব কারণে সাম্প্রতিক সময়ে মঞ্চের সঙ্গে দূরত্ব বোধ করছিলেন। যে দায়িত্বের কথা দীপংকর চক্রবর্তী মঞ্চকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছিলেন, তার কতটা মঞ্চের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব ছিল বা আছে সে নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রয়াণে এই ধরনের সুস্থ বিতর্ক হাজির করার মত এক তীব্র ব্যক্তিত্বের অভাব মঞ্চ অনুভব করবেই। লিটল ম্যাগাজিন যেমন হারাল তার আন্দোলনের এক অগ্রণী সৈনিককে তেমনি মঞ্চও হারাল তার এক স্তম্ভকে। কোনও কোনও বিয়োগের ফলে হিসাবকে আর কখনো মেলানো সম্ভব হয় না। এই না-মেলা হিসাবকে তাই বয়ে বেড়াতে হয় আগামী সময়কে অন্য কোন হিসাবের সন্ধানে। দীপংকর চক্রবর্তীর বিয়োগ তেমনি ভাবেই মঞ্চকে রত করবে নতুন করে ভাবতে, নতুন করে সন্ধান করতে। মহৎ কোন জীবন এই ভাবেই সম্ভবত ভবিষ্যতের উপর তার ছাপ রেখে যায়। যতদিন ধরে আগামী দিনে লিটল ম্যাগাজিন মঞ্চ পথ চলবে ততদিন তার সঙ্গে দীপংকর চক্রবর্তীর সম্পর্কটা এমনি স্তরেই রয়ে যাবে। তাঁকে হারিয়েও আমরা তাঁকে হারাতে পারব না।

---

## একজন দীপংকর চক্রবর্তী

৫৭ পৃষ্ঠার পর

অন্যেরা বেঠিক। যাওয়ার সময় অবশ্য আমাকে উদ্দেশ্য করে অমূল্য সেন বললেন তিনি যে এখানে এসেছিলেন এটা যেন বাইরে চাউর না হয়। এতদিন বাদে এটা বলার আর কোন বাধা নেই, কারণ দুজনের কেউই আর জীবিত নেই।

শুরুতে না থাকলেও পরে দীপংকর চক্রবর্তীর মানবাধিকার আন্দোলনের সংঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িয়ে পড়াটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছিল। সিঙ্গুর আন্দোলন এবং নন্দীগ্রামে প্রতিরোধ— এই উভয় ক্ষেত্রেই তার নিরলস পরিশ্রম মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা দীর্ঘদিন মনে রাখবে। শারীরিক অসুস্থতা ও বয়স তার কাজের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি যদিও পুলিশ এসব তোয়াক্কা করেনি এবং তাঁকে পুলিশের হেনস্থা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ইদানীং মানবাধিকার আন্দোলনের এক অংশের সঙ্গে বোধহয় তার মতানৈক্য হচ্ছিল। অন্তত টেলিফোনে কথাবার্তায় আমার সেরকমই মনে হয়েছিল। বিশেষ করে জঙ্গলমহলে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর নানা সংশয় ছিল। কথা হয়েছিল কিছু অপ্রিয় সত্য কথা 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায় লিখবেন। তবে স্বনামে নয়। আমি বলেছিলাম তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে লেখা আর হয়ে ওঠে নি যদিও মাঝখানে আমি একবার তাগাদা দিয়েছিলাম।

দীপংকর চক্রবর্তী সবসময়ই 'ফ্রন্টিয়ার'-এর একজন শুভানুধ্যায়ী। গত বছর কলকাতা বইমেলায় জান মিরদাল'কে নিয়ে 'ফ্রন্টিয়ার'এর যে অনুষ্ঠান হয়েছিল সে ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল তাঁর। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর উপস্থিতিতে ছেদ পড়েনি। শুরু কথাটাই আর একবার এসে যায়। একে একে বাতি নিভছে। দীপংকর চক্রবর্তীদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার দায়িত্ব নতুনদের উপরই বর্তাচ্ছে।

# দীপংকরদা, ওয়াং হাই ও আমি

বাসুদেব ঘটক

সময়টা আশির দশকের গোড়ার দিক। সদ্য কলেজে ঢুকেছি। হাতে এলো একটা বই। আমাদের স্কুলের বাংলার শিক্ষক দিলেন। কলেজে ঢোকার পরেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বইটার নাম 'বিপ্লবের গান'। রুদ্ধশ্বাসে বইটা পড়ে ফেললাম। বুঁদ হয়ে রইলাম। যৌথকাজে গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া— এটাই মনে হয়েছে 'বিপ্লবের গান'-এর সবচাইতে বড় শিক্ষা। ওয়াং হাই হওয়ার চেষ্টা করতাম। পরবর্তী জীবনটা অনেকটাই বদলে দিয়েছিল এই বইটা। বইটার প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করেছিলাম। প্রাজ্ঞজনেদের কাছে শুনেছিলাম ওয়াং হাই-এর চরিত্র নির্মাণটা কৃত্তিমতা দোষে দুষ্ট। শুনে ক্ষুণ্ণ হয়েছি। ওয়াং হাই যে আমাদের রোল মডেল। নায়কের নাম মনে রেখেছি। লেখকের নাম মনে রেখেছি। অনুবাদকের নাম মনে থাকেনি।

'৮৬ সাল নাগাদ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি। এর আগে থেকেই 'অনীক' পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় ছিল। রাজনীতি করতে গিয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে 'অনীক' পড়েছি। 'অনীক'-এ প্রকাশিত 'বিছন' গল্পের মধ্য দিয়েই মহাশ্বেতা দেবীকে চিনি। তাঁর লেখার প্রতি আগ্রহী হই। 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদকের নাম জানি, পরিচয় নেই। তখন স্রষ্টার চাইতে তাঁর সৃষ্টিই ছিল আমাদের কাছে অনেক বেশি আগ্রহের।

'৯৪ সাল নাগাদ এপিডিআর-এর সঙ্গে যুক্ত হই। আলাপ হয় এপিডিআর-এর সহ সভাপতি দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে। আগেই জেনেছিলাম ইনিই 'অনীক' সম্পাদক। কাজের মধ্য দিয়ে এবার পরিচয় আরো নিবিড় হল। বেশ হাসিখুশি অথচ কড়া ধাতের এই মানুষটাকে ভাল লাগল। ঠিক সময় ঠিক কথাটা ঠিকভাবে বলার একটা অসাধারণ গুণ ওঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। একটু অনুনাসিক টোনে দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলতেন এবং বলা যায় প্রয়োজনে চাঁছাছোলা ভাষায় কথা বলতে জানতেন। শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু যে দিন জানলাম ইনিই *বিপ্লবের গান*-এর অনুবাদক, তখন শ্রদ্ধা যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। আমি যে তখনও বুকের মধ্যে ওয়াং হাইকে বয়ে বেড়াই।

তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এপিডিআর ছেড়েছিলাম, কিন্তু দীপংকরদার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, দেখাসাক্ষাৎও হত। যোগাযোগটা আবার নিবিড় হল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-এর সময়। ওই সময় আমাদের পত্রিকা 'এখন বি-সংবাদ' সাধ্যমতো সমস্ত বিক্ষোভ আন্দোলনে থেকেছে। দেখা হয়েছে দীপংকরদার সঙ্গে। প্রত্যেক বছর বইমেলায় 'এখন বি-সংবাদ'-এর তরফে আমরা একটা স্মারক আলোচনার আয়োজন করি— "শীলভদ্র স্মারক আলোচনা"। ২০০৭-৮-৯ প্রত্যেক বছর আমাদের আলোচনার অন্যতম বক্তা দীপংকরদা। একটি ছোট্ট শিশুর স্মরণে আলোচনা হলেও প্রত্যেক বছর আলোচনার বিষয় থাকতো সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়। প্রত্যেক বছরই আলোচনার শুরুতে দীপংকরদা অত্যন্ত দরদ দিয়ে একটা কথা বলতেন— "একটি ছোট্ট শিশুর স্মারক আলোচনায় প্রত্যেক বছরই যে উদ্যোক্তারা অত্যন্ত সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নির্বাচন করেন এজন্য আমি উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই।" এই রকম দরদ মাখানো কথায় আমার হৃদয় আর্দ্র হয়ে যেত। শীলভদ্র যে আমার একমাত্র সন্তান।

১৯৯৪-৯৭ আমার এপিডিআর-এ থাকাকালীন সময়ে দীপংকরদা ছিলেন আমাদের অভিভাবকের মতো কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পর্যায়ে দীপংকরদা আমাদের বন্ধুর মতো হয়ে উঠলেন। সমস্ত বিষয় নিয়ে দীপংকরদার সঙ্গে আলোচনা করেছি। রিভিউ কমিটির বিরুদ্ধে দীপংকরদার দৃঢ় অবস্থান আমাদের সাহস যুগিয়েছে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ ২০১১ সালে বন্দীমুক্তি নিয়ে কনভেনশন। দীপংকরদা তীব্র ভাষায় সরকারের দ্বিচারিতা এবং বন্দীমুক্তি সংক্রান্ত রিভিউ কমিটির অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়ে বললেন। এরপর বন্দীমুক্তি নিয়ে আর একটা কনভেনশন। দীপংকরদার শরীরটা ভালো নেই। বললেন, ওনাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারলে ভাল হয়। আমরা আনতে গেলাম। গাড়িতে বহু কথা হল। সে দিনের সভায় দীপংকরদাকে অশালীন ভাষায় ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হল রিভিউ কমিটি নিয়ে তার দৃঢ় অবস্থানের জন্য। দীপংকরদাকে নিয়ে ফিরছি। গাড়ির মধ্যে নীরবতা। আমরা অপরাধীর মতো চুপ করে আছি। আমাদের বিশেষ অনুরোধেই দীপংকরদা এই সভায় এসেছিলেন। সাহস যোগালেন। এক সময় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাসিতে পরিবেশকে স্বাভাবিক করে দিলেন।

দীপংকরদা নেই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি বেঁচে আছে। ওয়াং হাই বেঁচে আছে। কথাটা আবেগপ্রবণ শোনালেও সত্য, হাই হওয়ার স্বপ্ন দেখি। বিপ্লবের কাজে হতে পারিনি কিন্তু সমাজ জীবনেও তো ওয়াং হাই হওয়া যায়।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# পিবিএস-এর স্থপতি দীপংকর চক্রবর্তী

**শিবানী মুখার্জী**

আমাদের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় দীপংকর চক্রবর্তী, আমাদের সকলের দীপুদাকে আমরা হারিয়েছি গত ২৭শে জানুয়ারি ২০১৩।

দীপুদার কথা বলতে গেলে আমার প্রথমেই তাঁর একটি কথা মনে পড়ে। অবসর গ্রহণের পর তিনি বইলোয় আমাদের স্টলে অর্থাৎ পিবিএস-এর স্টলে এসেছেন এবং তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আমাকে বললেন— "আমি একজন বেকার যুবক, টাকা দাও, বই কিনব।" দীপুদার পক্ষেই বোধহয় এ কথা বলা সম্ভব।

দীপুদার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের বহু আগেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় 'বিপ্লবের গান' বইটির মাধ্যমে। 'বিপ্লবের গান' বইটির অনুবাদ এক কথায় অসাধারণ। অনেক সময় বিদেশি ভাষার অনুবাদ আমাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না, অনেক সময়ই তা আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে যায়। কিন্তু দীপুদার অনূদিত 'বিপ্লবের গান'— এক মহত্তম শিল্পকর্ম। কী ব্যঞ্জনায়, কী গভীরতায় 'বিপ্লবের গানে'র নায়ক 'ওয়াং হাই' চরিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এর সমস্ত কৃতিত্বই দীপুদার প্রাপ্য।

পিবিএস— প্রতিষ্ঠানটি দীপুদার নিজের হাতে গড়া। প্রথমে এর নাম ছিল পিপলস বুক এজেন্সি। এ সময়েই তিনি প্রকাশ করেন স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো', তাঁর অনূদিত গ্রন্থ পিকিং অপেরার 'লাল লণ্ঠন'। তাঁর সম্পাদিত কবিতা সংকলন 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে', 'কাম্পুচিয়া', সর্বোপরি 'আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক'-র প্রথম তিনটি খণ্ড। এরপর দীপুদা সিদ্ধান্ত নেন 'পিপলস বুক এজেন্সি' বহরমপুরে আর চালাবেন না। তখন পিপলস বুক সোসাইটি (পিবিএস) নাম নিয়ে কলকাতায় এটি স্থানান্তরিত হয়। স্থানান্তরিত হবার পর প্রথম যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাও দীপুদারই এক অসাধারণ অনুবাদ কর্ম— 'চেয়ারম্যান মাও-এর সাথে লং মার্চে'। তারপর থেকে দীপুদারই তত্ত্বাবধানে এবং কলকাতার আরও কিছু বন্ধুর সহযোগিতায় একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীপুদারই রচিত গ্রন্থ 'বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন'। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ', 'পল সুইজির নির্বাচিত রচনা সংকলন', 'একুশের কবিতা ও গান'। একথা নতুন করে না বললে চলে যে 'আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক' দুটি প্রজন্ম জুড়ে আমাদের দেশে যাঁরা সমাজ বদলানোর কাজে ব্রতী তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে রয়েছে।

আমার উপর যখন পিবিএস-এর গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল তখন থেকেই দেখছি পিবিএস-এর যে কোন সমস্যায় দীপুদা সবসময় পাশেপাশে থেকেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদেরও উদ্দীপিত করেছে। আমাদের নতুন বইয়ের উদ্বোধনে দীপুদা মঞ্চে বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর অসামান্য বাচনভঙ্গির দ্বারা বইয়ের বিষয়বস্তুকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। পাঠকের কাছে লেখককে এবং বইয়ের বিষয়বস্তুকে পৌঁছে দেওয়ার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি।

মনে পড়ে তসলিমা নাসরিনের 'আমার মেয়েবেলা' বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন বাংলাদেশের 'পথের পাঁচালি'। ১৯৯৯ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'আমার মেয়েবেলা'-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল। দীপুদা তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর বলার মধ্য দিয়ে যেন "আমার মেয়েবেলা'র চরিত্রগুলির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় হয়ে গেছিল। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড 'উতল হাওয়া'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল গোর্কি সদনে। পিবিএস-এর পক্ষ থেকে দীপুদা বলেছিলেন। বইটির অন্তর্নিহিত লিরিক্যাল সুরটি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত পাঠকদের আপ্লুত করে তুলেছিল। এরপর তসলিমার আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' প্রকাশিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ করে। এই সময়কার গোটা পর্বে দীপুদা, তসলিমা এবং আমাদের পাশে থেকেছেন, সাহস জুগিয়েছেন। ২০১২-র বইমেলায় আত্মজীবনীর সপ্তম খণ্ড 'নির্বাসন' প্রকাশিত হয়। আমার বইটির উদ্বোধনের জন্য পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের কাছে টাকা জমা দিয়ে বই উদ্বোধনের জন্য হল বুক করেছিলাম। দীপুদাই নিজ উদ্যোগে লেখক নবারুণ ভট্টাচার্যকে বই উদ্বোধনের জন্য বলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অদ্ভুত একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, বইমেলা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন তারা নির্ধারিত হলে বই প্রকাশ করেত দেবেন না। তারা মুসলিম মৌলবাদীদের হামলা আশঙ্কা করেছিলেন। এই সঙ্কটকালেও পরিস্থিতি সামলে নেবার দায়িত্ব দীপুদা নিজ কাঁধে তুলে নেন। তিনি ঘোষণা করেন— বই উদ্বোধন হবে একই দিনে একই সময়ে। শুধু জায়গাটা বদলে হবে আমাদের স্টলের সামনেই ছোট্ট ফাঁকা মাঠে। যে কথা সেই কাজ। নবারুণ ভট্টাচার্য বই উদ্বোধন করলেন, কিন্তু ততক্ষণে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য মিডিয়া, সাংবাদিকরা উপস্থিত হন। মিডিয়ার সামনে দীপুদা তাঁর বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত জনতা ঘটনাটিকে ধিক্কার জানান ও বলতে থাকেন যে বই প্রকাশ করতে না দেওয়া লেখকের কণ্ঠরোধ এবং একটি অগণতান্ত্রিক কাজ। দীপুদাকে

এর পর ৭৭ পৃষ্ঠায়

# অগ্রজ বন্ধু দীপংকর চক্রবর্তী

**সব্যসাচী দেব**

দীপংকর চক্রবর্তী সঙ্গে আমার আলাপ কবে? বিয়াল্লিশ বছর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। প্রথম দিকে খুবই সামান্য, দেখা হওয়ার সুযোগও কম ছিল। 'অনীক'-এর কলকাতার আস্তানা ছিল তখন শিয়ালদায়, মহাত্মা গান্ধী রোডে। সেখানে হঠাৎ কখনো দেখা হয়ে যেত, খুবই সংক্ষিপ্ত আর মামুলি সে সব আলাপ। সময়টা উত্তাল, বাইরের ময়দানে যেমন লড়াই চলছে তেমনি আলোড়ন চলছে মনোজগতে— রাজনীতি বুঝি না বা করি না বলে মুখ ঘুরিয়ে রাখার কোন উপায় নেই বাংলার মধ্য শ্রেণীর। আর সেই রাজনীতি-মনস্কতার বাধ্যতায় দীপংকর চক্রবর্তীর নামটা এড়িয়ে যাওয়াও উপায় ছিল না। 'অনীক' পত্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছিল, সেই সুবাদেই তার সম্পাদক সম্পর্কেও। মাঝে মাঝে দু-একটা ব্যাপারে তাঁকে চিঠি লিখতে মানে 'অনীক'-এ চিঠি লিখতে ইচ্ছে হত, স্বভাবগত আলস্যে সেটা কখনো হয়ে ওঠেনি, ফলে তক্ষুণি সেরকম কোনো নৈকট্য গড়ে ওঠেনি তাঁর সঙ্গে।

আলাপ ভাল করে হলো ১৯৭১-এ। মাসটা মনে নেই। আমরা তখন একটা ছোট পত্রিকা বার করি, খুবই অকিঞ্চিৎকর সেই পত্রিকা কেন জানি না সামান্য সাড়া জাগিয়েছিল। সেই সময়েই সমধর্মী কয়েকটি পত্রিকা একটি সাধারণ পারস্পরিক সমন্বয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটা বৈঠকে বসেছিল, সেখানে এমন কোনো পত্রিকাও ছিল যারা পরবর্তীকালে গায়ে-গতরে পুষ্ট হয়ে বেশ নামি ও দামি হয়ে উঠেছিল। সেই বৈঠক হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বাড়িতে, তিনি সেই সময় বিপ্লবী রাজনীতির সমর্থক ছিলেন, তাছাড়া তার ভাইও সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হাজির। ওই ছোট পত্রিকার সুবাদেই আমরা ডাক পেয়েছিলাম সেই বৈঠকে, 'অনীক'-এর পক্ষ থেকে ছিলেন দীপংকর। সেখানে তাঁর সঙ্গে সত্যি সত্যি আলাপ। বৈঠকে ঐক্যের সুর প্রধান হলেও মাঝে মাঝেই তর্ক লাগছিল, তখন দেখছিলাম কীভাবে যুক্তিজাল ছড়িয়ে দীপংকর আলোচনাকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত রাখতে পারেন। সেদিনের আলোচনা অবশ্য কথায় ও আশাবাদেই শেষ হয়েছিল, তার বেশি পরে আর এগোনো যায়নি। কিন্তু দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা তৈরি হয়ে গেল। এরপর কলকাতায় 'অনীক' অফিসে তাঁর সঙ্গে একটু নিয়মিত দেখা হত। তিনি কলকাতায় এলে আগে খবর পাঠাতেন।

তারপর তো জল অনেক গড়াল। বিপ্লবী আন্দোলনের সাময়িক বিপর্যয় ও নানা বাধা বিপত্তির মাঝেও 'অনীক' তার প্রত্যয়ে অবিচল, সব সময়ে যে মতের মিল ঘটেছে তা নয়, কিন্তু এই ভরসাটা ছিলই যে এই পত্রিকা আলোচনার জায়গাটা খোলা রাখেই। এটা তো মানতেই হবে বিপ্লবী আন্দোলনে বহু সময়েই গোঁড়ামি, মতান্ধতা, বিশেষ লাইনের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য চিন্তাকে অস্বচ্ছ করে তোলে, তার প্রবাহকে বেগবতী থাকতে দেয় না। 'অনীক' পত্রিকার নিজস্ব একটা ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু অন্য চিন্তায় প্রবেশাধিকার তাঁরা কোন সময়েই রুদ্ধ করেন নি। এটা পত্রিকার পরিচালকমন্ডলীরই বৈশিষ্ট্য, তবে এর পিছনে দীপংকরের ভূমিকাই অনেকখানি। ফলে এই এই পত্রিকাকে কখনো মনে হয়নি অনাত্মীয়। একাত্তর সালে ভাল করে আলাপ হলেও 'অনীক'-এ আমার নিজের লেখালেখি শুরু তিয়াত্তরের পরে। দীপংকর চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদকীয় কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে আমার কাছে কবিতা চেয়েছিলেন। আমি নিজে থেকে যে লিখিনি তা কোন অহং-এর চাপে নয়, স্রেফ আলসেমি কাটিয়ে হয়ে উঠতো না বলে। দীপংকর লেখা চাওয়া মাত্রই অবশ্য লেখা পাঠিয়েছিলাম, 'অনীক' আমার লেখা চেয়েছে এই গর্ববোধেই কিছুটা। তারপর থেকে বোধহয় কোন বছরই আমার লেখা বাদ পড়েনি। সম্পাদক যতদিন বহরমপুরে থাকতেন প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে 'অনীক'-এর চিহ্ন-আঁকা একটি কার্ড এসে পৌঁছাতো আমার ঠিকানায়, লেখার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ। কবিতা এবং প্রবন্ধ— দুই লিখে গেছি অকাতরে, কোনো বছর একাধিকবার; কিছুটা প্রশ্রয় জুটেছিল অস্বীকার করতে পারবো না। বহরমপুরে থাকতেই বইমেলা, সম্ভবত সেটাই প্রথমবার, দীপংকর আমাকে ডেকেছিলেন। সেই আমার প্রথম বহরমপুরে যাওয়া, সেখানেই, সেই বইমেলা-প্রাঙ্গণেই আমার পরিচয় হলো মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে, আধঘন্টার মধ্যেই মঞ্চে ওঠার সিঁড়িতে বসে গল্প করতে করতেই যিনি হয়ে গেলেন মহাশ্বেতাদি। এই একটি ব্যাপারে দীপংকরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যদিও সন্দেহ হয়, কৃতজ্ঞতা শব্দটা তিনি বোধহয় পছন্দ করতেন না।

আমাদের আলাপ আরও গাঢ় হলো ওই বইমেলায়। তারও বেশ কিছু কাল, মানে দুই দশক পরে তিনি পাকাপাকি কলকাতাবাসী হলেন। ঘটনাচক্রে হলেন আমারই নিকট প্রতিবেশী। এবার চিঠিপত্রে যোগাযোগ নয়, প্রায়ই দেখা হয় রাস্তায়, আমি ও আমার স্ত্রী কখনো তাঁর ফ্ল্যাটে, আর বহুবারই তিনি আমাদেরই ফ্ল্যাটে। তিনিই অবশ্য বেশি এসেছেন। আমাদের যোগাযোগ এবার হয়ে উঠল পারিবারিক। নিছক আড্ডা মারতে কখনো আসেন নি, কোনো কাজের তাগিদ থাকতই, তবে কাজের সময়টা পার করে দিয়ে নিখাদ গল্পে

মেতে গেছি প্রতিবারই। আর সে-গল্পের সিংহভাগ জুড়ে থাকত রাজনীতির প্রসঙ্গ— তিনি মূলত বক্তা, আমি সায় বা ঈষৎ-আপত্তি-তোলা শ্রোতা, কারণ তিনি প্রখর রাজনৈতিক বোধের অধিকারী আর আমার রাজনীতির জ্ঞান খবরের কাগজ-পড়া। এরপর তিনি আমাদের পাড়া ছেড়ে অন্য এলাকায়, যদিও একই শহরতলিতেই। টেলিফোন তো ছিলই, কয়েকদিন পরে আমাদের দুজনেরই পকেটে সেলফোন, কাজেই খবরাখবরে কোনো বাধাই থাকল না। তাছাড়াও মোবাইলে অগ্রিম জানান দিয়ে চলে আসতেন তাঁর বাইকে সওয়ার হয়ে, দু-একবার যার পিছনের সিটে আমাকেও চাপতে হয়েছে। আমাদের পাড়ায় থাকার সময়ে প্রাতর্ভ্রমণের সুবাদে এই এলাকার অনেক ভিতরের রাস্তা চেনা হয়ে গিয়েছিল তার, ফলে ব্যস্ত ভিআইপি রোড এড়িয়েই যাতায়াত করতে পারতেন। হৃদযন্ত্র সবল ছিল না, তবু তিনতলা উঠতে কোনোদিন হাসি হারায়নি তাঁর মুখ থেকে। ২০০৬ থেকে প্রথমে সিঙ্গুর পরে নন্দীগ্রাম, লালগড়কে কেন্দ্র করে যে গণ-আন্দোলন শুরু হয়, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ছিলেন অগ্রণী কর্মী, সেই সঙ্গে সতর্ক সমালোচক-সমর্থক। ওই আন্দোলনের সঙ্গে কিছুটা যুক্ত ছিলাম বলে আমাদের আলোচনাও এই পর্বে ওই সূত্র ধরেই এগোত, দেখাশোনাও হত অনেক বেশি। তাছাড়া এপিডিআর-এর নানা কর্মসূচিতেও একসঙ্গে মিলবার একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল। নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বিস্তৃত কর্মজগতের কারণে দীপংকর স্বাভাবিক ভাবেই ছিলেন নেতৃস্থানীয়, আমি একেবারে পেছনের সারির একজন, তবু মতামত বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ ছিল।

দীপংকর চক্রবর্তীর অ্যাকাডেমিক শিক্ষা অর্থনীতিতে, আমার যেটুকু পড়াশোনা সাহিত্য নিয়ে, সিনেমা নিয়ে খানিকটা উৎসাহ ছিল সেই সঙ্গে। আমাকে তাই দীপংকর, এতদিনে যিনি দীপংকরদা, নানা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লেখায় প্ররোচিত করেছেন, দু-একবার সম্ভবত সিনেমা নিয়েও লিখতে হয়েছে। প্রায়ই বলতেন সাহিত্যটা বুঝি না, কথাপ্রসঙ্গে ধরা পড়ত তন্নিষ্ঠ বিচারক না হলেও শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বোধ অগভীর ছিল না। কলেজ-জীবনে বিষ্ণু দে-র ছাত্র ছিলেন, তা নিয়ে একটু চাপা গর্বই ছিল তাঁর। 'অনীক'-এর শুরুতেই বিষ্ণু দে-রলেখা ছেপেছিলেন, পরে এই পত্রিকায় লিখেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বা আরও অনেকে। শঙ্খ ঘোষ তো প্রায় নিয়মিতই। এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে শঙ্খ ঘোষের একটি নির্বাচিত সংকলন-এ তাঁর সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তখনো দেখেছিলাম কবিতা সম্পর্কে তাঁর বোধ কতটা। সম্পাদক হিসেবে তাঁর আর একটি ব্যাপার আমার খুব অনুসরণযোগ্য মনে হয়েছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে বাংলা-ভাষার একজন উল্লেখযোগ্য কবির ভূমিকা নিয়ে অনেকের মনে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। এই কবির কবিতা সত্তরের দশকের বিপ্লবী আন্দোলনের মর্মবস্তুকে অসামান্য দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করেছিল, তাঁকে গণ-আন্দোলনের একজন স্বাভাবিক মিত্র হিসেবেই গণ্য করা হত। 'অনীক'-এ তার অজস্র কবিতা বেরিয়েছে। এই পর্বেও দীপংকর তার কবিতা ছাপতে দ্বিধা করেন নি। এই সময়েই একজন সমালোচক যিনি কবির অত্যন্ত মনোযোগী পাঠক, কবির সমগ্র কাব্যগ্রন্থের প্রেক্ষিতে তার তৎকালীন ভূমিকার সমালোচনা করেন একটি লেখায়, এবং সে লেখাটি 'অনীক'-এ পাঠান। যথেষ্ট যোগ্য লেখা সত্ত্বেও সেটি ছাপা হয়নি। দীপংকরের মনে হয়েছিল, এই কবিকে এখনি শত্রু শিবিরে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর মনে হয়েছিল, কবি তখনো সীমান্তবেড়ার উপরে বসে। লেখাটি ছাপা হয়নি, কিন্তু কবিকে তিনি লেখাটির কপি দিয়ে এসেছিলেন, পাঠকের সামনে বেআব্রু না করলেও কবির জানা উচিত তাঁর মূল্যায়ন কীভাবে হচ্ছে—এই তার মনে হয়েছিল। এই কবি সম্পর্কে তাঁর আশা অবশ্য টেঁকেনি, তিনি অচিরেই প্রকাশ্যেই তৎকালীন শাসকদলের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন এবং দীপংকরও তৎক্ষনাৎ 'অনীক'-এ তাঁর কবিতা আর না ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হয়ত এই কথা বলা টেকনিক্যালি ভুল হলো, 'অনীক' পত্রিকার একটি সম্পাদকমন্ডলী আছে, নিশ্চয়ই দীপংকর চক্রবর্তী একা সিদ্ধান্ত নিতেন না, তবে মনে হয় তাঁর ভাবনা যথেষ্টই গুরুত্ব পেত। শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে এই ধরনের সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিতেন তিনি, যে জিনিসটি বামপন্থী মহলে দুর্লভ। বামপন্থী ঘরানায় শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে এক প্রবল অসহিষ্ণুতা কাজ করে, আর প্রায়শই রাজনৈতিক উচ্চারণের অশৈল্পিক প্রত্যক্ষতা দাবি করা হয়। দীপংকর এগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন কেননা নিজের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। আর শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। ফলে সম্পাদক হিসেবে তাঁকে কিছুটা অসুবিধাতেই পড়তে হয়েছিল মনে হয়। 'অনীক' পত্রিকার বামপন্থী চরিত্রের জন্য অনেক লেখাই আসত, বিশেষত কবিতা এবং সমকালীন ঘটনা নিয়ে লেখা, যাদের শিল্পমূল্য ন্যূন। অনেকসময়ই এই ধরনের লেখা তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, তাতে তিনি খুব স্বস্তি বোধ করেননি। আবার কখনো কখনো এমন লেখাও তিনি প্রকাশ করেছেন, এখানেও প্রধানত কবিতার কথাই বলছি, যে লেখা খুব উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক শ্লোগানে ভরপুর নয়, অথবা লেখক বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কাছাকাছি-থাকা লোক নন। এই ধরনের লেখা নিয়ে একশ্রেণীর পাঠকের প্রবল অভিযোগ ছিল। জানি না সে অভিযোগের আঁচ দীপংকর টের পেয়েছিলেন কিনা!

শুধু কাগজ সম্পাদনা ও তাত্ত্বিক আলোচনার জগতে

এর পর ৬৮ পৃষ্ঠায়

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# প্রিয় অগ্রজ প্রিয় সম্পাদক

**অমর মিত্র**

১৯৮০ সালের গ্রীষ্মের এক সকালে মহাশ্বেতাদির বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের সেই বাড়িতে দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার দেখা। তখন কেন ১৯৭১-৭২ থেকেই আমি *অনীক* পত্রিকার নিমগ্ন পাঠক। আর দীপংকর চক্রবর্তীর অনুবাদে 'বিপ্লবের গান' পড়ে আমি মুগ্ধ। অমন সুন্দর গদ্য সচরাচর চোখে পড়ে না আমাদের অনুবাদ সাহিত্যে। সোভিয়েত দেশের প্রগতি বা রাদুগা প্রকাশনের ননী ভৌমিক, সমর সেন বা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়দের অনুবাদ পড়ে বড়ো হওয়া আমার কাছে ঐ অনুবাদ ('বিপ্লবের গান') সেই গোত্রীয় মনে হয়েছিল। সেই গদ্যভাষার যেমন দার্ঢ্য, তেমনি তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। আমি তাঁর গোপন অনুরাগী ছিলাম সেই বেড়ে ওঠার সময় থেকে। তখন গল্প লেখা আর সম্পাদকের কাছে ডাকে পাঠানো এবং আশ্চর্য্য এক নীরবতার ভিতরে দিন যাপনই ছিল অভ্যাস। ভাবতাম চিঠি আসবে হয়ত মনোনীত হয়েছে সেই খবর নিয়ে। আসত না। *অনীকে* আমি গল্প পাঠাইনি তা স্পষ্ট মনে আছে। কারণ জানতাম সেই গল্প নিশ্চিত ভাবে অমনোনীত হবে। অতটা বৈপ্লবিক গল্প আমার মনে ঠাঁই পায় না। অবাস্তব মনে হয়। *অনীকের* একটি গল্প সংখ্যা বেরিয়েছিল '৭০-এর দশকের কোনো এক সময়ে। মনে পড়ে, সে সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্ণ মিত্রের একটি গল্প নিয়ে পাইকপাড়ায় রানী হর্ষমুখী রোডে দীপেন্দু চক্রবর্তীর বাড়িতে তাঁর অনুজ উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ তর্ক করেছিলাম। পরে জানলাম, লেখকের সঙ্গেই আমি তাঁর গল্পে আমার আপত্তির জায়গা কয়েকটির কথা নিয়ে ঘন্টা দেড় ব্যয় করেছি। দিন তখন এমন ছিল।

হ্যাঁ, 'দানপত্র' গল্প নিয়ে দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রথম আলাপ। ১৯৮০-র সেই গ্রীষ্মে আমি গল্পটি লিখে মহাশ্বেতাদিকে শোনাই। তখন চাকরি মেদিনীপুরে। কলকাতায় আসি গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। তা যেমন লেখক বন্ধুদের শোনাই, তেমনি এক একদিন বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মহাশ্বেতাদির বাড়ি। দীপংকর চক্রবর্তী— ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, বহরমপুর, আমার সামনে বসে। চশমার ভিতর দিয়ে জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ। একই দিনে দুটি ঘটনা ঘটেনি নিশ্চয়। আগে মহাশ্বেতাদির শোনা ছিল। তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। গল্প পাঠানোর কথা বলে দিয়েছিলেন। সম্পাদক বলেছিলেন, পড়ে দেখি। খুব ভরসা তিনি দেননি। আমি তখন অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখে ফেলেছি, যুগান্তর অমৃত পত্রিকায় লিখি। কিন্তু কৈশোর পার করে *অনীক* পত্রিকার সঙ্গে এক গোপন সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছিলাম নিজে নিজে। না, অত রাজনৈতিক প্রবন্ধে নিশ্চিত আমার টান ছিল না, কিন্তু সম্পাদকের লেখা ছিল প্রাঞ্জল, আমাকে টানত। আর গল্পের আকর্ষণ ছিল। ওইটি ছিল প্রধান। আমি এক সঙ্গে শ্যামল, মহাশ্বেতা, দেবেশ রায়ের সঙ্গে পড়তাম স্বর্ণ মিত্র, অজিত মুখোপাধ্যায়, মণি মুখোপাধ্যায় বা আর কারো কারো গল্প যা অনীকে প্রকাশিত হত। সে সব গল্পে গ্রামে যাওয়া যুবকদের কথা থাকত। গ্রামের নিরুপায় মানুষের কথা থাকত। তার কোনোটা ছিল বাস্তব, কোনোটা তার বাইরে। আমি নানাভাবে বুঝতে চাইতাম। *অনীক* সম্পাদক কোনো অনুরোধের লেখা নিশ্চয় ছাপবেন না। আর সে অভিপ্রায় নিয়ে তো তাঁকে লেখা দিইনি। সেই সময় *অনীক অনুষ্টুপ* বা *প্রস্তুতি পর্ব* ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। সেইসব পত্রিকা আর নামী বাণিজ্যিক পত্রিকার লেখকরা ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। মহাশ্বেতাদি এই ব্যারিকেড প্রথম ভাঙেন। তিনি অপারেশন বসাই টুডু লিখেছিলেন কৃত্তিবাস পত্রিকায়। আর জগমোহনের মৃত্যু লিখেছিলেন অমৃত পত্রিকায়। আবার বিছন অনীকে, মায়ের মূর্তি যুগান্তরে। আমি সেই পথেই বিশ্বাস করি। তবু আমার লেখা নিয়ে একটু সংশয় ছিল। এক রাজনৈতিক আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন। আমার নানা বক্তব্য আছে সেই বিষয়ে। কট্টর কিছু ব্যক্তির নিকট আমি নিজেও আমার অনেক অদ্ভুত সমালোচনা শুনেছি। দরিদ্র মানুষের নিরুপায় জীবন নিয়ে কথা বলতে গেলে মৃদু ব্যঙ্গাত্মক হাসি দেখেছি তাঁদের মুখে... মেয়েটাকে কেন তার বাপ সহদেব মেলা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে মেয়ে কেনাবেচার দালালের হাতে তুলে দিল? প্রতিবাদ কই এই লেখায়? আমি এমন একজন সম্পাদককে পেলাম যিনি নিজেও সেই প্রথাগতের ব্যারিকেড ভাঙতে চান। প্রগতি সাহিত্য বলি আর জনজীবন সংপৃক্ত সাহিত্য বলি তার একটা ছক ছিল। সে ছক এখনো যে ভেঙেছে তা নয়। *অনীক* যে ত্যাগী আর উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের কথা বলে, যে রাজনীতির কথা বলে, সেখানেও এই বিশ্বাস আছে বলে জানতাম। না হলে সেই কোন কালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমন ভাবে সমালোচিত আর তিরস্কৃত হতে হয় পার্টি আমলাদের হাতে! দীপংকর চক্রবর্তী অনীক সম্পাদক, কিন্তু সাহিত্য শিল্প নিয়ে তাঁর যে রুচি তা নানা ভাবে এই সমাজ আর জীবনকে স্বচ্ছ চোখে দেখার অবিরাম প্রয়াস, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যায়। তিনি আমার 'দানপত্র' প্রকাশ করেছিলেন। সামান্য ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন দেওয়ানি মামলার বিষয়ে। চিঠি দিয়ে সেই অংশের অনুলিপি আমার কাছে পাঠিয়ে বলেছিলেন, নতুন করে অনুচ্ছেদটি লিখে দিতে। নিজে কলম চালাননি। আমি

১৯৮০ থেকে এই পর্যন্ত তিরিশটির মতো লেখা লিখেছি *অনীক*-এ। যা লিখেছি, তা সম্পাদক পড়ে ছেপেছেন। হ্যাঁ, তিনটি গল্প ছাপতে পারেন নি। কেন পারেননি তা আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। আবার এমন গল্প ছেপেছেন, যে গল্প নিয়ে আমার নিজের কোনও সংশয় ছিল না, কিন্তু *অনীক* সম্পাদক তা প্রকাশ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চিত ছিলাম। সেই গল্প, 'প্রাণ বায়ু' অনীক সম্পাদক ছেপেছিলেন। আমি নিজেই সেই গল্পের জন্য *অনীকের* নিয়মিত পাঠকের নিকটে নিন্দিত হয়েছিলাম তার যৌনতার জন্য। দীপংকর চক্রবর্তী আমাকে বলেছিলেন, আমি গল্প না পড়ে তো ছাপি না, সে মহাশ্বেতা হন বা অমর তুমি হও।

আমি বাণিজ্যিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখি। উপন্যাসও লিখি, গল্পও লিখি। সেই লিখতে লিখতে *অনীক* পত্রিকায় নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান নামে একটি উপন্যাস লিখি। দীপংকর চক্রবর্তী ও রতন খাসনবিশ আগে পড়লেন, তারপর সেই উপন্যাস প্রকাশ করলেন '৯০-এর দশকের শেষ দিকে খুব সম্ভবত। মনে হয়েছিল *অনীক* আমার নিজের কাগজ, সেখানেই লিখি ভিখিরি পাশোয়ানের অন্তর্ধান নিয়ে ঐ উপন্যাস। অন্যত্র লেখা যেত, মনে হয়েছিল *অনীকের* জন্য লিখেছি, তাই *অনীকেই* ছাপা হোক। পিপলস বুক সোসাইটি বইটি প্রকাশ করেছিল। হ্যাঁ, তখন ঐ প্রকাশন সংস্থা প্রত্যাখাত এবং প্রায় অবরুদ্ধ তসলিমা নাসরিনের সাহসী কলমকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছিল। মনে হয়েছিল দীপংকর চক্রবর্তীদের মতো উদার প্রকৃতির মানুষ চারপাশে থাকলে আমাদের প্রগতি সাহিত্যের চেহারা বদলে যেত। তিনি তো পিবিএস-এর সঙ্গেও ছিলেন জড়িত।

আমি এই দীর্ঘ ৪০ বছরে অনেক সম্পাদক দেখেছি। অনেক সম্পাদকের নিকটে লেখা নিয়ে গিয়েছি। তাঁর সব বিখ্যাতজন। কোনো সম্পাদক আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেউ গ্রহণ করেছেন। কেউ গ্রহণ করে সরিয়ে দিয়েছেন। *অনীক* একটি পত্রিকা, যে পত্রিকা আমাকে বর্জন করেনি। অথচ করতেই পারত। *অনীকের* একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনে যাত্রা আছে, আমারও আছে, কিন্তু পথটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলাদা বলে মনে হয়েছে। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে অনেক বিষয়ে মতের অনৈক্য ঘটেছে দীপংকর চক্রবর্তীর। আমার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা মেলেনি *অনীক* সম্পাদকের কোনো বিশেষ ধারণা। কিন্তু তাতে তাঁর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হইনি। আর হইনি বলে, 'নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান' লেখার কথা ভাবতে পেরেছিলাম। আমি এমন কিছু গল্প লিখতে পেরেছি, যা পরে আমাকে স্বস্তি দিয়েছে। হয়ত কলমটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করিনি। আমি যেটুকু লেখক হয়েছি তার পিছনে এই মানুষটির ভূমিকা আছে অনেকটা। লেখক তো আকাশ থেকে পড়েন না, তিনি গড়ে ওঠেন, আমার গড়ে ওঠার পিছনে এই সম্পাদক বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, যে লেখা বাণিজ্যিক কাগজে লিখেছি, সেই লেখা লিখতেও দীপংকর চক্রবর্তীদের ভূমিকা কম নয়। আসলে লেখক জীবনের আরম্ভে আমি মহাশ্বেতা, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায় থেকে অশোক সেন, দীপংকর চক্রবর্তীদের সঙ্গ করেছি, সেই সঙ্গটি বড় এক প্রাপ্তি। আমার এক সম্পাদক-শিক্ষক শ্যামলবাবু চলে গেছেন, আর একজন চলে গেলেন, মনে হচ্ছে চারদিকটা ধু ধু হয়ে যাচ্ছে। আমার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অবধি কে সময় দেবেন গম্ভীর গলায়, তখন দিলেও *অনীক* তা পুজো সংখ্যায় ছাপবে। তুমি লিখবে। সেই কণ্ঠস্বর আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে এত বছর ধরে। ভাবতেই পারছি না, মানুষটি নেই। প্রিয় অগ্রজ, প্রিয় সম্পাদক, আপনি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ করুন।

---

## অগ্রজ বন্ধু দীপংকর চক্রবর্তী

৬৬ পৃষ্ঠার পর

নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি, কেবলই নিজেকে যুক্ত রেখেছেন চলমান গণ-আন্দোলনের সঙ্গে, গত কয়েক বছরে সেই সূত্রেও তাঁর যোগাযোগ একটু বশি হয়েছিল, তাছাড়া আমাদের বাড়িতে যখনই আসতেন, গোপন করার চেষ্টাই করতেন না যে তিনি আমাকে 'অনীক' পরিবারের সদস্য বলে মনে করেন। সেই সুবাদে কিছুটা দাবিও ছিল তাঁর আমার উপর। নিজের নানা অকাজের ব্যস্ততায় আমি সে দাবির মর্যাদা রাখতে পারিনি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা টেলিফোনে। কিছুদিন আগে শাসকদলের গুন্ডা-নির্ভরতার প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ, তাতে প্রভূত গোঁসা করে মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ লেখক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক নেতাদের মূর্খতা অধিকাংশ সময়েই কৌতুকের উপাদান হলেও দীপংকর ব্যাপারটিকে প্রতিবাদযোগ্য মনে করেছিলেন। আমাকে তিনি ফোন করেছিলেন এই প্রতিবাদ সংগঠিত করার বিষয়ে, নিজে সে সময় বেশ অসুস্থই ছিলেন। এই সজাগতা তাঁর রাজনৈতিক বোধেরই অন্তর্গত ছিল।

শরীর অসুস্থ ছিল, আমাকে অনেকবার বলেছেন পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলেই 'অনীক'-এর দায়িত্ব অন্যদের দিয়ে একটু ভারমুক্ত হবেন। যদিও আমার সন্দেহ ছিল সেটা তিনি আদৌ পারবেন কিনা! সে সন্দেহ নিরসনের সুযোগই দিলেন না দীপংকর। অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর প্রয়াণ আকস্মিক, যদিও এই অবধারিত ঘটনাটির সম্ভাবনাকে যেন উপেক্ষা করেই সেদিনও তিনি গিয়েছিলেন এক আনন্দময় চড়ুইভাতিতে। তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই হারালেন অনেককিছুই, 'অনীক'-এর ক্ষতি অপূরণীয়, তাঁর পরিবারের কাছে এ এক চিরকালীন ক্ষত, আমি ব্যক্তিগতভাবে হারালাম এক বন্ধুকে, চার দশকেরও বেশি সময় ধরে যে বন্ধুত্ব বেড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে।

# দীপংকর চক্রবর্তী : চল্লিশ বছরের চেনাজানা

**সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল প্রায় চল্লিশ বছরের— সেই ১৯৭৪ সাল থেকে। *অনীক*-এ একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম; দীপংকরদা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, গল্পটা ছাপা হচ্ছে। সেই চিঠিটা আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না। তবে অনেক পরে লেখা অন্য একটা চিঠির ফটোকপি সঙ্গে দিলাম। অনীকের ছাপ-লাগানো কী ধরনের চৌকো কার্ডে সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী চিঠি লিখতেন, তার একটা নমুনা।

এরপর ১৯৭৫ সালে মে দিবস সংখ্যা *অনীকে* 'জনৈক অনিরুদ্ধ' নামে আমার যে লেখাটা বেরিয়েছিল, তার বিষয় ছিল পুলিশ লক-আপে এক যুবকের মৃত্যু। ওই সংখ্যায় বেরোনোর পরের মাসেই জরুরি অবস্থা, সম্পাদকের বাড়িতে পুলিশি হানা— গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন *অনীক* সম্পাদক অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী। এই সব খবরই কলকাতায় বসে পাচ্ছিলাম। দীপংকরদার সঙ্গে আমার চিঠির আদানপ্রদান হয়েছে এর মাঝখানে; কিন্তু তখনো তাঁকে চোখে দেখিনি। চাক্ষুষ আলাপ আরও অনেক পরে, ১৯৮৯ নাগাদ, এপিডিআর সম্মেলনে। পরিচয় দিতেই দীপঙ্করদা বলেছিলেন : 'আরে তুমি তো আমাদের *অনীকের* লোক।'

ততদিনে *অনীকে* আমার আরও কয়েকটা লেখা বেরিয়ে গেছে। মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের যে ঘরে সপ্তাহে দু-দিন *অনীকের* দপ্তর বসত, সেখানেও যাতায়াত করেছি। রতনদার সঙ্গে কথা হয়; কিন্তু দীপংকরদার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হলো প্রথম পত্রালাপের প্রায় পনেরো বছর পরে। দীপংকর চক্রবর্তী তখন আমার কাছে শুধু পত্রিকা-সম্পাদক নন, মানবাধিকার আন্দোলনের এক প্রধান সংগঠক। এপিডিআর-এ তার পর আমরা দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছি; বিশেষ করে দীপঙ্করদা কলকাতায় চলে আসার পরে।

অনীক-সম্পাদক আর এপিডিআর সংগঠনের নেতা— এই দুই পরিচয়েই আমি দীপংকরদাকে চিনেছি। তাঁর সাহিত্যবোধের সঙ্গে আমার ভাবনার প্রায় কোনো মিল-ই ছিল না। তবু কেন যে তিনি এতদিন ধরে অনীকে আমার এতগুলো গল্প ছাপলেন— ভেবে অবাক হই! আমাকে তিনি পছন্দ করতেন ঠিকই, কিন্তু শুধু সেই কারণেই লেখা ছাপিয়ে দেওয়ার মতো সম্পাদক তিনি ছিলেন না। একটা কারণ এই হতে পারে যে, দারুণ রাজনীতি-সচেতন যেসব গল্প অনীকে ছাপা হতো, সেগুলোর সাহিত্যগুণ যে খুব বেশি নেই— তা দীপঙ্করদা বুঝতেন। আমার গল্পের বিষয় দীপংকরদার খুব পছন্দ না হলেও, স্বাতন্ত্র্য গুণটাকে তিনি মর্যাদা দিতেন। এ-ছাড়া আর কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

অনেকদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, সত্তরের দশকে দীপংকর চক্রবর্তী ছিলেন খুব কট্টর নকশাল। পরে তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারি, তিনি কোনো দিনই সিপিআই(এমএল)-এ যোগ দেননি, ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিও সমর্থন করেননি। শুধু এই জায়গাটাতেই তাঁর সঙ্গে আমার একটা মিল ছিল। অন্য অনেক বিষয়ে আলোচনা করে দেখেছি, রাজনৈতিক চিন্তায় ঠিক কট্টর না হলেও নিজ বিশ্বাসে তিনি বরাবর অটল থাকতেন। একুশ শতাব্দীতে পৌঁছেও দীপংকরদা বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবোত্তর চীনে দুর্ভিক্ষ হয়নি, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে তেমন কোনো অনাচার হয়নি। ভাবা যায়!

এমন একজন সম্পাদকের পত্রিকায় আমি যে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে লিখতে পারলাম, তার কারণ, অন্যদিকে দীপঙ্করদা মানুষটি ছিলেন বেশ উদার। ১৯৭৪ সালের যে সংখ্যায় আমার গল্প ছাপা হয়, সেই সংখ্যাতেই একটা লেখায় বলায় চেষ্টা হয়েছিল, লিন পিয়াও প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ চেয়ারম্যান তাই-ই বলেছেন। পড়ে আমার খুব রাগ হয়েছিল। অনেক বছর পরে একদিন সেই কথাটা বলি। দীপংকরদা উত্তেজিত হয়ে বলেন, হতেই পারে না— *অনীকে* এরকম লেখা কখনোই বেরোয়নি। হাতের কাছে পত্রিকাটা না থাকায় সেই তর্কের মীমাংসা হয়নি। তবে এই জাতীয় লেখা ১৯৭০ দশকে *অনীক* কিন্তু ছাপত। ১৯৯০ দশকের পর পত্রিকা অনেক লিবারাল হয়ে যায়।

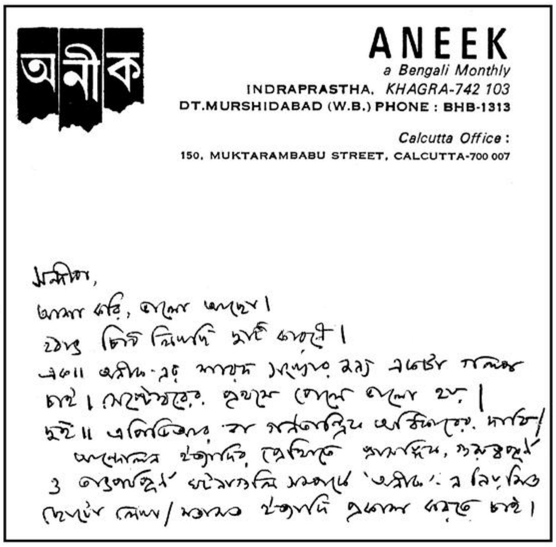
আমার 'রণক্ষেত্র রাজপথ' (২০০২) বইটার অনেকটা অংশই ধারাবাহিকভাবে *অনীকে* আগে বেরিয়েছিল। ১৯৫০-৬০ দশকের বামপন্থী আন্দোলনকে আমি যেভাবে বিচার করেছিলাম, তা দীপংকরদা মেনে নিতে পারেননি। পত্রিকাগোষ্ঠীর আরও কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও কিন্তু *অনীক* পুরো লেখাটা ছেপেছিল— কোথাও সেন্সর করেনি। দীপংকরদা শুধু আমাকে বলে দিয়েছিলেন, প্রতিবাদ করে চিঠি এলে সেটাও আমরা ছাপব; তখন তোমাকে জবাব দিতে হবে। আমি সেই শর্ত মেনে নিয়েছিলাম। চিঠি অবশ্য আসেনি।

মানুষ হিসাবে দীপংকরদা শুধু উদার নয়, অন্যের মতকে মান্য করায়ও বিশ্বাসী ছিলেন। এই পরিচয়টা বিশেষভাবে পেয়েছি এপিডিআর-এর বিভিন্ন সভায়, তর্কাতর্কির সময়। দীপংকরদার একটা বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিল, গলার স্বরটাও ভরাটগম্ভীর। তর্কটা যখন প্রায় বিশ্রী ঝগড়ায় জায়গায় চলে যাচ্ছে, দীপঙ্করদা মাউথপীস হাতে নিয়ে গম্ভীর স্বরে এমন

কিছু বলতেন যাতে অনেকেই চুপ করে যেত। এরকম ঘটনা একাধিকবার দেখেছি। সভাশেষে দীপংকরদা আমাকে বলেছেন, ও খুব একটা ভুল কিছু বলেনি; কিন্তু এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ওসব কথা বলা যায় না— তাই থামাতে হলো।

এইরকমই ছিলেন দীপংকরদা। তিনি নিজের জায়গা থেকে এক পা-ও সরে আসতেন না; কিন্তু তাই বলে নিজের মতটা অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়েও দিতেন না। *অনীক* পত্রিকায় যা লেখা যায়, মানবাধিকার সভার মঞ্চে তা বলা যায় না— এই নীতি তিনি নিষ্ঠাভরে মেনে চলতেন। অনেক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটা গণতান্ত্রিক দাবিকে কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা দীপংকরদা খুব ভালো করে জানতেন। তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল।

দীপংকরদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক ব্যক্তিগত স্তরে পৌঁছয়নি। তবে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছি। ২০০৫ সালে আমি খুব ডিপ্রেসানে ভুগছিলাম। সেই বছর শারদীয় *অনীকে* লেখা দিতে পারিনি। দীপংকরদা আর সুমিতা (ডা. সুমিতা দাস) খুব সহানুভূতির সঙ্গে আমার অবস্থাটা বুঝেছিলেন। সুমিতা কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন; আর দীপংকরদা উদ্বিগ্ন হয়েও ব্যাপারটাকে হালকা করে দিয়ে বলেছিলেন— *অনীকের* আড্ডায় চলে এস, মন ঠিক হয়ে যাবে।


অনীক

**ANEEK**
*a Bengali Monthly*
INDRAPRASTHA, *KHAGRA-742 103*
DT.MURSHIDABAD (W.B.) PHONE : BHB-1313
*Calcutta Office :*
150, MUKTARAMBABU STREET, CALCUTTA-700 007

দীপংকরদার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর আমাকে কে যেন বলেছিল, তিনি আগের মতোই সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। আমি বিনয়ী ভঙ্গিতে কিন্তু একটু রাগ প্রকাশ করে তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। দীপংকরদা উত্তর দিয়েছিলেন; তোমার মতো ছেলে, গুজবে কান দেবে কেন! ছি:! দীপংকরদা জানিয়েছিলেন, তিনি এখন 'গুড বয়' হয়ে গেছেন। এও আর এক রকমের দীপঙ্করদা।

আজ যাদের বয়স ২৫/৩০ বছর, *অনীক* পত্রিকার বিবর্তনটা তাঁরা বুঝতে পারবেন না। আমি অনীক প্রথম দেখি ১৯৭১ সালে, শারদীয় সংখ্যা। লাল রঙের মলাট; তার ওপরে— একজন হাত দিয়ে সূর্যকে ছুঁতে চাইছে— এইরকম একটা ছবি। ক্রোড়পত্র ছিল তেলেঙ্গানা কৃষক সংগ্রাম নিয়ে। তখন *অনীকের* সাধারণ সংখ্যার দাম ছিল এক টাকা। এরপর থেকে আমি মাঝে মাঝে কিনতাম; অথবা স্টলে দাঁড়িয়ে উলটে দেখতাম। বড্ড বেশি চীনমুগ্ধ লেখা— আমার ভালো লাগত না। এই *অনীক*-ই কিন্তু কয়েকবছর আগে আজকের চীনকে আক্রমণ করে একটা বেশ কড়া ধরনের সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। একটা পত্রিকার জীবনে এটা কিছু কম নয়।

ওই সংখ্যাটা বেরোনোর পর আমি দীপংকরদা-কে ফোন করে খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে কিছু বলেছিলাম। দীপংকরদা গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, *অনীক* কোনোদিনই ডগম্যাটিক নয়; তুমি-ই আসলে গোঁড়া— তারপরই অট্টহাসি। দীপংকরদা যে কত জোরে হাসছেন, আমি টেলিফোনেও বুঝতে পারছিলাম। তিনি চড়া গলায় ধমক দিতে পারতেন; আবার যার সঙ্গে মতভেদ হচ্ছে, তাকেও আপন করে নিতে পারতেন দরাজ হাসি দিয়ে।

কয়েক বছর ধরেই দীপংকরদার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তবু নন্দীগ্রাম-লালগড় পর্বে তিনি প্রায় সব মিছিলেই হেঁটেছেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে কোন্নগর বইমেলার একটা সেমিনারে দীপংকরদা আর আমি দুজনেই বক্তা ছিলাম। ওঁরা গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পথে অনেক কথা হয়েছিল। দীপংকরদা বলেছিলেন, সিঙ্গুরে মনে হচ্ছে, আর কিছু করা যাবে না। কিন্তু নন্দীগ্রামকে জিততেই হবে। —এর পর তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ উদাস ভঙ্গিতে দীপংকরদা বলেন, কী জানি, আমার দিন তো শেষ—

আমি বাধা দিতে গেলে দীপংকরদা বলেছিলেন, ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল। আই নো দ্যাট মাই ডেজ আর নাম্বারড!— দীপংকরদার সেই কথাগুলো আজ খুব মনে পড়ছে। নন্দীগ্রাম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে— দীপংকরদা দেখে গেছেন। দীপংকরদা চলে যাওয়ার পর এই কথাটা ভেবে একটু শান্তি পেতে পারি।

# দীপংকরদার অনীক

**মীনাক্ষী সেন**

দীপংকরদার মৃত্যু সংবাদটি হঠাৎ এলো। তিনি অসুস্থ— একথাটা কখনো শুনিনি শুভাশিস-এর মুখে, তাই এই মৃত্যু সংবাদ বুকে ধাক্কা দিলো হঠাৎ করে।

মৃত্যুকে নানা রূপে, নানা ভাবে দেখেছি এ জীবনে। একথাটা তাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি মৃত্যুর ক্ষতি কখনো পূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তার কনিষ্ঠ পুত্র শমীর মৃত্যুর পর জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির দিকে চেয়ে বলেছিলেন বটে— কোথাও কিছু কম পড়েনি। কিন্তু কম কি পড়ে নি? শোনা যায় কবির এই সন্তানটি ছিলো বিরল প্রতিভার অধিকারী— অন্তত শিশু বয়সের তাকে দেখে একথাই মনে হতো। একটি জীবাণুঘটিত নিরাময়যোগ্য রোগের আক্রমণ থেকে যদি তাকে বাঁচানো যেত— তবে হয়তো ঠাকুরবাড়ি থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য আর একজন প্রতিভাধরকে পরবর্তীতে পেতাম। তাকে আর পাওয়া যায় নি ঠাকুরবাড়ি থেকে।

দীপংকরদার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর রাত্রিবেলা, একটু অবসর পেয়ে যখন একা বসেছিলাম, ভাবছিলাম, দীপংকরদার কথা। ওনার সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতি আমার কিছু নেই। জীবনে দেখাই হয়েছে কয়েকবার মাত্র। কথা হয়েছে আরও কম। শেষ দেখা হয় মহাশ্বেতাদির নতুন বাড়িতে। উনি মহাশ্বেতাদির সঙ্গে দরকারি কথা শেষ করে উঠলেন। আমার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে চলে গেলেন, এইটুকু। শেষ কথা হলো ফোনে। আগরতলা-কলকাতা। অক্টোবর মাসে। শারদীয় সংখ্যার অনীকের লেখকসূচীতে আমার নাম ছাপানো হয়নি দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কাজেই ব্যক্তিগতভাবে দীপংকরদা সম্পর্কে দুটির বেশি চারটি কথা লিখবো— এমন কিছু নেই আমার কাছে। এমন কি ওনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সম্পর্কেও শুভাশিসের কাছ থেকে জানলাম ওনার মৃত্যুর পরে। আরও অবাক করা ব্যাপার, ওনার মৃত্যুর মাত্র দিন পনের কুড়ি আগে হবে। দিলীপ বসু, কবি ও অধ্যাপক, দিল্লী নিবাসী, আগরতলা এসেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে বললেন— দীপংকরটা এত ভালো কবিতা লিখতো কিন্তু কবিতা লেখাটা নিয়মিত চালিয়ে গেলো না কেন, ভেবে অবাক হই। এই প্রথম দিলীপদার মুখে শুনলাম দীপংকরদা কবিও ছিলেন। একজন ভালো কবি। ওনার কবিতা আগে পড়েছি, মনে পড়লো না। তবে যদি দীপংকরদাকে না-ই জানি, না জানি ব্যক্তি দীপংকরদা কিংবা কবি দীপংকরদাকে, তবে কেন এই লেখা? শুভাশিসের অনুরোধে এ লেখা লিখছি, সেই দীপংকরদাকে শ্রদ্ধা জানাতে যিনি ৫০ বছর ধরে অনীকের মত একটি পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন। এটি একটি বিরাট মাপের কাজ। অমূল্য কাজ। দীপংকরদার একটি নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত ছিলো। অনীক যেসব প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করতো, যেসব সংখ্যা করতো, তাতে এর পরিচয় থাকতো। সে সব মতামতের সঙ্গেই যে আমার মন ও মতের মিল হতো— এমন নয়, আবার অনেক সময় মন ও মত মিলেও যেতো। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, প্রত্যেকটি লেখাই চিন্তার খোরাক জোগাতো, ভাবনার রসদ হতো। সবচেয়ে বড় কথা দীর্ঘ, দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন ধরে দীপংকরদা পত্রিকাটি চালিয়ে গেছেন। এটি যে কত শক্ত কাজ তা স্পন্দন সম্পাদক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরনী আমি মর্মে মর্মে জানি। দীপংকরদার সবচেয়ে বড় অর্জন এটাই যে তিনি অনীককে কখনো নিজের খ্যাতি অর্জন, নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন বা অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে ব্যবহার করেন নি। অনীকের আকার, আকৃতি, চরিত্র, ধরনধারন ঘন ঘন বদলে যায়নি। অনীক তার আদর্শ ও চরিত্র ঘন ঘন বদলে ফেলেনি বাণিজ্যিক স্বার্থ বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অর্জনের লক্ষ্যে। অনীকে মহাশ্বেতাদির মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর কোন কোনটি লিখেছেন, শংখ ঘোষের মত সর্বজন-শ্রদ্ধেয় কবির কবিতা বেড়িয়েছে অনীকে— তাই বলে অল্প নামী, বা অনামী যারা অনীকের সঙ্গে নানা সময়ে যুক্ত হয়েছেন, লিখেছেন, তাদের কাউকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দেয়নি অনীক। অবজ্ঞা বা অসম্মান করেনি তাদের। এবং খুব, খুব বড় কথা এই যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অনীক এত বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশ হয়েছে। এই কঠিন কাজটি দীপংকরদা এত অনায়াসে, ঢাকঢোল না বাজিয়ে নীরবে তার টীমকে নিয়ে করে গেছেন এতোগুলো বছর ধরে যে মনেই হয়নি কত কঠিন একটি কাজ তিনি কি অনায়াসে করে চলেছেন। তিনি যাদের নিয়ে একাজ করেছেন তাদের গুরুত্ব বা কৃতিত্বও কম নয় কিন্তু হাল ধরার উপযুক্ত মানুষ না থাকলে নৌকা টলমল করে, ডুবেও তো যায়। দীপংকরদার হঠাৎ মৃত্যুতে তাই এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে অনীকের কি হবে? অনীক চলবে তো? অনীক আবার তার শারদ সংখ্যার জন্য লেখা চেয়ে ফোন করবে তো? অনীকের মত একটি বিশেষ ধারার প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যাবে না তো? শুভাশিস বলেছে আমরা অনীক বন্ধ হতে দেবো না। সেটাই হবে দীপংকরদার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো। শোকের প্রাথমিক আবেগ কেটে যাবার পরও এই প্রতিজ্ঞায় তারা স্থির থাকবেন— দীপংকরদার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এই আশাই করবো।

# অধার্মিক দীপুদা!

অরূপশংকর মৈত্র

ষাটের দশকের শেষদিকে সারা বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের হাতছানি। চোখেমুখে যে স্বপ্ন লেপ্টে আছে তার নির্মাণ অনেকটা তিরিশের দশকের অনুশীলন সমিতির মত। একসময় স্বপ্নভঙ্গ হল। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলাম। ঠিক তখন আমার পরিচয় দীপুদার সঙ্গে। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার প্রচলিত প্রথায় অতিরঞ্জন নয়। এই মানুষটিকে সবসময়েই হাসিমুখ দেখেছি। যেন হতাশ হবার মত কিছুই হয়নি। কুছ পরোয়া নেই! আবার শুরু হবে স্বপ্ননির্মাণ। দীপুদার সম্পাদনায় গুরুগম্ভীর রাজনীতি পত্রিকা ছিল *অনীক*। তখনকার যুগে এত উন্নত মানের আর মর্যাদার পত্রিকা বাংলায় ছিল না। কিউবার তাত্ত্বিক রেজি দ্রেব্রে থেকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লিন পিয়াও, বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদী বিতর্কের নির্যাস থাকত *অনীক*-এ। বোঝা যায় সম্পাদক হিসাবে তিনি কত পরিশ্রম করতেন। যাঁরা মার্কসবাদ নিয়ে গভীর চিন্তা করতেন, নানা মার্কসীয় বিতর্কে অংশ নিতেন, তাঁরা নিয়মিত *অনীক*-এর পাঠক ছিলেন। অনীকের ওপর আর একটি চক্রের গভীর নজরদারি ছিল, সে হল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এর পরে দীপুদার উৎসাহেই পত্রিকায় গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হতে লাগল। 'বিপ্লবের গান' আজও বিক্রি হয়। কিন্তু নিয়মিত ভাল গল্প পাওয়া যায়না, দীপুদা আক্ষেপ করছিলেন। আমি বললাম, পাওয়া যায় না কেন? কত কিছুই তো ঘটে চলেছে রোজ , জীবনে গল্পের উপাদান তো কম নয়! যথারীতি দীপুদার সেই হাসি। নানা কথার শেষে বললেন, 'তুমিই লেখনা অরূপ'। 'আমি?' 'হ্যাঁ, তুমি। লেখ। জীবনের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা যেমন দেখেছ, তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে তুমি সেটাই লিখে ফেল'। সত্যি সত্যি লিখে ফেললাম। 'হারু ডোমের গপ্পো'। কী নামে ছাপা হবে? দীপুদাই নাম ঠিক করে দিলেন। অরূপের 'অ' আর মৈত্রের 'ম' দিয়ে তৈরি হল 'অমল মজুমদার'। তারপর 'অমল মজুমদার' নামে অনীক-এ আরও অনেকগুলো গল্প লিখেছি। পঁচাত্তর সালের মে সংখ্যায় 'নিহতের নাম' নামে একটি পথনাটক প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। দীপংকর চক্রবর্তী গেপ্তার হন। অনেক পরে দীপুদা হো হো করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'তোমার নাটকটার জন্যই বোধহয় আমাকে ওরা অ্যারেস্ট করেছিল, বুঝলে!' নিছক মজাই, কিন্তু এই মজাটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দীপংকর চক্রবর্তীর চরিত্রের গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, মার্কসবাদী চিন্তার অংশীদার হয়েও তাঁর মন ছিল খোলা হাট। সব রকম আনাজেই তাঁর আগ্রহ। বিলিতি টোম্যাটো থেকে দিশি আদা। তিনি খোঁজ রাখতেন অস্তিত্ববাদ থেকে উত্তর আধুনিকতার সর্বশেষ পর্যন্ত। দরজা বন্ধ রেখে নয়। অন্দরমহলে ডেকে এনে ভিন্নমতকে রীতিমত বসার চেয়ারে আপ্যায়ন করে বসিয়ে। এই বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে মার্কসবাদী মহলে এটি ব্যতিক্রমের মধ্যে পরে।

এমনিতে বাংলার মাটি মৌলবাদের পক্ষে কোনদিন মসৃণ ছিল না। দিনের পর দিন নদীবাহিত পলিমাটিতে গড়ে ওঠা ভূখণ্ড কখনো পাহাড় থেকে ভেসে আসা মাটির চরিত্র বিচার করেনি। ভদ্রলোকের নজরে যা নোংরা তাও সাদরে বরণ করে নিয়েছে। এখানে শেষপর্যন্ত তাই সবই মাটি হয়ে যায়। নানা মানুষ এসে এখানে বসবাস শুরু করেছে। মঙ্গোলিয়া থেকে দ্রাবিড়, আলপাইন, আরব, পাঠান, মোগল এমনকি হাবসিও। নদী দিক বদলেছে বারবার, সঙ্গে সঙ্গত করে মানুষও বসতি বদলেছে অনবরত। সংস্কৃত, আরবি, তুর্কি থেকে ইংরেজি ভাষা। সংস্কৃতির মৌলবাদীরা শেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাবা, কাকা, ড্যাড সব বাঙালী হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা হাল ছাড়েনি আজও। তারা কোনভাবেই ভিন্নমত সহ্য করতে পারেনা। পারেনা বলেই ওপারে জামাত জন্মনেয়। এপারে তসলিমা বহিষ্কৃত হয়। কী ভয়াবহভাবে মৌলবাদ এখানে সক্রিয় তা বোঝা যায়, আজও এখানে মুসলমান আর নিম্নবর্ণের মানুষেরা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অলিন্দ থেকে শতহস্ত দূরে। চট করে স্মরণ করার চেষ্টা করুন, জনা দশেক মার্কসবাদী বাঙালী  চিন্তানায়কের নাম। নিম্নবর্ণ, মুসলমান নাম মনে পড়া মুশকিল ।

অথচ চেষ্টা করেও মুসলিম ধর্মের মৌলবাদীরা বাংলায় গোঁড়ামি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। মারফতি থেকে শুরু করে নানা কিসিমের শাখায় নানা রকম চিন্তার জন্ম হয়েছে লালনের বাংলায়। আর সবাই মিলেমিশে সাধনা করে চলেছে আজ আটশো বছর। ব্রাহ্মণ্যধারার ধ্যানধারণা কিছুতেই বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যেগেঁথে দেওয়া যায়নি। বৌদ্ধরা এই মাটিতে হীনযানি হয়ে পড়েছিল। এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে মৌলবাদীরা বারবার এখানে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও মৌলবাদীরা হাল ছাড়তে রাজি নয়। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, মুসলিম সব ধর্মের মৌলবাদীরা চেষ্টা করে গেছে, সারা বাংলাকে একটি মাত্র রঙে রাঙিয়ে ফেলতে, পারেনি।

সবশেষে এসেছে, মার্কসবাদের চর্চার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে, সেই ভয়ংকর ভাবনা। 'আমিই সত্য। আর সব মিথ্যা। কাজেই

এর পর ৭৮ পৃষ্ঠায়

# দীপংকর চক্রবর্তী ঃ স্মরণে ও মননে

মনোহরমৌলি বিশ্বাস

স্মরণ কথাটা দুভাবে মানুষকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। যে মানুষটা বেঁচে ছিল, আমাদের মধ্যেই বেঁচে ছিল, প্রিয়জন হয়ে বেঁচে ছিল, চোখের সামনে দেখতে পেতাম, সুখদুঃখের কথা বলতে পারতাম, অভিভাবকসুলভ প্রজ্ঞা ছিল, সমস্যার কথা বললে পথ বাতলে দিতে পারতেন, চলমান রাজনৈতিক সমস্যার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে প্রাঞ্জল ভাষায় শোনাতেন, চলমান রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে মাসিক 'অনীক' সম্পাদকীয় লিখতেন; যার সম্পাদকীয় পড়ার জন্যে মুখিয়ে থাকতাম— এমন একজন মানুষ দীপংকর চক্রবর্তী ছিলেন। ছিলেন, কিন্তু আজ নেই, ভাবলে অজান্তে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে হয়। ভিতরে কোথায় যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা দানা বেঁধে ওঠে, অন্তর্গহন নাড়িয়ে দেয়।

কোন কিছু হারানোর শূন্যতার মধ্যে যে আবেগ সৃজিত হয় তা মানুষকে খানিকটা অন্ধকারে মধ্যে টেনে নেয়। নৈরাজ্য-মথিত সেই আবেগ, এর ঠিক উল্টো দিকে প্রত্যয়ী আবেগ, যার মধ্যে নিরাশা থাকে না— থাকে নির্মাণের স্বপ্ন — গড়ার অঙ্গীকার— সেই অঙ্গীকার দেবার মানুষ ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। দারিদ্র এবং ক্ষুধায় নিপীড়িত বহুজন মানুষের বেঁচে ওঠার মন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন আজীবন এবং সেই বেঁচে ওঠার নাম এদেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তার সেই হৃদয়-সঞ্জাত অবিচল প্রত্যয় থেকে ক্ষণিকের জন্যে বিচ্ছিন্ন পথে হাঁটেননি তিনি। দীর্ঘকাল, এবং বলা যায় প্রায় পাঁচ দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরে যখন বামপন্থী সরকার গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবাংলায় এবং তার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে বসলেন হঠাৎ করেই— ''সমাজতন্ত্র করছি না'' আমরা— তা এই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষটিকে ব্যথাতুর করেছিল।

এখনও পশ্চিমবাংলায় যে-সব মানুষ সমাজতন্ত্র গড়ার লক্ষ্যে অবিচল আস্থা রেখে কালাতিপাত করছেন, পথ হাঁটছেন এবং সামনেই হাঁটছেন; তাদের মধ্যে দীপংকর চক্রবর্তী সন্দেহাতীত ভাবে অঙ্গীকারের আবেগ-পতাকা উত্তোলন করে ধরেন— পথ দেখান— লক্ষ্যে অবিচল থাকার দৃঢ়তা সঞ্জাত করেন। ''কে তার পশ্চাতে পশ্চাতে/দাঁড়াইল উপচ্ছায়া সম। সাথে সাথে/অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি/আসিয়াছে দীর্ঘপথ মৌনী অনুচরি/রক্ত সিক্ত পদে।'' এই মানুষটির লক্ষ্যের দীপ্ত বাসনা কোনও এক অজানা আবেগ-মন্থনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ ধরে প্রত্যাবর্তিত হতে থাকে। আর সেই সূত্র ধরে ভেসে ওঠে দীপংকর চক্রবর্তীর মাও-পথের এক নৈষ্টিক সাধনা।

জন্মের সিঁড়ি ভাঙা পথে আমি অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ। আইনানুগ ভাবে অস্পৃশ্যতা নেই এদেশের মাটিতে একথা ঠিক, কিন্তু অপাংক্তেয়তাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। বড় হতে হতে হঠাৎ করে ছোট হয়ে যেতে হয় মানুষের কাছে, এ এক নিদারুণ যন্ত্রণা।

এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা খানিকটা বলে ফেলি। অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়াতেন। আমি আমার কর্মজীবনের অনেকখানি প্রান্তসীমায় এসে কোনও এক সময়ে বিএসএনএল-এর ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলায়। তখন মুর্শিদাবাদ জেলাব্যাপী আমার কর্মস্থল। থাকতাম বহরমপুর শহরে। কালচক্রে আলাপ হয়ে যায় *অনীক*-পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক চক্রবর্তীর সাথে। সেই থেকে মাঝে মাঝে কথা হত, দেখাও হয়ে যেত এখানে-ওখানে, কোন না কোনও অনুষ্ঠানে। বলতে দ্বিধা নেই, বহরমপুর পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে— নাটক চর্চার ক্ষেত্রে— সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে।

বহরমপুর 'রবীন্দ্র ভবন' বোধকরি সে চর্চার পীঠস্থান। আমি ১৯৯৪ সাল নাগাদ ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ-কে নিয়ে লেখালেখির কাজটা শুরু করি। মালো সমাজের ওই ঔপন্যাসিকের ক্লাসিক উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। মননে, আবেগে আপ্লুত হয়ে করতাম সে কাজ। দীপংকর চক্রবর্তী-কে তখন দীপংকরদা বলেই ডাকতাম। দীপংকরদা অদ্বৈত মল্লবর্মণকে নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা শুনলেন আমার কাছ থেকে। তারপর অদ্বৈতকে নিয়ে লিখতে বললেন একটি বড় লেখা— একক লেখা নিয়ে 'অনীক'-এর ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবার কথা মাথায় নিয়ে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর থেকে 'অনীক' পত্রিকা প্রকাশের জন্য লেখার অনুরোধ পেয়ে অদ্বৈতকে নিয়ে আরও নিবিষ্ট মনে পড়লাম এবং শুরু করলাম লেখার কাজ এবং যথাসময়ে ৩১-৩২ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তুলে দিলাম সম্পাদকের হাতে।

হিন্দু সমাজের প্রান্তিক হিন্দুদের কৌমতার অন্তর্গঠনের জটিল সমস্যা নিয়ে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিয়ে, অশিক্ষা-নিরক্ষরতা নিয়ে লেখালেখি করা আমার কাজ। ওই মানুষদের মধ্যেও সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা হয় এবং হয় তাদের নিজেদের মত করে। প্রচারমাধ্যমের উপেক্ষা, প্রকাশকদের অনীহা এবং বৃহত্তর পাঠক সমাজের অনাগ্রহের কারণে সেসব থেকে যায় চোখের আড়ালে। দীপংকরদার থেকে আমার

এর পর ৭৭ পৃষ্ঠায়

# মৃত্যুও হার মানে

**কুমার রাণা**

যাওয়াটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। নিজেও জানতেন, নিরন্তর ভালবাসা ও প্রবল স্রোত নিয়ে যে হৃদয়টা সতত ফুটতে থাকত, যে কোনও দিনই সে জবাব দেবে। 'ছুটি চাওয়ার একটা অধিকার তো আমারও আছে!' হাসতে হাসতে তিনি মৃত্যু প্রসঙ্গটাকে তরল করে দিতেন; ততদিনে সমাপ্তির পদধ্বনি শোনা হয়ে গেছে; ছুঁয়ে দেখেছেন জীবনান্তের শীতল দেহ— আর সমানে তার সঙ্গে কুস্তি লড়ে গেছেন। স্বপ্ন অনেকে দেখে, দীপংকরদাও সারাজীবন সযত্নে রক্ষা করে গেছেন বিপ্লবের স্বপ্ন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য, সেই স্বপ্নকে দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে, প্রতি মুহূর্তের বিশ্বাসের সঙ্গে এক করে এগিয়ে চলা। তাঁর মানবাধিকারের সংগ্রামটা তাই হয়ে উঠেছিল মনুষ্যত্বের অধিকার অর্জনের লড়াই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মানুষের সসম্মান বেঁচে থাকার যে বিরামহীন পদযাত্রা, দীপংকরদার কাছে সেটা হয়ে উঠেছিল জীবনের অন্য নাম। সেই দীপংকরদা যখন ছুটি নেন, তখন, আমরা যারা তাঁর স্নেহ, সাহচর্য ও শিক্ষা পেয়েছি, যে স্বাভাবিকতায় তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেন, তাঁর সেই শিক্ষাটা যতই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির দিক নির্দিষ্ট করুক না কেন, আমাদের হৃদয় হয়ে ওঠে অশ্রুর মহাসমুদ্র। বিবেচনা পরাস্ত হয়: হৃদয়াবেগ চিৎকার করে বলে, 'বিশ্বাস করিনা। দীপংকরদা নেই এমনটা হতেই পারে না।'

অন্যান্য অনেক কনিষ্ঠজনের মতোই দীপংকরদার সঙ্গে পরিচয় 'অনীক' মারফৎ। তখন পাটনার বাসিন্দা; ডাকে 'অনীক'-এ একটা লেখা পাঠাই— কয়েকদিনের মধ্যেই একটা পোস্টকার্ড, লেখাটা মনোনীত হওয়ার খবর। তারপর পত্রিকার সৌজন্যসংখ্যা সহ একটা চিঠি: তাড়াতাড়ি লেখা পাঠান। নিয়মিত লেখালেখি করতাম না, সুযোগও ছিল না— সেই সময়টাতে জৈবিক বেঁচে থাকার জন্যই দিনের সকল সময় ব্যয় হত। অনেক দিন পর, তা প্রায় বছর চারেক হবে, একটা চিঠি। পড়ে লজ্জা পাবে না, এমন পাষণ্ড কমই আছে। একটা লেখা পাঠাই; কয়েকদিনের মধ্যে একটা ফোন এল: 'ভীষণ রেগে গেছিলাম। আপনার আচরণটা উদ্ধত মনে হয়েছিল। কিন্তু লেখা পেয়ে আর রাগ করে থাকা যায় না। দয়া করে আরো লিখুন।' মহানন্দ হল। পরে যখন তাঁর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তখন বুঝেছিলাম, ওগুলো ছিল ওনার 'কৌশল'— 'অনীক'-এর পাতায় নতুন মুখ তুলে আনার। লেখার প্রশংসা করে কাঁচা লেখককে উৎসাহ দেওয়া।

মুখোমুখি দেখা ২০০২ সালে, তাঁর খাগড়ার বাড়িতে। দেখা হতেই প্রথম কথা, 'একি, তুমি তো বাচ্চা ছেলে। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়েছিল, বেশ ভারিক্কি বয়সের লোক! কী সব্বোনাশ, এতদিন তোমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে গেছি!

কী অসামান্য উষ্ণতা! মুহূর্তে লোককে আপন করে নিতে এমন ক্ষমতা তাদেরই থাকে যাদের বুকে সারাক্ষণ জ্বলতে থাকে ভালবাসার আগুন। তখন আমি সত্যিই বাচ্চা ছেলে নই— কিন্তু দীপংকরদার সরল যুক্তি, 'তুমি তো ছোট ভাই। ছোট ভাই-রা সর্বদা বাচ্চা ছেলে।'

সেই সাক্ষাতে কিছু ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। 'ফোনে এসব কথা ঠিক বলা যায় না। তোমার বাংলা বানানে কিছু সমস্যা আছে; লেখার পর 'চলন্তিকা' দেখে একটু মিলিয়ে নিও, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।' 'মুমূর্ষু', 'মুহূর্ত'— এই দুটি বানানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। লেখায় অতি যত্নবান হওয়ার সে শিক্ষা কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি জানিনা। কিন্তু পদে পদে তিনি এ জিনিসটা শিখিয়েই চলতেন।

তারপর তাঁর কলকাতা চলে আসা। খুব নিয়মিত না হলেও দেখা হত, টেলিফোনে প্রায়ই কথা হত। খুব তর্কও হত। পরম আশকারা দিতেন— 'তোমরা মেদিনীপুরীরা খুব তক্কো করো। কিন্তু জানো, আমার এতে খুব আনন্দ হয়।'' কীসে যে তাঁর আনন্দ হত না? একবার শুনলাম, দীপংকরদা হাসপাতালে। তার দিন দুয়েকের মধ্যে রাতে ভিআইপি রোডের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাসের জানালা দিয়ে দেখি, বাগুইহাটির মোড়ে দীপংকরদা বক্তৃতা করছেন। নেমে পড়লাম। বক্তৃতা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি না হাসপাতালে ছিলেন?' 'ছিলাম তো; কিন্তু এখন তো নেই।' চোখে উজ্জ্বল দুষ্টুমি, ঠোঁটে সরল হাসি।

সেই মানুষটি আর নেই, সেটা বিশ্বাস করব কেন? সেই মানুষটি আছেন, এটা অবিশ্বাস করব কেন?

মাঝে মাঝেই সেই কণ্ঠস্বরটা শোনা যাবে, তোমার একটু বকুনি প্রাপ্য হয়েছে। শোনা যাবে, চালিয়ে যাও, অনেক কিছু করার আছে। অনেক কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে অবিশ্রাম কাজ করে যাওয়া সে মানুষটা নিজেও জানতেন, সব কাজ শেষ হয় না, কিন্তু যতটা করা যায় সেটা করতে পারার আনন্দ, না করতে পারার বিলাসী আক্ষেপের চেয়ে অনেক জরুরি। কাজের সময়, কাজের ফাঁকে, দীপংকরদার প্রবল উপস্থিতি সরিয়ে দিতে পারে, মৃত্যুর সে সাধ্য নেই। দীপংকরদার কাছে মৃত্যুও হার মানে।

# মানুষটা যাদুকর : জানা ছিল রুমালকে বেড়াল করার যাদু

মালবিকা মিত্র

লেখালিখি আমার কাজ না বলেই জানতাম, ঠিকই জানতাম। তাই কোনোদিন লিখিনি। বলা ভাল ছাপতে দিইনি। তা হল কি, একদিন ক্লাশে ছাত্রদের পড়াচ্ছি ইসলামের আধুনিক সংস্কারে আলিগড়, স্যার সৈয়দ আহমদ, প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ছে ব্রাহ্ম সমাজ, রাজা রামমোহন, উদারনীতি, সংস্কার... আগেও পড়িয়েছি বছর বছর। কিন্তু সেদিন আমার পড়ানো আমার কানেই বেসুরো বাজলো। আসলে ওই সময়ে বুদ্ধর মালয়েশিয়া যাত্রা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, জাপানে ধর্ম বিজয় চলছে। সফর সঙ্গী ছিলেন জয়ন্ত ঘোষাল, প্রতিদিন রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন,পড়ছি। মনমোহন-বুদ্ধ-সংস্কার-উদারীকরণ-রামমোহন -দ্বারকানাথ সব ঘেঁটে গিয়ে একটা লেখা— আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন: চারটি বা একটি গল্প। বন্ধু মোহিত রণদীপ সেটা পড়তে নিয়ে ফেরত দিল না, দিল *অনীক*-এর দীপংকর চক্রবর্তীকে। তারপর দীপংকর চক্রবর্তীর ফোন 'লেখাটা ছাপাবো'। অনীক-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশ হলো।

বিনয় করছি না, সত্যি বলছি, ওটা আমি লিখিনি। ইতিহাসের ঘটনাগুলোর পাশে আমি শুধু আজকের ঘটনা সাজিয়ে পরিবেশন করেছি... বৌদ্ধ সাম্রাজ্য, বৌদ্ধভিক্ষু শিল্প চাইছে... বিনিয়োগ ভিক্ষা। আমাকে কিছু করতে হয়নি। এর সঙ্গেই এলো প্রায় লগ্ন হয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়। সারা দেশ ফুঁসছে। সে সময় ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণের সাথে আজকের ঘটনা পরিবেশন করেছি মাত্র— মানুষ গ্রহণ করার জন্য তৈরিই ছিল। তাই বলছি সে লেখাও আমার কর্ম নয়। তবে হ্যাঁ, ওই মানুষটা ফোনে তাগিদ বা তাগাদা দিয়ে গেছেন, চুক্তি চাষের ওপর একটা লিখুন, জঙ্গলমহলের ওপর লিখুন।

এবার বলবো ফাঁকা টিউব টিপে টিপে টুথপেস্ট বের করার কথা। একটা ফোন— শুনুন, বার্লিন ওয়াল ভাঙার কুড়ি বছর, একটা লেখা চাই... 'পরের সংখ্যায় স্ট্যালিনের মুল্যায়ন- লিখুন'...'সিপাহি বিদ্রোহের দেড়শ বছর'। বোঝাতে চেয়েছি 'এসব ভাবনায় নেই, চেষ্টা করে আমার হয় না..' ওপ্রান্ত থেকে নির্দেশের সুর 'আজ থেকে ভাবুন... ঠিক আছে, সব শেষে আপনার লেখা প্রেসে যাবে... লিখুন।' ভালো লিখিয়েদের কথা আলাদা। কিন্তু আমি লিখি পরিস্থিতি পরিবেশের চাপে, ভেতরে একটা কী করি কী করি অবস্থা, লেখা ছাড়া আর উপায় থাকে না তখন। ফলে দীপুদার নির্দেশে কখনো রাগ হয়েছে, 'মহা বিপদ হল দেখছি!' আবার লেখাটা প্রসবের পর দারুন তৃপ্তিবোধ। বুঝলাম, পত্রিকা সম্পাদক লিখিয়ে নিতে জানেন, জানতে হয়। লেখা তৈরির এই কারিগরকে জানলাম দীপুদাকে দেখে।

ভাগ্যের কী পরিহাস ভাবুন, আমি তখন সিপিআই(এম) দলের জেলা কেন্দ্রে একজন সর্বক্ষণের কর্মী। বাড়িতে 'অনীক' রাখতাম। একটা সংখ্যা কোনোভাবে জেলা দপ্তরে চলে গেল, তখন নিয়মিত লেখা হতো 'ছমিনুল চাচার বঙ্গদর্শন'। নেতারা সমালোচনা করেছিল খুব। পরে যখন আনুষ্ঠানিক বিরোধ শুরু হলো, তখন অভিযোগ এলো 'শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির সাথে সংশ্রব'.... 'উনি *অনীক* পড়েন'। আর আজ, সেই আমি কিনা অনীক পত্রিকার কলমচি! এটা দীপংকরদার জন্য সম্ভব হয়েছে। আমাকে নিয়মিত লিখতে বাধ্য করেছেন।

২০১১র এপ্রিলে আমার বাইপাস সার্জারি হলো। অপারেশন পরবর্তী নানা সমস্যা। দীপুদার বাইপাস সার্জারি হয়েছিল কবছর আগে, সমব্যথী। মাথার ভেতর সব সাদা, শূন্য। কলম নিয়ে বসে থাকতাম, লেখা হতো না। দীপুদা সমস্যা বুঝে তাগাদা দিতেন না, বলতেন, 'লিখতে হবে না, নিয়ম করে লিখতে বসবেন, তাহলেই হবে'। এই সেদিন ফোন করে খোঁজ নিলেন 'কী, লেখা আসছে?' আমি বলেছিলাম 'মনে হচ্ছে ইসাবগুল লাগবে'। কটা কথা হল, বললাম, পরপর কটা খবরের ক্লিপিংস, লিখতে জানলে একটা গল্প হয়ে যেত। এর দিন পাঁচ পর ফোন এলো, 'আপনার গল্পটা কতদূর?' আমি! গল্প! না না, অসম্ভব। দীপুদা বললেন, 'আমিই তো ইসাবগুল, নিন লিখে ফেলুন'। জানেন, গল্পটা শেষ করেছি সদ্য। পাঠানোর সুযোগ পেলাম না। ওটা কোথাও পাঠাবো না, জানেন। বড় আদরের ধন কুসুম রতন, ওটা দীপুদাকে দেওয়া অর্ঘ্য, দীপুদারই নির্মাণ। মানুষটা যা খুশি করতে পারতেন, অনুরোধের সুরে আদেশ। দীপুদাকে একটা এসএমএস করেছিলাম "Whatever comes from 'D.C.Aneek' that is an order to me" আর কেউ ফোনে আদেশ পাঠাবে না, মোবাইলে ভাসবে না Calling: D.C.Aneek। একবারই আমাদের মুখোমুখী সাক্ষাৎ, বাকি সবটা ফোনেই। বহুক্ষণ।

লেখা পছন্দ না হলে দীপুদা স্পষ্ট বলতেন, 'ওটা ছাপাতে পারবো না'। গল্পটা অনীক-এর, পছন্দ না করার, না ছাপাবার অধিকার রইলো।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# ঝড়ের পাখি

পার্থ সারথি

সময়টা ১৯৭৪-৭৫ সাল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে একটা থমথমে ভাব। সারা রাজ্যে বামপন্থী রাজনীতির চর্চা নিষিদ্ধ। সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর জরুরি সন্দেশ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে সদ্য শ্রীঘর ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা হয়েছে। হাতের সামনে কোনো রাজনৈতিক দল নেই, বামপন্থী কার্য্যকলাপের নাম-নিশানটুকু মুছে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। অথচ মনের মধ্যে রাজনীতির আলোড়ন, বামপন্থার বিস্ফোরণ। লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বামপন্থী সাহিত্য গিলছি। সদ্য যৌবনের সেই দিনগুলোতে যে কয়টি পত্রিকা প্রতিবাদের মশাল জ্বেলে রেখেছিল, *অনীক* তাদের অন্যতম। ১৯৭৫ সালে, কোন মাস বলতে পারব না, মনে আছে জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রাক্কালে *অনীক*-এর সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, ''ঝড় আসছে'' এই শিরোনামে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে, এমন কিছু ঘটতে চলেছে যা শাসক শ্রেণীর বহু সাধের স্থিতাবস্থা ভেঙে দিতে পারে, তারই ইঙ্গিত ছিল সেই সম্পাদকীয়তে। জরুরি অবস্থা সত্যি ঝড় বয়ে এনেছিল, যে ঝড় শেষ অবধি জরুরি অবস্থার নায়কদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, দীপংকরদা সেই ঝড়ের সাথী হয়েছিলেন, শুধু পত্রিকায় লেখার জন্য জেলে গিয়েছিলেন তিনি।

জরুরি অবস্থা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতি ওলটপালট করে দিল। ওলটপালট করে দিল বামপন্থীদের সমস্ত ধারার চিন্তা-ভাবনা অনুশীলনকে। ১৯৭৭ সাল একদিকে এদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা একদলীয় রাজনীতির আধিপত্য তথা অনুশাসনকে যেমন জাদুঘরে পাঠিয়ে দিল, অন্যদিকে স্বৈর-শাসনের অবসান ঘটাতে সংসদীয় রাজনীতির হাতিয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজনটাও প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করল। এতদিন সংসদীয় রাজনীতির ব্যবহার নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে যে বিতর্ক ছিল, তা এবার অন্য মাত্রা পেল। একদল বামপন্থী যারা ১৯৭০-৭১ সালেও বিপ্লবের নামে দু'বেলা শপথ নিতেন, শুধু সময় হয়নি বলে নির্বাচনে লড়ার জন্য তাদের এত কসরত করতে হচ্ছে বলে আক্ষেপ করতেন, পশ্চিমবঙ্গ ও আরও দু-একটি রাজ্যে তাঁরা জাঁকিয়ে ক্ষমতায় বসে পড়লেন। আর '৭০-৭১-এ সংসদীয় রাজনীতির প্রশ্নে যারা ঘৃণাভরে মুখ সরিয়ে নিতেন, সেই বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ নির্বাচনী লড়াই-এর দিকে মুখ ফেরালেন, অনেকে ছোট-মেজ-সেজ শাসক দলের প্রতি সমর্থনের হাতও বাড়িয়ে দিলেন। ১৯৬৭ থেকে ২০১৩— বিপ্লব আর সংসদীয় রাজনীতির উথালপাথাল এই দোলাচলে কে না ভেসেছে, কখনও এই প্রান্তে কখনও অন্য প্রান্তে অবস্থান নিতে নিতে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে ৬৭-র আগুনখোর যৌবন। সময়কে হার মানিয়ে যৌবনকে ধরে রাখা যায়, তার প্রমাণ দিতে বেঁচে থেকেছেন কেউ কেউ—দীপংকরদা একদিকে ৬৭-র উত্তাপকে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন, অন্যদিকে নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় স্থিতধী থেকেছেন। ঝড়ের সাথী হয়েছেন, কিন্তু ঝড়ে ভেসে যাননি কখনও। পার্টি-প্রভাবিত পার্টি-শাসিত এই বঙ্গের রাজনীতিতে একটি ছোট পত্রিকাকে হাতিয়ার করে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

'৬৭-৭০ পর্বে নির্বাচন বয়কটের রাজনীতি যখন বিপ্লবী সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, এর বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তোলাও যখন সংশোধনবাদী শিবিরে যোগ দেওয়ার সামিল এক অপরাধ বলে বিপ্লবী শিবিরে পরিগণিত, সেই বিপ্লবী আবেগের জোয়ারের মধ্যেও দীপংকরদা সংসদকে ব্যবহার করার প্রশ্নে নিজ অবস্থানে অটল থেকেছেন। ফলে বিপ্লবী পার্টি করা তাঁর আর হয়ে ওঠেনি। আবার চার দশক পর বামফ্রন্টের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে 'পরিবর্তনের' জোয়ারে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে যখন তৃতীয় শিবিরে দিশেহারা দশা, অনেকে এই শিবির ছেড়ে শাসক বা সংসদীয় বিরোধী শিবিরের কোন একটাতে সামিল হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতে শুরু করেছেন, দীপংকরদা তখনও কট্টরভাবে তৃতীয় একটা বিপ্লবী অবস্থানের জন্য সওয়াল করেছেন। পার্টি-রাজনীতিতে সামিল না হয়েও সংসদীয় রাজনীতির পরিধির বাইরে একটা বিপ্লবী বিকল্প খুঁজে বেড়িয়েছেন সারা জীবন। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পার্টি-তান্ত্রিক সংকীর্ণতা এখানে মুক্ত-চিন্তা মুক্ত-ভাবনার দরজা আটকে রেখে দেয়। পার্টি লাইন পার্টি নেতৃত্বকে রক্ষা করাটা গোটা পার্টির তথা তার নেতা-কর্মীদের পবিত্র কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা হয়। স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত প্রশ্নগুলো পার্টি-নেতৃত্বের কাছে সাধারণত অনভিপ্রেত মস্তিষ্ক-চর্চা বলে প্রতিভাত হয়। নেতৃত্ব নির্বাচনে সাংগঠনিক ক্ষমতাকেই যেহেতু যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি বলে ধরা হয়, তাই সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত নেতারাই পার্টির ওপরের তলায় উঠে আসেন, আর তখন নতুন নতুন ভাবনা বা প্রশ্ন উত্থাপন তাদের বিড়ম্বনা তৈরি করে। তাঁরা সেইসব প্রশ্নকে সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করার পথ নেন। অন্য প্রদেশ থেকে আসা এক বিপ্লবী নেতা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব পাবার পর একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এখানে প্রত্যেকে এক

একেকজন মার্কস, খালি প্রশ্ন করে। এ রাজ্যের সমাজ রাজনীতি যেহেতু জটিল, সেখানে রাজনৈতিক কর্মীরাও বহু জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হন, যার সমাধান পার্টি লাইন থেকে সবসময় পাওয়া যায় না। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাই আলাপ-আলোচনা-বিতর্ক পিছু ছাড়ে না। পার্টির মধ্যে নতুন চিন্তা-ভাবনার চর্চা তথা বিকাশের সুযোগ অবরুদ্ধ দেখে অনেকে পার্টির বাইরে এসে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন। পার্টির নেতা-কর্মীরা তখন তাঁদের চট করে বসে-যাওয়া বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করে দেন, যাতে পার্টির সক্রিয় কর্মীরদের মধ্যে একটা বিরূপতা তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কাজ করেও দীপংকরদা মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, *অনীক* পত্রিকাকে তিনি রাজ্যের বামপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক চালাবার মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে বামপন্থী দলগুলোর সংস্কৃতি হচ্ছে, এক দলের নেতারা অন্য দলের সঙ্গে মতাদর্শগত বিতর্ক চালানোর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন না, এক দলের কর্মীরা অন্য দলের মুখপত্র উল্টেও দেখেন না, সেখানে *অনীক* বোধ হয় একমাত্র বাংলা পত্রিকা যা নানান বিতর্কিত প্রশ্নে বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি-স্থানীয় নেতা বা লেখকদের মত-প্রকাশে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। একদম বিপরীত মেরুর লেখকদের বক্তব্য এক জায়গায় এনে সমাজ-রাজনীতি চর্চার এক দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বামপন্থার আজকের দুর্দিনে, বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিপরীত-যাত্রার এই সময়ে এই আন্দোলনের গর্ভ থেকে সবচেয়ে বড়ো যে প্রশ্ন উঠে এসেছে, মনে হয় তা গণতন্ত্রের প্রশ্ন। বহু মত, বহু স্বরকে ধারণ করা লালন করার প্রশ্ন। শত ফুল বিকশিত হতে দেওয়ার প্রশ্ন। হাজারো চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিরন্তর মানব-মুক্তির পথ খোঁজার প্রশ্ন। দীপংকরদার কর্মজীবনের কেন্দ্রে ছিল *অনীক*, আর *অনীক*-এর কেন্দ্রে ছিল বা আছে এই পথের অন্বেষ। বামপন্থী আন্দোলন আজ যে বদ্ধ জলায় আটকে পড়েছে, সেখান থেকে বেরোতে গেলে এই অন্বেষ পার্টি অন্তর্গত ও বহির্ভূত বাম-মনস্ক জন-সমষ্টির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চারিয়ে কাজটা চালিয়ে যেতে হবে। *অনীক* আগামী দিনেও এই কর্তব্য পালন করে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। *অনীক*-এর মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকবেন দীপংকরদা।

কয়েক মাস আগে অনীক-এর ঘরে বসে 'বিপ্লবের গান' অনুবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দীপংকরদা বলছিলেন, সত্তর দশকে এই চিনা উপন্যাসটি অনুবাদ করার সময় আমি পাগলের মতো ঝড়ের বেগে কাজ করেছিলাম। আমি দীপংকরদাকে অল্পই দেখেছি, চিনেছি আরো কম। কিন্তু মনে হয়েছে, দীপংকরদা ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। সারা জীবন তিনি ঝড়ের মতো কাজ করে গেছেন। প্রায় পাঁচ দশক ধরে একটা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মাসিক পত্রিকাকে নিয়মিত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার রীতিমতো একটা দুরূহ কাজটি তিনি করে গেছেন। শারীরিক সমস্যাকে তুচ্ছ করে রাজনীতি-নিষ্ঠ কর্মীর মতো সারা জীবন কাজ করেছেন। যখনই জিজ্ঞেস করতাম, আপনার শরীর কেমন আছে? উত্তর পেতাম, আমি ঠিক আছি। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও দীপঙ্করদা পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের সাথী হয়ে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী হয়ে বেঁচেছিলেন। নিছক দিনগত পাপক্ষয় নয়, বাঁচার মতো বেঁচেছিলেন। এমনভাবে বাঁচতে পারে কজন?

## পিবিএস-এর স্থপতি দীপংকর চক্রবর্তী

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সেদিন দেখেছিলাম এক অনন্য ভূমিকায়।

তাঁর সম্পাদনায় শেষ বইটি 'আজকের চীন' এ বছর বইমেলায়, ২০১৩-তে প্রকাশিত হল। এই বইটির জন্য দীপুদা অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন যাতে বইটি সুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই বইটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না। এ কষ্ট রাখার জায়গা নেই।

দীপুদার আদর্শে গড়া পিবিএস-এর দায়িত্ব এসে পড়লেও কতটা কী করতে পারব জানি না। পিবিএস-কে নিয়ে দীপুদার অনেক স্বপ্ন ছিল, তাই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে। আজীবন কম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী দীপুদা যে বামপন্থী মতাদর্শে আস্থা রাখতেন, তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যেই তা পরিস্ফুট। তাই তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে— তাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

## দীপংকর চক্রবর্তী ঃ স্মরণে ও মননে

৭৩ পৃষ্ঠার পর

জীবনের একটা বড় পাওনা হলো যে তিনি আমাকে এসব নিয়ে লেখার একটা বড় দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং আমার কষ্টার্জিত সে লেখাটি *অনীক* পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলি, নিরক্ষর পিতা ও প্রপিতামহ সহ আমার সকল পূর্বপুরুষদের পেশা কৃষিকাজ। ভারতে কৃষিবিপ্লবের ভাবনা যারা প্রসারিত করেছিল, নকশালবাড়ি আন্দোলন যারা করেছিল তারা এদেশের শতকরা আশিজন মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। বহুজন মানুষের মুক্তির ভাবনার সাথে দীপংকর চক্রবর্তী সহমত পোষণ করতেন। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে, সেখানকার কলকারখানার শিক্ষিত ও সংগঠিত শ্রমিক-শ্রেণীর সাথে আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের সাযুজ্য খুঁজতে গেলে কোথাও ভাবনায় সংগতিহীনতা লক্ষিত হয়, তা বোধকরি আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যারা দেন তারা কোথাও বুঝতে ভুল করেছেন।

# তাঁর কথা বারবার মনে পড়বে

**বিশ্বজিত সেন**

আমি মনে করি রাজনৈতিক পত্রিকাই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার উপযুক্ত স্থান। হ্যাঁ, অবশ্যই সেই রাজনীতিকে 'আপনার' হতে হবে। আমার এই মতকে হয়ত অনেকেই সমর্থন করবেন না, কিন্তু আমি আমার অবস্থান থেকে সরে আসতে রাজি নই। এই বোধ থেকেই 'অনীক' পত্রিকায় কবিতা পাঠানো আরম্ভ করেছিলাম। সেই সূত্রে দীপংকরবাবুর সাথে পরিচয়। শাব্দিক অর্থেই দীপংকরবাবু আমাকে গড়ে-পিটে নিয়েছিলেন।

'হার্ড টাস্কমাস্টার' বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। যখনই কোন সংখ্যার জন্য কবিতা পাঠাতে বলেছেন—দু'তিনটি পাঠাতে হয়েছে। সিলেকশন কমিটি সেই দু'তিনটি থেকে বাছাই করে নেবে। কখনো তিনটির মধ্যে দুটি নির্বাচিত হয়েছে, কখনো একটিও নয়। কোনদিন এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। আবার কখনো হয়তো একটি কবিতার লাইন পাল্টাতে হয়েছে, কখনো সংযোজন করতে হযেছে। এই ঘষামাজা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, কবিতার আশ্চর্য ভালো বোদ্ধা তিনি। অথচ তিনি কবি গড়েই সন্তুষ্ট। নিজে কবি, বা কবিতা-সমালোচক হিসেবে খ্যাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না।

কিন্তু শুধু কবিতার কথা বলছি কেন, তাঁর মতো শক্তিশালী গদ্যকারই বা আছেন ক'জন? তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলো এ ক্ষেত্রে দিশারী হয়ে আছে। যেহেতু রাজনীতিই তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল, তাই গল্প উপন্যাসের দিকে যাননি। অবশ্য বহুদিন আগে খাদ্য আন্দোলনের পটভূমিকায় পুলিশ ফায়ারিং-এর পর এক ভদ্রলোকের বাড়ি ফেরা কেন্দ্রিক তাঁর একটি গল্প পড়েছিলাম, সম্ভবত 'অনীক'-এই। পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম।

এগুলোও তো একজাতীয় ত্যাগ। দীপংকরবাবু করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর তাবৎ উদ্বেগ, আশংকার কেন্দ্রে ছিল সাধারণ মানুষ। অতএব তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী, অতএব সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন, অতএব 'পরিবর্তনের' প্রতি তিনি সন্দিহান, অতএব 'মাওবাদ' এর সম্পর্কে তাঁর যুক্তিসঙ্গত মতান্তর এবং এই সব কটি পর্ব 'অনীক'-এ নথিভুক্ত। ভবিষ্যতের পাঠক পুরোনো ''অনীক'' হাতড়ে বহু লুপ্ত তথ্য পেয়ে যাবেন, যা কোন আর্কাইভ-এও পাওয়া যাবে না। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি কিন্তু গণতন্ত্রকে কখনও জলাঞ্জলি দেননি। পক্ষের বিপক্ষের, সবরকম মতামতকে জায়গা দিয়েছেন 'অনীক'-এর পাতায়। তাঁর বিশ্বাস ছিল মুষ্টিমেয় কিছু ধুরন্ধর ছাড়া, বাদবাকী সবাই রাজনৈতিক ভ্রান্তির শিকার। এই ভ্রান্তির অপনোদন, দমনপীড়ন দ্বারা ঘটানো যাবে না। তার জন্য নিরন্তর বিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে।

'মুষ্টিমেয় ধুরন্ধর'-রা যখন চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তখন কিন্তু দীপংকর ক্ষমাহীন। নোনাডাঙ্গার বস্তি উচ্ছেদকালীন তাঁর ও 'অনীক'-এ প্রকাশিত অন্যদের লেখাগুলো এ প্রসঙ্গে মনে রাখার মত। খুবই মাপা এবং রুচিসম্মত আক্রমণ চালায় 'অনীক' এবং তাতেই শাসক দল উদোম হয়ে পড়ে। জনমত গড়ে ওঠে নোনাডাঙ্গার বাসিন্দাদের পক্ষে।

সামগ্রিকভাবে বামপন্থী আন্দোলন থেকে যে যুগ অবলুপ্ত হয়ে গেছে, অর্থাৎ আত্মত্যাগ আর সততার যুগ, তাকেও ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, এই বিশ্বাস মজ্জাগত ছিল তাঁর। এই লক্ষ্যেই তিনি পরিচালিত করেছেন 'অনীক'কে, এবছরই যার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হবে। আজ সন ২০১৩-এ আমাদের সামনে তীব্র সংকট। পুঁজিবাদী অর্থতন্ত্রের এই সংকট বাড়বে বই কমবে না। ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যে তাঁর কথা বারবার মনে পড়বে, যখনই আমরা সংকটের মোকাবিলা করতে পথে নামবো।

---

**অধার্মিক দীপুদা!** ৭২ পৃষ্ঠার পর

অন্য সব চিন্তা আমার শত্রু'। মার্কসবাদীরা বারবার চেষ্টা চালিয়েছে সারা বাংলাকে একটি মাত্র রঙে রাঙাতে। গত চৌত্রিশ বছরের ইতিহাসও তাই। কিন্তু বাংলার নদীনালার চরিত্রই হল অস্থিরতা। আজ এই নদী শুকিয়ে যাচ্ছে তো কাল ঐদিকে নতুন করে মরা নদী ভরাট হয়ে উঠছে। ভূপ্রকৃতি রোজ বদলে যায়। বাংলায় মার্কসবাদীদের যত গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যত ভিন্ন ভিন্ন স্কুল অব থট গজিয়েছে, সারা দেশে তার কোন তুলনা নেই। স্টালিনকে নিয়ে, ট্রটস্কিকে নিয়ে, মানবেন্দ্রকে নিয়ে, সৌমেন ঠাকুরকে নিয়ে, নানা গোষ্ঠী। সেই সত্তরের দশক থেকেই মাওবাদীরা নানা উপদলে বিভক্ত। কিন্তু প্রত্যেকটি উপদলই মনে করে তারাই একমাত্র ঠিক। শুধু ঠিক নয়, সঠিক! হয়তো কেউ কেউ কখনো কখনো উপদলগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অধিকাংশ মার্কসবাদীর মাথায় থাকে, তার চিন্তার যথার্থতা। সে চেষ্টা করে তার আদলেই সবাইকে টেনে আনতে। সেখানেই সে মৌলবাদী হয়ে ওঠে। সামান্য কিছু মানুষ অবশ্যই ব্যতিক্রম। দীপংকর চক্রবর্তী ছিলেন একজন অন্যতম ব্যতিক্রম। তিনিই বুঝেছিলেন, মার্কসবাদ ধর্ম নয়। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপের সময়, চিন্তার ভিন্নতা নিয়ে ভয় পেতে হত না। তিনি অন্য ভাবনাকে মর্যাদা দিতেন। তাঁর মৃত্যু বাংলার চিন্তাজগতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করল।

# ব্যক্তির ভূমিকা ও দীপংকরদা

বিশ্বজিৎ রায়

*অনীক* পড়ছি মধ্য সত্তর থেকে। সম্পাদককে জেনেছি অনেক পরে। 'বিপ্লবের গান' পড়ে দীপংকর চক্রবর্তীর নামের সঙ্গে পরিচয়। কোনটা আগে ঘটেছে তা আজ মনে নেই। পোকায় কাটা পুরোনো বইয়ের পাঁজা ঘেঁটে আরেকটা বই পেলাম-- 'চেয়ারম্যান মাওয়ের সঙ্গে লঙ মার্চে'। লেখক চেন চ্যাঙ-ফেং অনুবাদ দীপংকর চক্রবর্তী, প্রকাশক পিপলস বুক সোসাইটি (এজেন্সি), ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ভূমিকায় বলা হয়েছে : বাংলা অনুবাদটি *অনীক* পত্রিকায় ১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরই অনুবাদে আরেকটি বই, সম্ভবত নাম ছিল 'নতুন মানুষ', খুঁজে পেলাম না। বিপ্লবোত্তর চীনে নতুন মানুষ গড়ার স্বপ্ন, পড়েছিলাম স্কুল পর্বে। বুঝি না বুঝি, সোভিয়েত আর চীনা পার্টিকে ঘিরে মতাদর্শগত মহাবিতর্ক নিয়ে *অনীক*-এ প্রকাশিত এবং দীপংকরদার সম্পাদনায় সঙ্কলিত লেখাগুলো পাড়ার পাঠচক্রে অবশ্যপাঠ্য ছিল। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে আগ্রহের সূত্রপাত সেভাবেই। *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ*-এর বেশ কিছু সংখ্যা নিয়মিতভাবে না হলেও সংগ্রহ করেছি সেই পর্বে। মুগ্ধ হয়েছি, প্রেরণা পেয়েছি ক্ষেত্র-সমীক্ষা ভিত্তিক গবেষণাধর্মী কাজে।

সাতান্তরের পর বন্দিমুক্তির মিছিলে বা এপিডিআরের সভায় দূর থেকে দেখেছি এত ধরনের কাজে যুক্ত মানুষটাকে। *অনীক*, *অনুষ্টুপ*, *কালপুরুষ* ইত্যাদি পত্রিকায় বেরোনো গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পড়ে লেখালেখি মকশো করার পর্বে পরিচয় যোগাযোগ হয়েছে। ঘনিষ্ঠভাবে তাকে জানার সুযোগ হয়েছে গত দশক থেকে অনীক-এ লেখার সুবাদে।

কেমন ছিলেন সম্পাদক দীপংকরদা ?

তেঘরিয়ার ফ্ল্যাটে হোক বা সভা-সমিতির ফাঁকে, আমার মতো অর্বাচীনের কথাও মন দিয়ে শুনতেন, তা সে অনীক-এর জন্য লেখার প্রস্তাব হোক বা সমসাময়িক রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক। উৎসাহ দিতেন নতুন ভাবনায়, জায়গা রাখতেন ভিন্ন চিন্তা বা মতের জন্য। মনে পড়ছে ২০০৪/৫ সালে মুম্বাইতে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম থেকে ফিরে সেখানে লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়ন আর নব্য-উদারবাদী বাজার-মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারার প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বৈচিত্র্য নিয়ে লেখার কথা পাড়তেই সোৎসাহে রাজি হয়ে গেলেন। নৈকষ্যকুলীন বিপ্লবীদের মতো ফোরামকে এনজিও-গান্ধীবাদী, নানা কিসিমের সংস্কারবাদী আর সংসদীয় বামেদের সাড়ে বত্রিশ ভাজা বলে নস্যাৎ করেননি। একই সময়ে ফোরাম-মাঠের উল্টোদিকে মাওবাদীদের উদ্যোগে আয়োজিত মুম্বই রেজিস্ট্যান্স নিয়েও খোঁজ নিয়েছেন। আমার লেখায় দুই মঞ্চের মধ্যে বিরোধ আর মেধা পাটকর, অরুন্ধতী রায়দের সমন্বয়-উদ্যোগের প্রসঙ্গ আসায় খুশি হয়েছেন।

বস্তুত মেগা-মিডিয়ার সুরে গলা না মিলিয়েও সাংবাদিক-সুলভ সরেজমিন প্রতিবেদন আর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-বিতর্ককে মেলানোয় আমার চেষ্টাকে উৎসাহ দিতেন বারবার। ফলে আমার পেশাগত জীবনের টানাপড়েন, আশা-হতাশা ভাগ করে নিতে পারতাম কেজো সম্পর্কের বাইরে গিয়ে। ওই যে স্মরণসভায় প্রতুলদা (মুখোপাধ্যায়) বললেন না : রাজনৈতিক নেতাদের মতো শুধু বলবার মুখ নয়, শোনবার কানও ছিল দীপংকরদার, কথাটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে মিলে গেছে। এই প্রসঙ্গে ভোট-পরবর্তী জঙ্গলমহলের হালহকিকত নিয়ে *অনীক*-এ গতবছর ধারাবাহিক রিপোর্ট লেখার কথা মনে পড়ছে। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'পরিবর্তন'-এর প্রশ্নে তৃতীয় ধারার ভিতরে বিভাজন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধারাবাহিকতায় লালগড় আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা, জনসাধারণের কমিটি ও মাওবাদী নেতৃত্বের রাজনীতির ভালোমন্দ, নির্বাচনের আগে মমতা-শিবিরের সঙ্গে মাওবাদীদের সিপিএম-বিরোধী সমীকরণ, রাজনৈতিক খুনোখুনি এবং ভোট-পরবর্তী মাসগুলোয় যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, নয়া শাসক দলের আধিপত্য বিস্তার আটকাতে মাওবাদীদের আরেক দফা খুনোখুনি এবং ছত্রধর মাহাত সহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর ডিগবাজির জেরে শান্তি-আলোচনা ভেস্তে যাওয়া, সবশেষে সরকারি বাহিনীর হাতে কিষেণজির হত্যা— এসব ঘটনাপ্রবাহের পারম্পর্য কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে দীপংকরদার নিজস্ব মতামত ছিল। বিশেষ করে শর্তসাপেক্ষ বন্দীমুক্তি এবং সরকারি রিভিউ কমিটির সদস্য মানবধিকার কর্মীদের অবস্থানের ঘোর সমালোচকদের প্রথম সারিতে ছিলেন তিনি। সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না। কিন্তু আমার লেখায় তিনি কোনও কলম চালাননি। শুধু তাই নয়, মানবাধিকার আন্দোলনে বিভাজনের প্রসঙ্গে মূল রাজনৈতিক বিতর্কটি থেকে সরে গিয়ে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়িতে জড়িয়ে পড়ার জন্য দুই তরফের কুশীলবদেরই সমালোচনাও করি ঐ লেখাটিতে— দীপংকরদা ওই অংশটি বাদ দেওয়া দূরে থাক, তার আপত্তির ইঙ্গিতটুকুও দেননি। তাঁর প্রতিপক্ষের কারও কারও মতো উষ্মা প্রকাশ করেন নি বা ধর্তব্যযোগ্য সমালোচকদের পংক্তিভুক্ত নই বলে নস্যাৎ করে দেননি।

গল্প-কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর সেই মানসিকতা দেখেছি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে লেখা গল্প—'মেয়ে গেছে বনে' ছাপার আগে সামান্য কিছু মাজাঘষা করার পরামর্শ দেন। সবটা আমি মানিনি। সম্পাদকের অধিকার খাটিয়ে তিনি আমার মতো প্রান্তিকতম লেখকের প্রকাশভঙ্গির স্বাধীনতা কেড়ে নেননি। শুধু সম্পাদকীয় উদারতা নয়, *অনীক*-এর বাইরের কাজেও তার সক্রিয় সাহায্য, উৎসাহ পেয়েছি। 'ফ্রন্টিয়ার' সাপ্তাহিককে নতুন করে সাজাতে, নতুন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সাম্প্রতিকতম উদ্যোগে তাকে অংশীদার হিসেবে পেতে চেয়েছি। তিনি সানন্দে সাড়া দেন। ২০১২ সালের বইমেলায় এই উপলক্ষে সুইডিশ লেখক-সাংবাদিক ইয়ান মিরদাল ও মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজনে তাঁর সাহায্যের কথা মনে পড়ছে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর অনলাইন সংস্করণে জঙ্গলমহল নিয়ে বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। *অনীক*-এর পাতায় এই ধরনের বিতর্কের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সব ধরনের মতামতকে দুই মলাটের মধ্যে ধরায় আমার আগ্রহকে উৎসাহ দিতেন। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতটা মাথায় রেখে ইংরেজিতে এধরনের পলেমিক্স-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নানা প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি ছিল *অনীক* প্রকাশনা থেকে একটি ইংরেজি সাময়িকীর ভাবনা। বলতেন, *অনীক* সম্পাদনার পঞ্চাশ পেরোনর পর গবেষণার কাজে হাত দেবেন। নেতাজি নিয়ে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ফিরে দেখা, এহেন নানা বিষয় নিয়ে ইদানীং প্রায়ই কথা হত। এর সঙ্গেই ছিল নানা ইস্যুতে লেখার বরাত। এবছর বইমেলায় অনীকের বিশেষ সংখ্যা ছিল 'আক্রান্ত মানুষ, আক্রান্ত অধিকার' নিয়ে। আদিবাসীদের উপর আক্রমণ নিয়ে লেখাটি প্রায় চেপে ধরে লিখিয়েছিলেন। প্রণবদার কাছে অগোছালো লেখাটা জমা দেওয়ার পর ফোন করতেই হাসিমাখা গলা ভেসে এল— 'খবর পেয়েছি। যাক, শেষ পর্যন্ত দিলে!' এরপরেই পরের লেখা নিয়ে প্রস্তাব। ভাবতেই পারিনি তার পরদিনই দীপংকরদা চলে যাবেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের টেবিলে চিরশয্যায় শায়িত দেখতে হবে। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পাশ ফিরে শোবেন, পরিচিত হাসিটা হেসে বলবেন-- কি, পরের লেখাটা কবে পাচ্ছি?

## দুই

তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তাই মূল্যায়ন করার ধৃষ্টতা দেখাব না। কিন্তু তাঁর স্মরণসভার দিন (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) ভারতসভা হলে উপচে-পড়া ভিড় আর প্রবীণ-অনতিপ্রবীণদের স্মৃতিচারণে আমার নিজের কিছু বিশ্বাস জলহাওয়া পেয়েছে, ডালপালা মেলেছে কিছু বনসাই স্বপ্নও। রতনদা (খাসনবিশ), কাকা (অসীম চট্টোপাধ্যায়), সন্তোষদা (রাণা) প্রমুখের কথায় উঠে এসেছে কীভাবে ষাট দশকের প্রমুখের কথায় উঠে এসেছে কীভাবে ষাট দশকের প্রথমার্ধ থেকে চীনপন্থী এবং তৃতীয় ধারার শরিক হয়েও শেষ পর্যন্ত দীপংকরদা সিপিআই(এমএল)-এ যোগ দেননি। নকশালপন্থী বলে পরিচিত হলেও পার্টির বাইরে থেকে *অনীক*-কে সামনে রেখে বিপ্লবী বামপন্থার পক্ষে থেকেছেন। গ্রহণযোগ্য দল না থাকলে, গোষ্ঠী-রাজনীতির আবর্তে তলিয়ে গিয়ে অ্যামিবাসুলভ অন্তহীন বিভাজনকে সঠিক লাইনের লড়াইজ্ঞানে ভজনার নামে আত্মপ্রবঞ্চনা বা ভাঙন-ঐক্য-ভাঙনের সাপলুডু খেলায় জীবনীশক্তি তিলে তিলে ক্ষইয়ে না ফেলে একজন ব্যক্তি ও পত্রিকা যে একটি রাজনৈতিক ধারা এবং সংক্ষুব্ধ সমকালের প্রতিনিধিমূলক কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারেন, দীপংকরদা ও *অনীক* তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

ধান্দাবাজ বুদ্ধিজীবীদের মতো সুযোগ মতো রঙ বদলাননি। সিদ্ধার্থ রায়ের জমানায় রক্তস্নাত পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে মুখ খোলার মতো লোক পাওয়া দুষ্কর ছিল। সেই সময়ে এপিডিআর-এর জন্মলগ্ন থেকেই অধিকার আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন তিনি। নিজের বিশ্বাসে অবিচল থাকার মূল্য দিয়ে জেলে গিয়েছেন জরুরি অবস্থার সময়। সাতাত্তরের পর সিপিএমের পোঁ ধরেন নি। একই সঙ্গে বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনকালে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে চোখ কান খোলা রেখেছেন। *অনীক* ও মুর্শিদাবাদ বীক্ষণের পাতায় সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং অন্তর্লীন চোরা স্রোত সম্পর্কে তাঁর সজীব আগ্রহ ও বিশ্লেষণী তৎপরতার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। নিজে যত না লিখেছেন, অন্যদের দিয়ে লিখিয়েছেন তার থেকে বেশি। তার মন ও মনন যদি সমকাল নিয়ে প্রশ্নরত না হত, নিজ বিশ্বাস আর অভ্যাসের কোটরে বন্দী অতীতজীবী হয়ে বেঁচে থাকতেন তা হলে সমসাময়িক আরও কিছু পত্রপত্রিকা এবং তাদের সম্পাদকদের মতো রাজনৈতিক ভাবে ফসিল হয়ে যেতেন *অনীক*-সম্পাদক। *অনীক*ও হারিয়ে ফেলত তাঁর প্রাসঙ্গিকতা। রাজপথ-জনপথ থেকে নিজেকে ও *অনীক*-কে বিচ্ছিন্ন করেননি বলেই অমিতদার (অমিতদ্যুতি কুমার) স্মৃতিচারণে শুনি কীভাবে অবরুদ্ধ সিঙ্গুরে গোপনে ঢোকার রাস্তা করে নিয়েছেন দীপংকরদা। ছুটে গিয়েছেন নন্দীগ্রাম থেকে নোনাডাঙ্গা। পালাবদলের আগে-পরে সরকারের দমননীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে শাসকদের রাজনীতির নিক্তি-ওজন নিয়ে বসেননি। এই পর্বে যতবার বলেছি, দেখেছি সিপিএম-শাসনের অবসানের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতা নিয়ে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন কতটা ঘটবে তা নিয়ে প্রবল সন্দিহান ছিলেন। রাজ্যের বাইরে মারুতি থেকে কুড়াঙ্কুলাম, কাশ্মীর থেকে ছত্রিশগড়, মহারাষ্ট্র থেকে মণিপুর, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। *অনীক*-এর পাতায় ধরে রেখেছেন আসমুদ্র হিমাচল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আখরমালা।

তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা শুধু নকশালপন্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। *অনীক*-কে ঘিরে তাঁর পরিচিতি ও

ঘনিষ্ঠতার বৃত্তটা ছড়ানো ছিল। তাঁর ফলে অশোক মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, তরুণ সান্যাল, সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়দের মতো প্রবীণ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিকরাই নন, সুনন্দ দত্তরায়ের মতো ভিন্নধারার সাংবাদিক-কলাম লেখকও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বামফ্রন্টের ছোট শরিক দলগুলোর অনেক নেতার সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। স্মরণসভা-ফেরত আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য্যের কাছে শুনছিলাম, বহরমপুর থাকাকালীন তাঁর দলের প্রয়াত শীর্ষ নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে দীপংকরদার ঘনিষ্ঠতার কথা।

মুর্শিদাবাদ জেলার একদা বামপন্থী, অধুনা দাপুটে এক কংগ্রেস নেতার কাছে যৌবনে দীপঙ্করদার কাছে তাঁর 'ঋণ'-এর কথা শুনেছি। এ থেকে মনে জোর পেলাম রাজনৈতিক-সামাজিক সুবিধাবাদে না ডুবলে, নিজ বিশ্বাসে থিতু থেকেও বৃত্তটাকে বড় করার মানসিকতা থাকলে আখেরে ভিন্নমতের মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। প্রতীতি আর পরমতসহিষ্ণুতা পরস্পরবিরোধী নয়। নমনীয়তা, উদারতা আর সুবিধাবাদ এক নয়।

এই প্রসঙ্গেই তাঁর মৃত্যুর আগে জানুয়ারির গোড়ায় এক সভায় দীপংকরদার কথাগুলো (এই ভাষণটির অনুলিখন এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে) মনে পড়ছে। *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*-তে সুমন্তদার লেখাগুলোর একটি সঙ্কলন 'মার্কসিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান লেফট' (পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা) বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন অশোক মিত্র, গৌতম নভলাখা এবং সুমন্তদা। সভাপতির ভূমিকায় দীপংকরদা। তিন বক্তাই আজকের দেশীয় পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রবল বিরোধ সত্ত্বেও পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা বলছিলেন। কেউ জোর দিলেন দলীয় স্তরে ডায়ালগে, কেউ আবার কর্মী স্তরে।

শ্রীমিত্রমশাই তিরিশ-চল্লিশের দশকে বামপন্থীদের 'ঔদার্য, সহিষ্ণুতা'-র পাশাপাশি 'লোকায়ত সংহতি আর অবামপন্থীদের সঙ্গে পপুলার ফ্রন্ট' গড়ার উদ্যোগ স্মরণ করে আজকের দিনে 'বাম সংহতি'-র কথা বললেন। মাওবাদীদের নিয়ে তাঁর 'অনেক প্রশ্ন' সত্ত্বেও ছত্রিশগড়ে 'মাওবাদী সার্বভৌমত্বের বিস্তার' এবং আদিবাসীদের মধ্যে তাদের মজবুত জনভিত্তি সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস মনোভাব গোপন করেননি। সুমন্তদা তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষের দিনগুলোয় কমিউনিস্টদের মানবিক ভূমিকার কথা মনে রেখে আজকের বাম নৈতিকতার সার্বিক অবক্ষয় আর তার জেরে মধ্যবিত্ত যুবমানসে বামপন্থার প্রতি বিরূপতার প্রসঙ্গ তুললেন। সামগ্রিকভাবে বাম রাজনীতির ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের প্রেক্ষিতে তিনি সকল বামপন্থীদের আত্মসমীক্ষা আর 'পারস্পরিক সহিষ্ণুতা আর নমনীয়তার' প্রশ্নে অশোকবাবুকে সমর্থন জানান। গৌতম অবশ্য নিজেকে মাওবাদী বলে ঘোষণা করে সংসদীয় কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণের তুমুল সমালোচনা করেন। সব বামপন্থী এক ছাতার তলায় আসবেন এমন কষ্টকল্পনায় তাঁর সায় না থাকলেও একই সঙ্গে তিনি বলেন, কোনও বিশেষ দলই একা এগোতে পারবে না। তাঁর কথায়, দলীয় স্তরে সংসদীয় ও বিপ্লবী বামেদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন থাকবে তেমন কর্মীস্তরে বোঝাপড়া এবং আন্দোলনের ঐক্য গড়তে হবে। বৃহত্তর স্বার্থে শত্রু মিত্রের পার্থক্য করতে হবে। এই প্রেক্ষিতেই গৌতম গণতন্ত্রের প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব দেন এবং আজকের দুনিয়ায় 'পার্টি একনায়কতন্ত্রের' বিরুদ্ধে জনমতের কথা মনে করিয়ে দেন।

এই প্রেক্ষিতে দীপঙ্করদার শেষ বক্তব্য আজকের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রশ্নে দারুণ প্রাসঙ্গিক। সুমন্তদার নানা প্রবন্ধে সোভিয়েত ও চীনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নানা প্রশ্নের উল্লেখ করে তিনি সিপিআই(মাওবাদী)-র জেলবন্দী পলিটব্যুরো সদস্য কোবাড গান্ধীর কথা বলেন। 'মেইনস্ট্রিম' সাপ্তাহিকে কোবাডের ধারাবাহিক নিবন্ধের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : ''কোবাড প্রশ্ন তুলেছেন এত আত্মত্যাগী আন্দোলনেও কেন কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা তৈরী হয়?'' আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রবণতার দরুন ক্ষতির ইতিহাস স্মরণ করে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে একাধারে নতজানু মনোভাব এবং ভাঙ্গন-প্রিয়তার সমালোচনা করেন। তাঁর কথায়, ''সিপিআই নেতারা বিয়াল্লিশের জনযুদ্ধ এবং তেলেঙ্গানা নিয়ে স্তালিনকে প্রশ্ন করেননি। মাও নিজের দেশে কমিনটার্ন ও সোভিয়েত পার্টির বিরোধিতা করে নিজস্ব লাইন নিয়েছেন। তাঁর দলে মতবিরোধ থাকলেও দল ভাঙেন নি। আর আমরা শুধু ভেঙেছি। বিভাজনে বিশ্বাস করেছি, ঐক্যে নয়''।

সাম্প্রতিক রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল : ''৩৪ বছরের বাম শাসনে বামপন্থীদের প্রতি জনমানসের শ্রদ্ধা তলানিতে ঠেকলেও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সৃষ্টি নয়। বিদ্রোহী কৃষকরাই তার স্রষ্টা। মুখ্যমন্ত্রী এখন অস্বীকার করলেও জমিরক্ষার লড়াইতে মাওবাদী সহ তৃতীয় ধারা ও অন্যান্য শক্তির ভূমিকা ছিল। তৃণমূল পরে জায়গা দখল করেছে''। এই প্রসঙ্গেই তিনি স্মরণ করিয়ে দেন : ''সারা দেশেই আজ মানুষ দলীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই নিজেরা বহু প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। বামপন্থী বলে যারা নিজেদের দাবি করেন, সকলকেই তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।''

আমরা যারা ভাঙন-সময়ের সন্তান, মুষলপর্বের কুশীলব বা সাক্ষী; ছুঁৎমার্গের বিশুদ্ধতা আর উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহীনতার মধ্যে যাদের দোলাচল; ক্ষুদ্র অহংকার, একাকীত্বের আত্মপ্রবঞ্চনা আর অন্যের কাঁধে চেপে জনসমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় চড়ার আকাঙ্ক্ষার টানাপোড়েনে যারা কাটিয়ে দিলাম বড় দীর্ঘকাল-- তারা কি এখনও ভাবের ঘরে চুরি করব?

দীপংকরদাকে মনে রাখতে চাইলে এর উত্তরটা নিশ্চয়ই আমরা খুঁজব।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# মানবাধিকার আন্দোলনের অনীক

গিয়াসুদ্দিন

মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা এবং *অনীক*-এর সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী চলে গেলেন। *অনীক*-এর সম্পাদক তাঁর জীবনে মানবাধিকার আন্দোলনের জগতে প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন একজন নির্ভীক 'অনীক'। শুধু নির্ভীক সৈনিক নয়, সুদক্ষ সেনাপতিও। পশ্চিমবাংলায় 'এপিডিআর' আর মানবাধিকার আন্দোলন প্রায় সমার্থক। এপিডিআর-এর তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও সেই পদে অধিষ্ঠিত থেকে মানবাধিকার আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

দীপংকরদা একেবারে অকালে চলে গেলেন হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু তিনি যে বড়ো অসময়ে চলে গেলেন তা সন্দেহাতীত। সাড়ে তিন দশকের বামফ্রন্ট জমানার শেষের দশকের অপশাসনে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মমতা ব্যানার্জী 'বদলের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি ক্ষমতায় এখন অধিষ্ঠিত, দু বছরও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু তাঁর সরকার শুরু থেকেই সুশাসনের বদলে অপশাসন দিয়ে চলেছেন। বামফ্রন্ট সরকার যেখানে শেষ করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি যেন ঠিক সেখান থেকেই শুরু করেছেন। মাত্র দু বছর পূর্ণ না হতেই গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। অথচ এই সরকারটা এসেছে গণতান্ত্রিক অধিকার সহ মানবাধিকার ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এই সরকারের পেছনে ব্যাপক মানুষের আস্থা এখনও অটুট, এমন কি এপিডিআর-এর অনেক কর্মী ও সমর্থকও এখনও কিছুটা মোহগ্রস্ত। সংগঠনের একাংশ এই সরকারকে বন্ধু-সরকার বলে ভাবছেন এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে এখনও আন্দোলনে নামতে প্রস্তুত নন। এরূপ পরিস্থিতিতে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন সুদক্ষ নেতৃত্ব। তাই আমার মনে হয় বড় অসময়ে চলে গেলেন দীপংকরদা।

দীপংকর চক্রবর্তী শুধু যে অসময়ে প্রয়াত হয়েছেন তা নয়, তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে ভীষণ অকস্মাৎই। তাঁর মতো মাপের ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ নিশ্চিতভাবেই তৈরি করে দিয়ে যায় একটা বড় শূন্যতা। আর এ প্রয়াণ যখন আকস্মিক ঘটে তখন শূন্যতাটা আরও বড় হয়ে দাঁড়ায়। এপিডিআর ও পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাই স্বভাবতই দীপংকর চক্রবর্তীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে তৈরি হবে একটা বড় শূন্যতা যা পূরণ করা খুব সহজ হবে না। 'অনীক'-এর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আরও অনেক বড় আঘাত। কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলায় লিটল ম্যাগাজিনের জগতে 'অনীক' একটা বিশেষ নাম। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসাবে 'অনীক' সর্বস্তরে মান্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু হাতিয়ারই নয়, 'অনীক' এই আন্দোলনে একজন দক্ষ সংগঠক ও শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করে চলেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। আন্দোলনের কর্মী-সংগঠকদের মুখে যথাসময়ে সময়োপযোগী ভাষা ও বার্তা তুলে দিয়েছে 'অনীক', দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে নিরলসভাবে। লিটল ম্যাগাজিনের জগতে *অনীক*-এর 'অনীক' হয়ে ওঠার পেছনে একটা মস্ত বড় ভূমিকা পালন করেছে দীপংকর চক্রবর্তীর প্রজ্ঞা, মেধা, নিষ্ঠা ও শ্রম। এর ফলে তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণ 'অনীকে'র পরিবারে যে ক্ষত ও শূন্যতা তৈরি করবে তা বোধ হয় কোনদিনই পূরণ হবে না।

মেহনতি মানুষ তথা শোষিত শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রত্যেক মানুষেরই একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। নিঃস্বার্থভাবে এই আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটি যেমন একটি মহান কাজ, তেমনি এই কাজটি করা খুব কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণও বটে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও অত্যাচার-নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, আত্মবিসর্জনও করতে হয়। আন্দোলনকে যেতে হয় কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে। দীপংকর চক্রবর্তী বেছে নিয়েছিলেন এই কঠিন, দুর্গম ও বন্ধুর পথটিই। তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলে খুব সহজেই নির্বাচন করে নিতে পারতেন আন্দোলনের অন্য পথও যেখানে ক্ষমতায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু সে পথে তিনি পা রাখেন নি। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন যে, মুখে এই দলগুলি যাই বলুক না কেন, এরা প্রকৃত মার্কসবাদী নয়, সংসদীয় ক্ষমতা লাভই এদের মূল লক্ষ্য। তাই তিনি তাঁর রাজনৈতিক সততাকে বিসর্জন দিয়ে ওঁদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি। বেছে নিয়েছিলেন সব সময়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথটাই, কারণ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের প্রধান কাজটিই হলো শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে মেহনতি মানুষের আন্দোলনকে দমন করা। রাষ্ট্র তার এই নির্ধারিত কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে গিয়েই সর্বদা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নির্মম ভাবে ঘটিয়ে থাকে। তাই মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলা সর্বদাই জরুরি থাকে, আর এই কাজে যাঁরা ব্যাপৃত থাকে তাঁদেরও সর্বদায় পড়তে হয় রাষ্ট্রের রোষানলে। সেই কঠিন পথটাই নির্বাচন করেছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী।

মানবাধিকার লঙ্ঘন শুধু রাষ্ট্রই করে তা নয়। অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বহু ঘটনা ঘটে মানবাধিকার লঙ্ঘনের। রাষ্ট্রের বাইরে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ব্যাপক মাত্রায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে

থাকে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এরূপ পরিলক্ষিত হয় অধিক পরিমাণে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বৃহত্তর হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে গো বলয়ে এরূপ ঘটনা যেভাবে প্রায়শই ঘটে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তবে মুসলিম সমাজেই ঘটে সবচেয়ে বেশি মাত্রায়। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব ঘটনা বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তবু রাষ্ট্র এসব ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে থাকে শাসক দলের ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও একই সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করতে লজ্জাবোধ ও দ্বিধাবোধ করে না। অন্যান্য অরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকেও কোনো ভূমিকা নিতে তেমন দেখা যায় না। মানবাধিকার সংগঠনগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়, যদিও মানবাধিকার রক্ষা করার জন্যেই তারা দায়বদ্ধ। হিন্দু সমাজে সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুতর তেমন ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে যদিও বা সোচ্চার হতে মাঝে মধ্যে দেখা যায়, মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ থাকে। মুসলিম সমাজে মোল্লাতন্ত্র যে ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নারীদের ওপর যে নৃশংসতা, পৈশাচিকতা ও বর্বরতায় অত্যাচার-নিপীড়ন চালায় তা ভাষায় বর্ণনাতীত। দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে রাজনৈতিক দলগুলি এই অজুহাত খাড়া করে যে ওটা মুসলমানদের নিজস্ব সমস্যা, তার সমাধান তাদের নিজেদেরই করতে হবে। এটা যে (অপ)-যুক্তি তা বলা বাহুল্য। কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলি ঠিক কী কারণে মোল্লাতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ায় না তা আমাদের অজানা ও অবোধগম্য। এটা আমাকে যতটা বিস্মিত করে তার চেয়ে বেশী পীড়িত করে। এক্ষেত্রে দীপংকর চক্রবর্তীকে, সব সময় না হলেও, খানিকটা ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। তসলিমা নাসরিনের উপর মোল্লাতন্ত্রের নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটে চলেছে যুগযুগ ধরে। তাঁকে সেই অত্যাচারের কারণে দু-দশক ধরে নির্বাসনে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হচ্ছে। তাঁর লেখা একটার পর একটা গ্রন্থ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি যেমন তাঁর নিজের দেশে ঘটেছে, তেমনি গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে কথিত পশ্চিমবঙ্গেও ঘটেছে। এত বড় মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনায় মোল্লাতন্ত্রেরই পাশে যেমন থেকেছে সরকার ও রাষ্ট্র এবং সকল রাজনৈতিক দলগুলি, তেমনি মানবাধিকার সংগঠনগুলিও নীরব থেকে কার্যত মোল্লাতন্ত্রের পাশেই থেকেছে। এক্ষেত্রে দীপংকর চক্রবর্তীকে আমরা সরব হতে দেখেছি। মোল্লাতন্ত্রের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তিনি তসলিমার পাশে দাঁড়ানোর দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন।

মোল্লাতন্ত্রই মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতার জন্যে সর্বাধিক দায়ী এবং মোল্লাতন্ত্রই মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। কোরাণ-হাদিসের আইন তথা শরিয়ত আইনের ধারক ও বাহক হলো মোল্লাতন্ত্র। সেই শরিয়তি আইন ও সংস্কৃতি এবং তার ধারক-বাহক মোল্লাতন্ত্রের বেড়া ভেঙে যতদিন না মুসলিম সমাজ বেরিয়ে এসে আধুনিক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আইন-কানুন ও সংস্কৃতির আঙিনায় প্রবেশ করতে পারবে ততদিন তাঁদের কাছে তাঁদের উন্নতি ও বিকাশের স্বপ্ন আকাশকুসুমই থেকে যাবে। মুসলিম সমাজের মধ্যে যখনই যিনি এ কথাগুলি বলেছেন তখনই তাঁর উপর নেমে এসেছে মোল্লাতন্ত্রের খড়্গ। তাঁদের জীবনসংশয় ঘটেছে বারবার। এরূপ ঘটনার শিকার হয়ে কাজী আব্দুল অদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী সহ অনেককেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে প্রাণরক্ষার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়েছিল। অনেককেই প্রাণ দিতে হয়েছে, অনেককে আবার চির নির্বাসনে যেতে হয়েছে। মুসলিম সমাজের ভিতর থেকেও সমাজ সংস্কারের কাজে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। আমি যখন কলম ধরি তখন এই কাজটাকেই লক্ষ্য হিসাবে স্থির করি। স্বভাবতই আমার উপরেও নেমে আসে মোল্লাতন্ত্রের খড়্গ। 'তাহাফফুজে ইসলাম কমিটি' নামে মুসলিম মৌলবাদীরা একটি সংগঠন করে এবং আমাকে মুরতাদ ঘোষণা করে। সেই কমিটি আরও ঘোষণা করে যে, যে আমার শিরচ্ছেদ করবে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনি সাহায্য প্রদান করা হবে। তাই মোল্লাতন্ত্র ও মুসলিম সমাজের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে প্রায় সব কাগজই আমার লেখা প্রকাশ করতে ভয় পায়, ফলে আমার কাজ করার জায়গাটা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক একই কারণে তসলিমা আজ বাংলা প্রকাশনা জগতে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি দীপংকরদার ব্যতিক্রমী ভূমিকা। কী তসলিমার বই প্রকাশের ক্ষেত্রে, কী তাঁর বই উদ্বোধনের ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা পালন করেছেন সামনে থেকে। আমার প্রথম বইটি যখন মহাশ্বেতা দেবী ২০০৮ সালে কলকাতা বইমেলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করলেন তখনও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি এটা জেনেই যে আমার উপর মৌলবাদীদের ফতোয়া রয়েছে। আমার লেখা ছাপতে সকলের যখন প্রবল ভয় অথবা অনাগ্রহ তখন দীপংকরদা আমাকে তাঁর পত্রিকার জন্যে বিশেষ ইস্যুতে দুবার লেখা চেয়েছেন। এবং লেখা ছেপেওছেন। এই কথাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই এখন খুব বেশি করে মনে পড়ছে আমার। মনে পড়াটাই তো স্বাভাবিক। কারণ যে সংগ্রামে আমি পথে নেমেছি সে পথে আমার পাশে দাঁড়াবার মত লোকের বড়ই অভাব। পাশে আমি পেয়েছি মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে, যাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তাই তাঁর মৃত্যু আমার কাছে স্বজন হারানোর মতই। আমি হারালাম আমার সংগ্রামের একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে।

দীপংকর চক্রবর্তী অমর রহে।

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

# ''অনীক তো কোন রাজনৈতিক দল নয়, এটা একটা মঞ্চ''

অরূপ মুখোপাধ্যায়

'অনীক' পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যায় একটি নিবন্ধের মতামত সম্পর্কে প্রশ্ন করায় বলেছিলেন সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী। আমাদের দীপংকরদা— প্রথম যৌবনের শুরু থেকে যে সমাজ বিপ্লবের রামধনুর স্বপ্ন ৫০ বছর যাবৎ যাঁকে কখনো ছেড়ে যায় নি। অর্ধশতাব্দী জুড়ে মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের চর্চার একটি বিদগ্ধ মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন এই মননশীল আপসহীন, অগ্রগণ্য রাজনৈতিক ভাষ্যকার। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে আমৃত্যু পাঁচ দশক ধরে দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অনীক' পত্রিকা এবং অসংখ্য বই সমকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মার্কসবাদ চর্চার অমূল্য তাত্ত্বিক হাতিয়ার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারী শাসনের শুরুতেই একটি বিস্ফোরক সম্পাদকীয় লেখার দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে কলেজে পড়ার সময়ই দীপংকর চক্রবর্তীর কথা প্রথম শুনেছিলাম। কারণ সে সময় বিশ্বভারতীর দু এক অধ্যাপক নিয়মিত 'অনীক' পত্রিকা রাখতেন। তারপর ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত সমর সেনের বিখ্যাত 'বাবু বৃত্তান্তে' জরুরী অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রবন্ধে পড়েছিলাম দীপংকর চক্রবর্তীর কথা। সমর সেন লিখেছেন, ''অনীক পত্রিকার সম্পাদক দীপংকরবাবু গ্রেপ্তার হলেন।... দীপংকরবাবু মাওপন্থী।'' এই কথায় আমার প্রথম যৌবনের সেই উত্তাল সময়ে মনের মধ্যে প্রবল সম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠে। সেই সময় থেকেই দীপংকর চক্রবর্তী এবং তাঁর সম্পাদিত 'অনীক' পত্রিকা সম্পর্কে মনে বিশেষ দুর্বলতা দানা বাঁধে। এটা জেনেছিলাম যে দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অনীক' পত্রিকা মুর্শিদাবাদ জেলার ইন্দ্রপ্রস্থ খাগড়া থেকে প্রকাশিত হয় এবং তিনি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। কিন্তু তখনো ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয়নি।

দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আরো ৩০ বছর পর। কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ না হলেও ততদিনে আমি ১৯৯০ সালে দীপংকর চক্রবর্তী রচিত 'বাংলা রেনেসাঁস এবং রামমোহন', ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'অনীক পঁচিশ বছর স্মারকগ্রন্থ' ১৯৯৩ সালের 'সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম : একটি মাওবাদী রূপরেখা' এবং ২০০৬ সালের সম্পাদিত গ্রন্থ 'বাংলার রেনেসাঁস' পড়ে ফেলেছি। শেষোক্ত গ্রন্থে সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী লিখেছিলেন, ''যিনি বলেছিলেন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর কোনো কিছুই আর আগের মতো রইল না, প্রয়াত সেই সমর সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।''

২০০৫ সালের পর ঘটনাক্রমে অনিবার্যভাবে উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠিত (১৯৬৪ সালে) ঐতিহ্যশালী 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। ২০০৬ সাল থেকে স্বাধীনভাবে এই পত্রিকাকে নতুন চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদকরূপে দায়িত্ব নেবার পর প্রথম আলাপ হয়েছিল দীপংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে। কারণ, ততদিনে আমি বুঝে গেছি, মার্কসবাদী চিন্তাধারায় ইতিহাসের ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে। বিশেষত, চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার অবিসংবাদী রূপকার মাও সেতুঙের ভূমিকা এবং বর্তমানের 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি'র ছাতার তলায় পুঁজিবাদী চীনের পুনরুত্থানের' প্রশ্নে আমি দীপংকরদার মতানুসারী।

এরপর ২০০৭ সালে 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম— 'চীন-যাত্রী উৎপল দত্ত ও মাও সেতুঙ'। নিবন্ধটিতে মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিক উৎপল দত্তের উপর মাও সেতুঙের প্রভাব, ১৯৭৯ সালে উৎপল দত্তের চীন ভ্রমণের বৃত্তান্ত, মাও সেতুঙের দ্বন্দ্বতত্ত্বের দিক-নির্দেশক দর্শন এবং বিপ্লবোত্তর সমাজে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম সম্পর্কে উৎপল দত্তের গবেষণা এবং আজকের চীনের আর্থ-সামাজিক স্বরূপ নির্ধারণের প্রচেষ্টা ছিল। পত্রিকার দুটি সংখ্যা দীপংকরদাকে দেওয়াতে তিনি টেলিফোনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। জানিয়েছিলেন যে 'অনীক'-এর ঘরোয়া বৈঠকে তিনি সবাইকে নিবন্ধটি পড়তে বলেছেন। আমি এতে দারুণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত প্রবন্ধটির বর্তমান চীন প্রসঙ্গে আমি 'অনীক' পত্রিকার ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'আজকের চীন' সংখ্যার কাছে ঋণী।

পরের বছর ২০০৮ সালে 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় উনিশ শতকের অগ্নিগর্ভ শতক, বিদ্রোহ, আলোকপ্রাপ্তি, 'নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন' এবং উৎপল দত্তের এই বিষয়ে কয়েকটি নাটক সম্পর্কে আলোচনা ছিল। দীপংকরদা সম্পাদিত 'বাংলার রেনেসাঁস' গ্রন্থটি থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে ঐতিহাসিক বরুণ দে রচিত 'বাংলার পুনর্জন্ম' প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় ছাপিয়েছিলাম। ২০০৭ সালে 'অনীক' পত্রিকাতে 'সিপাহি বিদ্রোহের ১৫০ বছর' শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই সংখ্যাটিতে ভারতে সামাজিক/অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার অন্যতম পুরোধা

ঐতিহাসিক বরুণ দে-র '১৯৫৭-র ডাক' নামে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার উনিশ শতক বিশেষ সংখ্যাতে পরের বছর আমরা এই ধারাতেই ভারতের অগ্রগণ্য ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ইরফান হাবিবের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী মূল্যায়ন প্রকাশ করেছিলাম। দীপংকরদা এতেও খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন।

১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে বহরমপুরে দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পুনশ্চ' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা জন্মলাভ করেছিল। কালক্রমে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এই পত্রিকাই 'অনীক' নামে নবজীবন লাভ করেছিল। ১৯৬৬ সালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির টালমাটাল প্রেক্ষাপটে তার রাজনৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বলিষ্ঠ ও তীব্র রাজনৈতিক উত্তরণ সত্ত্বেও 'অনীক' কখনোই প্রগতিশীল সংস্কৃতি এবং কালজয়ী সাহিত্যের বিষয়কে উপেক্ষা করে নি। তাই বিভিন্ন সময়ে শতবর্ষে 'অনীকের' শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল — বের্টোল্ট ব্রেখ্ট, সেরগেই আইজেনস্টাইন, ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, কাজী নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, মোহিত মৈত্র, আব্বাসউদ্দিন, দেবব্রত বিশ্বাস, সুধী প্রধান, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখের আলোচনায়। এর মধ্যে ১৯৯৯ সালে 'চলচ্চিত্রের রাজনীতি এবং আইজেনস্টাইন' প্রবন্ধটি দীপংকরদার একটি অনবদ্য উপহার। এখানে উল্লেখ্য, ২০১২ সালে 'অনীক' ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত দীপংকরদার রচিত 'প্রসঙ্গ: হেমাঙ্গ বিশ্বাস' প্রবন্ধটি ২০১২ সালেরই 'এপিক থিয়েটার 'পত্রিকায় পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ঐতিহাসিক বিচারে দীপংকরদা লিখিত এই নিবন্ধটি ছিল যথেষ্ট সুচিন্তিত এবং অবশ্যই নানা মহলে বিতর্কিতও বটে।

এবার একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসি। ২০১০ সালের আগস্ট মাসে দিল্লির 'ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট' থেকে জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা সিরিজে আমার 'উৎপল দত্ত : জীবন ও সৃষ্টি' নামে একটি বই বেরিয়েছিল। দীপংকরদার শরীর তার আগে থেকেই মাঝে মধ্যে খারাপ হয়। চলাফেরা বেশ নিয়ন্ত্রিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওঁকে আমন্ত্রণপত্র দিয়ে বইটি প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ২০১০ সালের আগস্ট মাসে বাংলা আকাডেমির প্রেক্ষাগৃহে দীপংকরদা কিছুটা অসুস্থ শরীর নিয়েও উপস্থিত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমায় বলেছিলেন, "একমাত্র তোমার বই-এর প্রকাশ অনুষ্ঠান বলেই আমি এসেছি, নয়তো এখন তো আর 'অনীক'-এর অফিস ছাড়া কোথাও যাওয়া হয় না।" সেই উষ্ণতা ও আন্তরিকতার স্মৃতি ভোলার নয়।

এরপর দীপংকরদার রঘুনাথপুরের ফ্ল্যাটে গিয়ে দুটি বই দিয়ে এসেছিলাম। পরে শুনেছিলাম যে তিনি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীকে একটি বই পাঠিয়েছিলেন 'অনীক' পত্রিকাতে সমালোচনার জন্য। কিন্তু নানা কাজে যুক্ত এবং প্রধানত নাট্যকলা শিল্পী ও পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী বেশ কিছুটা সময় নেন বইটি আলোচনা করতে। অবশ্য তিনি বইটিকে ভিত্তি করে একটি অনুপম সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন। নিবন্ধটি ২০১১ সালের শেষদিকে 'ভারতে মাওবাদ' বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিভাসদার কাছে পরে শুনেছিলাম, সমালোচনাটি তাড়াতাড়ি দেওয়ার জন্য দীপংকরদা কতবার তাঁকে তাগাদা দেন।

দীপংকরদার কাছে ব্যক্তিগতভাবে উৎপল দত্ত সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম। দীপংকরদার কাছেই শুনেছিলাম যে উৎপল দত্তের সঙ্গে ১৯৬৬/৬৭ সালে ওঁর একাধিকবার দেখা হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। দীপংকরদার কাছেই শুনেছিলাম যে ১৯৬৬ সালে চীনে মাও সেতুঙের নেতৃত্বে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শুরু হলে বহরমপুরে এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে দুই বক্তা ছিলেন যথাক্রমে উৎপল দত্ত ও দীপংকর চক্রবর্তী। দীপংকরদার কাছ থেকেই জানতে পারি যে, অধুনালুপ্ত 'প্রসেনিয়াম' পত্রিকাতে ১৯৬৬ সালে উৎপল লিখেছিলেন 'চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভূমিকা' শীর্ষক রাজনৈতিক আখ্যানটি। পরে সেই প্রবন্ধটি খুঁজে বার করি এবং ২০১১ সালের 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলাম। দীপংকরদার কাছে জানতে পারি যে, সমর সেনের কাছে তিনি শুনেছিলেন যে, 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকাতে উৎপল দত্ত 'রফিকুল ইসলাম' ছাড়াও 'মনিটার' ছদ্মনামে রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখতেন। ২০১১ সালের এপিক থিয়েটার পত্রিকাতে ২০০৫ সালের 'অনীকে' প্রকাশিত দীপংকরদার চিন্তাঋদ্ধ প্রবন্ধ 'চীন কোন পথে' প্রকাশ করেছিলাম। যেখানে তিনি দেখান যে পুঁজিবাদের যাবতীয় বিকার ও ক্লেদ কীভাবে বর্তমান চীনের সমাজ ও অর্থনীতিকে গ্রাস করে বিষাক্ত করেছে। দীপংকরদার ব্যক্তিগত বক্তব্য ছিল, চিন বিপ্লব ও গণচীনের মহানায়ক মাও সেতুঙ সম্পর্কে উৎপল দত্তের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সারাজীবন পাল্টায়নি।

২০১১ সালের 'এপিক থিয়েটার' চীন ও মাও সেতুঙ বিষয়ক ওই সংখ্যাতেই বিশ্ব বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম হিন্টনের 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত মাও সম্পর্কে একটি রচনার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করি। 'On the role of Mao Zedong' শীর্ষক প্রবন্ধটির বাংলা তর্জমা করে দেন অধ্যাপক শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। দীপংকরদা সম্পাদিত জীবনের শেষ গ্রন্থ 'আজকের চীন: একটি মান্থলি রিভিউ সংকলন'-এ ওই নিবন্ধটি 'চীনের ইতিহাসে মাও সেতুঙের ভূমিকা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সংকলনটি

পল সুইজি, জন বেলামি ফস্টার, মার্টিন হার্টল্যানস্বার্গ, পল বার্কেট, রবার্ট ওয়েইল প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের রচনায় সমৃদ্ধ। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মাও সেতুঙের রাজনৈতিক দর্শন, চীনের বিপ্লব ও মাও-উত্তর চীন এবং উৎক্রান্তিমূলক পর্বে শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে দীপংকরদা ছিলেন একজন প্রকৃত বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিত। দীপংকরদা ২০১০ সালে বৃটিশ মার্কসবাদী দার্শনিক জর্জ টমসনের 'From Marx to Mao Tse Tung : A Study in Revolutionary Dialectics' অবলম্বনে 'মার্কস থেকে মাও সেতুঙ' অনুবাদ করেন।

দীপংকরদা সম্পাদনায় ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি' বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত মার্কসবাদী পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক পল সুইজি-র নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন। যাঁরা মার্কসবাদ নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করেন, তাঁদের কাছে পল সুইজির রচনাবলীর এই নির্বাচিত অনুবাদ বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিপূর্বে ২০০৪ সালে 'অনীক' পত্রিকা বিশ্ববরণ্যে অর্থনীতিবিদ পল সুইজির ওপর একটি অমূল্য ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল। 'অনীক' পত্রিকার দীর্ঘ ৫০ বছরের পরিক্রমায় তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় আরো অনেক সহযাত্রী ও সহযোগী ছিলেন ও আছেন। তাই এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, প্রবন্ধ, নথিপত্র নিশ্চয় সংরক্ষণ করা হবে। গত দেড় শতকে 'অনীক' পত্রিকাতে দীপংকরদার নেতৃত্বে বহু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক শিবিরের প্রতিনিধিদের মতামত ও ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সেই আলোচনায় উঠে এসেছে উত্তর আধুনিকতা থেকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, *সেজ* থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিশ্বায়ন থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট এবং বামপন্থী আন্দোলন থেকে সমাজ বিপ্লবের মতো ক্ষুরধার ও সমকালীন বিষয়গুলি।

দীপংকরদার সঙ্গে শেষ দিকে আরো ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। বছর ছয়েক আগে বেশ অসুস্থ হয়ে কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। বাড়ি ফেরার পরে একদিন গিয়েছিলাম। সে সময় 'অনীক' পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তি নিয়ে নানা পরিকল্পনা, সাংগঠনিক কাঠামো, সম্পাদকমন্ডলী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঘটনাক্রমে ২০১৩ সালে 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকারও ৫০ বছর পূর্ণ হবে। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে 'এপিক থিয়েটার' সংকলন সম্পর্কে কিছু পরামর্শও দিয়েছিলেন।

এই বছর ২০ জানুয়ারি, রবিবার সকালে শেষবারের মতো দীপংকরদার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়। তিনি জানিয়েছিলেন যে চীন সম্পর্কে মান্থলি রিভিউ সংকলনটি আসন্ন বইমেলায় পাওয়া যাবে। ২১ তারিখে রাতে একটু কলকাতার বাইরে চলে যাই এবং ২৭ জানুয়ারি ভোরে ফিরে আসি। ২৮ তারিখে সকালে অফিসে গিয়ে খবর পাই যে, দীপংকরদা আমাদের ছেড়ে গেছেন গত রাতে। তিনি আমায় বলেছিলেন, ৫০ বছর পূর্তি হলেই আমি 'অনীক' থেকে অবসর নেবো। তাঁর সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেলো। আমৃত্যু দীপংকর চক্রবর্তী 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদকই রয়ে গেলেন। সমর সেন সম্পর্কে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতায় শ্রদ্ধা জানান। আমার মনে হয় দীপংকর চক্রবর্তী সম্পর্কেও এই কবিতাটি প্রযোজ্য। গুণীজন ও পাঠক সত্যাসত্য বিচার করবেন—

সবাই যখন রাজবাড়িতে
বেচতে গেলেন দাঁতের মাজন
একা তিনি চৌরাস্তায়
দাঁড়িয়ে শোনেন শিবের গাজন।
ঢ্যাম কুড় কুড় ঢ্যাম কুড় কুড়
দূর থেকে সেই বাদ্যি আসে
বাদ্যি ঘিরে নাচছে আগুন
আগুন যে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন।।

---

## দীপংকরদার কথা

৯১ পৃষ্ঠার পর

গত কয়েক দশকে বিপ্লবী রাজনীতি বাংলাদেশের মতো ভারতেও নানা মাত্রায় হোঁচট খেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এক প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস তৈরি করেছে চিন্তা ও সংগঠনের কাজে। নানা কারণে অনেকেই ছিটকে পড়েছেন, পার্টি বসে গেছে, ভেঙে গেছে, আবার অনেক স্পষ্ট অস্পষ্ট নতুন চিন্তাও শুরু হয়েছে। এই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে, কোনো পার্টিতে যুক্ত না থেকেও, বিপ্লবী অঙ্গীকার নিয়ে শুধু এই পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখা যে কত বড় কাজ তা ভবিষ্যৎ আরও স্পষ্ট করে উপলব্ধি করবে।

নিয়মিতভাবে এরকম একটি পত্রিকা প্রকাশ যে কত কঠিন তা আমরা বুঝি। কিন্তু তা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝলেও তাকে বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি আমরা কমই। আরও সেজন্যই এত বছর ধরে নিয়মিত *অনীক*-এর মতো একটি পত্রিকা প্রকাশ আমাদের কাছে সবসময়ই একটি বিস্ময় ছিল। আর তার জন্য দীপংকরদার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা দিনে দিনে শুধুই বেড়েছে।

দীপংকরদার বয়স হয়েছে, শরীর আপত্তি করেছে, কিন্তু মানুষের মুক্তির সংগ্রামের প্রতি তাঁর প্রবল দায়িত্ববোধ তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো থামাতে পারেনি। তিনি আমাদের মধ্যে এখন আর শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই, কিন্তু তাঁর এই প্রবল জীবন আমাদের জন্য সবসময়ের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

# দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে

**বদরুদ্দীন উমর**

মাসিক *অনীক* পত্রিকার সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়েছে ২৭ জানুয়ারি রাতে কলকাতায়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এমন একজন মানুষ পশ্চিমবাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও সেই সঙ্গে রাজনীতির জগৎ থেকে অপসারিত হলেন, যিনি বিগত ৫০ বছর ধরে এসব ক্ষেত্রে সক্রিয় থেকেছেন এবং অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশেও তিনি ছিলেন একজন পরিচিত ব্যক্তি। এখানে তার সম্পাদিত *অনীক* পত্রিকার পাঠকসংখ্যা নগণ্য নয়।

আমার সঙ্গে দীপংকর চক্রবর্তীর পরিচয় ১৯৭২ সালে। সে সময় তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল আমাদের বাসায়। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ৪০ বছর ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর মৃত্যু আমার জন্য এক দুঃখ ও শোকের ব্যাপার।

প্রথম যোগাযোগের সময়ই তিনি আমাকে তার পত্রিকা *অনীক*-এ লেখার জন্য বলেন। প্রথম কবে তাতে লিখেছিলাম মনে নেই। তবে ১৯৭৩ সালে তিনি আমাকে অনুরোধ করেন তাঁর পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর লেখার জন্য। তার আগে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক গোলাম মুর্শেদের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে। সেই সংকলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর আমার একটি ছোট প্রবন্ধ ছিল। সেই প্রবন্ধটি দেখেই দীপংকর চক্রবর্তী আমাকে বিদ্যাসাগরের উপর লেখার জন্য এক চিঠিতে অনুরোধ জানান। আমি তাতে সম্মত হই এবং আমার রচনাটি *অনীক* পত্রিকায় ১৯৭৩ সালের শারদীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৯৭৪ সালের মার্চ সংখ্যায় শেষ হয়। এর পর থেকে আমি মাঝে মাঝেই *অনীক*-এ লিখেছি। তার একটি বই *বাংলার রেনেসাঁ ও রামমোহন* এবং একটি সম্পাদিত সংকলন *বাংলাদেশ প্রসঙ্গে*-র ভূমিকার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করলে আমি ভূমিকা দুটি লিখি।

দীর্ঘদিন ধরে, বলা চলে, পরিচয়ের পর থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। আমি কলকাতায় গিয়ে তাকে খবর দিলে সবসময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। এ সম্পর্কের কারণে তাঁর মৃত্যু আমার জন্য ব্যক্তিগত এক ক্ষতির ব্যাপার। কিন্তু শুধু আমার ব্যক্তিগত ক্ষতিই নয়, এর থেকে বড় ক্ষতি হল পশ্চিমবাংলার মুক্তবুদ্ধি, সৎ সাংবাদিকতা ও সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক তত্ত্বগত চর্চার সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের। সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল বহুমুখী অবদান। এক্ষেত্রেও ক্ষতি সামান্য নয়।

দীপংকর চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৯৪১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায়। তাঁর শৈশব ও বাল্যকালের প্রথম দিকে তাঁরা ছিলেন মুন্সিগঞ্জে, যেখানে তাঁর বাবা সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের পর তাঁর পরিবার চলে যান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। ২০০৩ সালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় আসার আগে পর্যন্ত তিনি বহরমপুরেই থাকেন। ১৯৬৪ সালে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। বহরমপুরে থাকার সময় অল্পবয়স থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানকার বহুবিধ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৪ সালেই তিনি সেখান থেকে 'পুনশ্চ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। 'পুনশ্চ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনও তারা কয়েকজন মিলে গঠন করেন একই সময়ে।

১৯৬৬ সালে তাঁদের পত্রিকার নাম 'পুনশ্চ' পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অনীক'। প্রথমে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও ১৯৭২ সালের জুলাই মাস থেকে 'অনীক' মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তা কার্যকর করতে থাকার সময় দীপংকর চক্রবর্তীকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিনা বিচারে ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত আটক রাখা হয়। সে সময় দুই বছর 'অনীক'-এর প্রকাশ বন্ধ থাকে। তার পর সেই ১৯৭৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একেবারে নিয়মিত ভাবে মাসিক 'অনীক' প্রতি মাসে যথাসময় প্রকাশিত হয়ে আসছে। এটা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। 'অনীকে'র মুদ্রণ সংখ্যাও বড়।

একই সময়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিস্ট রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নির্যাতন জনগণ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর চালিয়ে যেভাবে হত্যা, ধর্ষণ, জোর-জুলুম করছিল তার বিরুদ্ধে আমরা ঢাকায় ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে একটি কনভেনশনের মাধ্যমে গঠন করেছিলাম 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইনি সাহায্য কমিটি'। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে শেখ মুজিব জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর এই সংগঠনের কাজ বন্ধ হয়। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর এপিডিআর-এর কাজ বন্ধ হয়।

এর পর ৯০ পৃষ্ঠায়

# বাংলাদেশের বন্ধুরা আপনাকে মনে রাখবে দীপুদা!

**ওমর তারেক চৌধুরী**

লিটল ম্যাগাজিন 'উল্টো দূরবীণ'-এ প্রকাশিত (মে ২০১০) নিত্যানন্দ ঘোষকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দীপংকরদা তাঁর পত্রিকা প্রকাশের প্রেক্ষাপট নিয়ে বলেছিলেন : ''ভারত-চীন যুদ্ধ-পরবর্তী এমার্জেন্সির দম-বন্ধ করা পটভূমিকায় যখন সমাজ-প্রগতির কথা বলাই কার্যত নিষিদ্ধ, তখন সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেদের কথা বলার আকাঙ্ক্ষায় আমরা বের করতে শুরু করেছি একটি মাসিক পত্রিকা 'পুনশ্চ'— দেড় বছর পরে রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে যার নাম পাল্টে করা হল *অনীক*।'' পাঠক হিসেবে *অনীক*-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অন্য দেশে, অন্য এক 'দম-বন্ধ করা পটভূমিকায়', সেকথা বলার জন্যই উদ্ধৃতিটি দেওয়া।

বাংলাদেশ তখন সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতার উত্তাপ ছাপিয়ে খুব দ্রুত চারদিকে চেপে বসছে একটা দম-বন্ধ করা ও শঙ্কা-তরাসের ছায়া। দমনপীড়ন, রাজনৈতিক হত্যা ইত্যাদি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে চারদিকে। এসবের প্রধানতম শিকার বিভিন্ন দলের বামপন্থী কর্মীরা। যতদূর মনে পড়ে দুয়েকটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো বামপন্থী প্রকাশনা তখন অনুপস্থিত। এমন একটি আবহাওয়ায় ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে আমাদের জেলা শহরে দৈনিক পত্রিকার পরিবেশক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাহিত্যের একমাত্র ছোট দোকানে আবিষ্কার করি 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাসিক পত্রিকা' *অনীক*। সে অবধি আজ ৪০ বছর ধরে *অনীক* বিরামহীনভাবে চিন্তাচেতনা ও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে সতেজ বাতাসের উৎস হয়ে আছে আমার কাছে। এক পর্যায়ে পাঠক থেকে আমার উত্তরণ ঘটেছে দীপুদার স্নেহধন্য *অনীক*-এর বন্ধু হিসেবে। দীপুদা এবং তাঁর সম্পাদিত *অনীক* শুধু আমার মতো সাধারণ পাঠকের বন্ধু নয়, বাংলাদেশে ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে দীপংকরদার রয়েছে বহু মুগ্ধ পাঠক— আদর্শগত বন্ধু-লেখক ও বিভিন্ন পেশার গুণগ্রাহী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এবং দীপুদা নিজেও ভালোভাবে জানতেন যে, এমন একটি 'ছোট' পত্রিকা, একটি বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীর কাছে 'হাউজহোল্ড নেম' হিসেবে আজও টিকে আছে বাংলাদেশে। আজও পুরানো কোন পাঠক যদি *অনীক*-এর নাম শোনেন, তাহলে অবধারিতভাবে তাঁদের কাছ থেকে দুটি কথা বিস্ময়সহ শুনতে হয় তা হলো : '*অনীক* এখনও বের হয়! *অনীক* কিভাবে পাব?' নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সেই '৭৩-৭৪ সালের দিকে হাজার দেড়েক কপি *অনীক* ডাক মারফত বাংলাদেশে আসত এখানকার পরিবেশক 'চলন্তিকা বইঘরে'। প্রতি মাসে প্রায় একই সময় ডাকপিওন সদরঘাট পোস্ট অপিস থেকে বড়-বড় প্যাকেটে *অনীক* নিয়ে উঠে আসত দোতলা দোকানটিতে। এখন বুঝি যে প্রায় একই সময় ঢাকাতে পত্রিকা পৌঁছানোর পেছনে যাদুটি ছিল পত্রিকার সম্পাদকের চরিত্রের নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধে, সম্পাদক হিসেবে পত্রিকাটি নিয়ে সিরিয়াসনেস ও দরদের মধ্যে। ছ' মাসের ব্যবধানে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ও ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হবার পর এখানে *অনীক* আসা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় দীপংকরদার অন্তরীণ হবার কারণে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকা এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক অবস্থা, পত্রিকা আমদানির নিয়মকানুন পরিবর্তনসহ নানা কারণে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এখানে *অনীক* আসা বন্ধ থাকে এবং পরে লভ্যতা অনিয়মিত বা সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু *অনীক* এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা আজও বহাল আছে।

আমার কচি বয়সের চিন্তাচেতনার বিষয়বস্তুর অগ্রগামিতায় সতেজ বাতাসের উৎস হিসাবে *অনীক*-কে বিবেচনা করা প্রসঙ্গে একটু বলা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয় *অনীক*-এ শুধু খ্যাতিমান বিশ্লেষক-কবি-সাহিত্যিক বা তাদের নিজস্ব লেখকরাই লিখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ প্রগতিশীল আন্দোলন, মুক্তি-সংগ্রামী দেশের তাত্ত্বিক লেখা, বিশ্লেষণ, অনূদিত গল্প-কবিতা-নাটক প্রভৃতি ছাপা হতো *অনীক*-এ। লন্ডন থেকে তখন 'ব্রডশিট' নামে একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণধর্মী তাত্ত্বিক নিউজলেটার প্রকাশ করতেন চায়না পলিসি স্টাডি গ্রুপ নামে নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতরা। চলন্তিকা বইঘরে 'ব্রডশিট' পাওয়া গেলেও এর অনেক লেখার বাংলা ভাষান্তর পড়ার সুযোগ হতো *অনীক*-এর কল্যাণে। এছাড়া পল সুইজি ও জোয়ান রবিনসনের মতো অর্থনীতিবিদ, ফেলিক্স গ্রিন ও নেভিল ম্যাক্সওয়েল-এর মতো সাংবাদিক প্রভৃতির লেখা বা 'মান্থলি রিভিউ'-এর মতো পত্রিকার সাথে পরিচয়ের জানালাটি খুলে দিয়েছিলেন দীপুদা।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এঁদের সাথে *অনীক*-এর একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মুর্শিদাবাদের ১ কুলদা রায় লেন থেকে প্রকাশিত *অনীক*-এর সেদিক থেকে একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র ও পরিচিতি ছিল, যা নিয়ে দীপুদার নিজের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক ভাবে পরে উল্লেখ করব।

তাঁর প্রয়াণের সংবাদে ঢাকায় পরিচিত সবাই মর্মাহত হয়েছেন ভীষণভাবে। তাঁর প্রয়াণের পরদিনই এখানকার বাংলা ও ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, দুটি শীর্ষ জাতীয় দৈনিকে দীপংকরদার সম্মানে নিবন্ধ লিখেছেন বদরুদ্দীন উমর ও ফারুক চৌধুরী। একজন সহমর্মী তাঁর প্রতি ভালোবাসা থেকে শোক সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন মান্থলি রিভিউ, ইপিডব্লু, কাউন্টারকারেন্ট সহ আরো অনেক প্রগতিশীল

পত্রপত্রিকাতে। এইসব হচ্ছে *অনীক* সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীর প্রতি বাংলাদেশের বন্ধুদের আত্মিক ও আদর্শগত ঘনিষ্ঠতার নমুনা।

এই আত্মিক ও আদর্শগত নৈকট্য এবং ভালোবাসার সম্পর্কটি গড়ে উঠেচিল গত ৪২ বছর ধরে দীপংকরদার সাংবাদিকতার হাত ধরেই। উনিশশো একাত্তর সাল সম্ভবত *অনীক*-এর ক্ষেত্রে একটি বড়ো বাঁক ঘোরার সময়, তখন কলকাতায় যেমন '৭১, বাংলাদেশেও তেমনি '৭১। আর একটু দূরে শ্রীলংকাতেও যুববিদ্রোহের '৭১। সেদিকেও নজর ছিল *অনীক*-এর। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশে '৭১-এ যেমন ভিন্নতা ছিল, তেমনি আবার তা সংযুক্তও ছিল নানাভাবে। বাঁক ঘোরার ব্যাপারটি সম্পাদকের নিজের জবানিতেই পড়ে শোনা যাবে। *অনীক* এর সঙ্গে পরিচয়ের তিন বছর পরে, ১৯৭৬ সালে, বুঝতে পেরেছিলাম যে *অনীক*-এর বাংলাদেশ বিষয়ক সাংবাদিকতার শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের মে মাসে— 'পূর্ব বাংলা প্রসঙ্গে' বিশেষ সংখ্যাটি দিয়ে। এই বিরল পুরনো সংখ্যাটি হঠাৎ করেই হাতে এসেছিল, তাও ছিল সংখ্যাটির দ্বিতীয় মুদ্রণ! বিকল্প ধারার সাংবাদিকতা বলে যে ঘরানাটি আজ অনেক সুপরিচিত ও শ্লাঘার বিষয়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে *অনীক*-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি। সেই সময় থেকে একাধিকবার নিজে বাংলাদেশে এসে তথ্য সংগ্রহ করে তার রিপোর্ট, নিবন্ধ সহ এখানকার অনেকের রিপোর্ট-বিশ্লেষণ-সাহিত্য নিয়মিত *অনীক*-এ ছেপেছেন তিনি। বাংলাদেশ নিয়ে এবং এখাকার প্রগতিশীল লেখকদের লেখা ছাপার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ সবসময়ই ছিল। অধিকাংশ সময়ই তা পূরণ করতে না-পারা নিয়ে দীপংকরদার আক্ষেপ ছিল। এ নিয়ে নিয়মিত তাগাদা ও অভিযোগ শুনেছি তাঁর কাছ থেকে। পশ্চিম বাংলার বড়-ছোট আর কোন কাগজে বাংলাদেশ নিয়ে নিয়মিতভাবে এত আগ্রহ আর ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। *অনীক*-এর ৪০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত (২০০৭) গ্রন্থমালার দ্বিতীয়টি— 'বাংলাদেশ প্রসঙ্গে'— ছিল বাংলাদেশ বিষয়ে বাছাই করা লেখার একটি মূল্যবান সংকলন, যাতে ১৯৭১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত লেখাগুলো সংকলিত হয়েছে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংকলনভুক্ত করা যায় নি স্থানাভাবে।

১৯৭১ সালকে কেন বাঁক ঘোরা হিসেবে বিবেচনা করছি আর *অনীক*-এর বিকল্প ধারার সাংবাদিকতার বিষয়টি বোঝা যাবে উপরোক্ত সংকলনের মুখবন্ধ থেকে ঃ

> 'পূর্ব বাংলা প্রসঙ্গে' বিশেষ সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন 'অনীক' ছিল প্রায়-অখ্যাত একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সংর্থন, অথচ মুক্তিযুদ্ধের আড়ালে চলমান সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নির্মম সমালোচনামূলক ওই সংখ্যাটির ব্যতিক্রমী অবস্থান প্রচণ্ড এক বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। সেই সংখ্যাটি প্রকাশের মাত্র সাত দিনের মধ্যে সব কপি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, ওই সংখ্যার একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছিল। সংখ্যাটির জন্য 'অনীক' পেয়েছিল অবিমিশ্র গালাগালি ও নিন্দা, এবং পরে অভিনন্দন ও স্বীকৃতি। তার ফলশ্রুতিতে 'অনীক' এই প্রথম পেয়েছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি, এক বছরের মধ্যে তার উত্তরণ ঘটেছিল মাসিক পত্রিকায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা ভারতবর্ষের (এমনকী হয়তো তাবৎ পৃথিবীর) সকল পত্রপত্রিকা আর প্রচারের চশমা দিয়ে না দেখে 'অনীক' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত অনালোকিত ও অনালোচিত দিকগুলো হাজির করে ভিন্নধারার সাংবাদিকতাকে তুলে ধরেছিল। তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়েছিল, এখানকার মানুষদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর রাজনৈতিক আন্দোলনের বামপন্থী ধারার কাগজপত্রের সাথে পরিচিতির সুবাদে, যেগুলো তিনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোক্ষমভাবে ব্যবহার করেছিলেন। এই মোক্ষম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি এমনকী 'দেশ' পত্রিকায় চোখ খুলে দেবার মতো তথ্য ব্যবহার করার সুযোগও ছাড়েননি— নবারুণ গুপ্তর নিবন্ধ (১.৫.৭১) এবং ২৫ মার্চ ফরাসি পত্রিকা লা মঁদকে দেওয়া শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকারের একটি উদ্ধৃতি।

আগেই বলেছি, সেই সময় বাংলাদেশ বিষয়ে লেখা-প্রতিবেদন ছাপার জন্য তিনি সবসময় পরোক্ষ সূত্রের উপর নির্ভর করেননি। যাতায়াতের পথে উভয় দেশের কর্তৃপক্ষের হাতে হয়রানি হওয়া সত্ত্বেও উনিশশো বাহাত্তর সালে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন বাংলাদেশে। মূলধারার কাগজপত্রে যেসব বিষয়ে আলোকপাত হতো না, সেগুলোই তিনি তুলে ধরেছিলেন সেই যাত্রা এবং পরে ১৯৭৪ সালে করা রিপোর্টগুলোতে। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী মস্কোপন্থী দুটি বাম দল ছাড়া অন্য সকল দলের নেতাদের সাথে কথা বলে বুঝতে চেয়েছিলেন নতুন বাংলাদেশকে। অন্যরা যেদিকে নজর দেয়নি বা যেসব কথা তুলে ধরে নি, সেদিকে আলোকপাত করার কারণে সাংবাদিকতা ও ঐতিহাসিকতার দিক থেকে তাঁর এসব রিপোর্টকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। একই কথা প্রযোজ্য তাঁর পরবর্তী সফরভিত্তিক (১৯৮২, ১৯৯০, ২০০৬) রিপোর্টগুলোর ক্ষেত্রেও। উনিশশো একাত্তর সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি বড় বাঁক পরিবর্তন ধরা পড়বে 'অনীক'-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় বা বিশেষ প্রতিবেদনগুলোতে। বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর এই আগ্রহ যেমন ছিল প্রতিবেশী দেশের জনগণ, তাদের দীর্ঘ চলমান রাজনৈতিক সংগ্রাম, এখানকার সাংস্কৃতিক ধারার প্রতি একজন রাজনীতি-সচেতন সম্পাদকের আগ্রহ, অনুমান করি ততটাই হয়তো ছিল প্রায়-ছয় বছর বয়সে পেছনে ফেলে যাওয়া জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা উৎসারিত।

বাংলাদেশের হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল না— সংবাদপত্র, লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, নাট্য ও কাব্যচর্চা, আন্দোলন, এনজিও, নানা ধরনের সঙ্গীত ও সঙ্গীতশিল্পী (নজরুলগীতি শিল্পী মুশতারি ভগ্নীত্রয় বা ফাতেমা-তুজ-জোহরা থেকে একেবারে হালফিলের আনুশেহ আনাদিল পর্যন্ত), বাংলা একাডেমীসহ সকল ধরনের প্রকাশন ও বই, জাহানারা ইমাম ও তাঁর সূচিত আন্দোলন— কোনো কিছুই বাদ ছিল না তাঁর নজর থেকে। 'বিচিত্রা', 'হলিডে', 'সংস্কৃতি' প্রভৃতি পত্রিকা আর তার সম্পাদকদের সঙ্গে ছিল দীপুদার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ২০০৬ সাল থেকে নিয়মিত পড়তেন সিরাজুর ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত 'নতুন দিগন্ত'। এখানকার ভালো কিছু নিতে তাঁর কখনো কোনো কুণ্ঠা দেখিনি। মাও সেতুঙ-এর প্রয়াণের পর শাহরিয়ার কবীর একটি চমৎকার জীবনী লিখেছিলেন তাঁর। একই ধরনের বই তিনি নিজে বা কলকাতার কেউ-ও হয়ত লিখতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা না করে অনেক আগ্রহ ভরে শাহরিয়ার কবীরের বইটি পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ করার উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন তাঁদের প্রকাশনা সংস্থা থেকে।

আর দুটি কথা উল্লেখ করে ইতি টানা যেতে পারে। তাঁর আগ্রহের এই দীর্ঘ তালিকা জুড়ে ছিল ভাষা আন্দোলন। তাঁর কথায় : এপার বাংলার বাঙালি হিসেবে একুশের চেতনা আমাদের কাছেও গৌরবময় ও স্মরণীয়। সে চিন্তারই ফসল হিসেবে দেখা যাবে ভাষা আন্দোলনের ৫০ বর্ষপূর্তিতে তাঁর সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন নিয়ে উভয় বাংলায় প্রকাশিত কবিতা ও গানের সংকলনটিতে— 'একুশের কবিতা ও গান'। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মস্থল মুর্শিদাবাদে ১৯৯১ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত এবং তাকে কেন্দ্র করে নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালন হয়ে আসছে আজ অবধি। এই আন্দোলনের সাথেও তিনি শুধু জড়িতই ছিলেন না, মাঝে কিছুটা স্তিমিত অবস্থা এলে এ উদ্যোগে তিনি নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন।

বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও টান ছিল লক্ষণীয়। ২০০৬ সালের শেষ সফরের পর গত কয় বছর থেকে একটি 'শেষ সফর' দেবার ইচ্ছা ছিল ব্যাকুলভাবে। বছর দু' আগে একবার পরিকল্পনা করে কামিয়াব হননি। এবার ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা আসবেন বলে খুব উঠে-পড়ে চেষ্টা করেছিলেন। শরীরের উপর আস্থা রাখতে না-পারা আর কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে 'অনীক' এর বিশেষ সংখ্যা ও প্রকাশিত বই 'আজকের চীন' নিয়ে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও ঢাকা আসার ক্ষীণ আশাটি চিন্তায় রেখেছিলেন মৃত্যুর সাতদিন আগে পর্যন্ত। জন্মভূমি দেখতে আসার তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়া খুবই দুঃখজনক।

১৯৮২ সালে তিনি যখন ঢাকা এসেছিলেন তখন শারীরিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত শক্তিসমর্থ, তখনো হৃদরোগ হয়নি, তাই চারমিনার ছিল তাঁর সঙ্গী। এখানে-ওখানে যেতে প্রচুর হেঁটেছেন ঢাকার রাস্তায়। প্রতুল মুখোপাধ্যায় তখনো ক্যাসেট-সিডির দৌলতে বাংলাদেশে কোনো পরিচিত নাম নয়, ভারতেও জনসমক্ষে হয়তো এত প্রচারিত হয়ে ওঠেনি। মনে আছে, তোপখানার রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে দীপুদা গেয়েছিলেন (হ্যাঁ, তিনি এমনই প্রাণবন্ত ছিলেন সবসময়)— 'কীসের ভয়! কীসের ভয়! সাহসী মন লালফৌজের। লাফিয়ে হই পার...'। দীপুদার প্রয়াণে তাঁর পত্রিকা 'অনীক' সাহসে ভর করে লাফিয়ে আরো অনেক দূর পার হবে সাহসী মন লালফৌজের মতো, আমরা এই প্রত্যাশাই করি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসায়। বাংলাদেশের বন্ধুরা আপনাকে মনে রাখবে দীপুদা!

---

## দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে

৮৭ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে মাও সেতুঙের নেতৃত্বে চীনা পার্টির বিতর্ক শুরু হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয় এবং সিপিআই ভেঙে গঠিত হয় সিপিআই(এম)। দীপংকর চক্রবর্তী সেই সময় সিপিআই(এম)-এ যোগ না দিলেও তার সমর্থক হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সিপিএম-এর সুবিধাবাদ ও নানা বিচ্যুতির কারণে তা ভেঙে চীনা পার্টির তাত্ত্বিক লাইনে গঠিত হয় সিপিআই(এমএল)। প্রথমে তিনি সিপিআই(এমএল)-এর সমর্থক হলেও তাতে যোগদান করেন নি, কারণ তিনি তাদের গণ-আন্দোলন, গণ-সংগঠন বর্জন ও খতমের লাইনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সাধারণভাবে ছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারার অনুসারী। এই অবস্থান থেকেই তিনি প্রকাশ করতে থাকেন তার সম্পাদিত মাসিকপত্র 'অনীক'।

বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী, লেখক সাহিত্যিক ও পত্রপত্রিকার কোন প্রকৃত আগ্রহ বিশেষ দেখা যায় না। এদিক দিয়ে দীপংকর চক্রবর্তী একজন ব্যতিক্রম ছিলেন। বাংলাদেশে কী ঘটছে এ বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল এবং এমন কি এখানকার প্রগতিশীল লেখক-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাদের অনেকের লেখাই 'অনীকে' প্রকাশিত হতো। 'বাংলাদেশ প্রসঙ্গে' নামে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর তিনি একট সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নাটক রচনা এবং অনুবাদের কাজও করেছিলেন, অনেক বিষয়ে রচনা সংকলিত করেছিলেন। এসবই প্রকাশিত হতো তার প্রতিষ্ঠিত 'পিপলস বুক এজেন্সি'-এর দ্বারা। তার এসব প্রকাশনার পাঠক বাংলাদেশেও কম নেই। এ দেশে দীপংকর চক্রবর্তী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, লেখক ও পাঠকদের কাছে এক পরিচিত ও প্রিয় নাম। তার কথা এ দেশের মানুষ দীর্ঘদিন স্মরণ রাখবে।

# দীপংকরদার কথা

আনু মুহাম্মদ

দীপংকরদার সাথে আমার প্রথম দেখা ঢাকার একুশে বইমেলায়, সম্ভবত ১৯৮৩ বা '৮৪ সালে। আমি তখন বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত 'সংস্কৃতি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। আমরা সেসময় 'সংস্কৃতি প্রকাশনী' থেকে একুশে বইমেলায় স্টল নি। সেই স্টলের সামনেই উমর ভাই আমাকে দীপংকরদার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনে আছে, সেখানে আমরা অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম।

তারপর আরও বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। কলকাতার বাইরে থাকতেন বলে কলকাতায় গেলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করা কঠিন ছিল, উদ্যোগ নিয়েছি তবুও। অন্তত টেলিফোনে কথা হয়েছেই। কলকাতায় তিনি বাস শুরু করবার পর যখনই কলকাতা গেছি তাঁর সাথে দেখা করা ছিল ফরজ। শাশ্বতী-অনিন্দ্যের বাসাতেও দেখা হয়েছে একাধিকার। ঢাকায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো একুশের বইমেলায়। ঢাকায় গীতিয়ারা ওমর তারেকের বাসাতেই সর্বশেষ দেখা হয়, কয়েক বছর আগে। কলকাতায় সর্বশেষ দেখা হয়েছে গত বছর মার্চ মাসে। এবার আমার মনে হয়েছিল আর যদি দেখা না হয়, দেখা করতেই হবে। সময় বের করা কঠিন বলে বেশ রাতে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। এরপর অসুস্থ অবস্থাতেই অনীক অফিসে আড্ডায় ডেকেছিলেন। সেই আড্ডাতেই শেষ দেখা। তিনি যথারীতি লেখার তাগিদ দিয়েছিলেন, *অনীক* নিয়ে সামনের অনেক পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে শুভাশিস, সুমিতা আর রতনদাসহ তাঁর সহযোদ্ধারা এই পরিকল্পনার পথেই হাঁটবেন, *অনীক* কখনো থামবে না।

দীপংকর চক্রবর্তীর সাথে পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্পাদিত *অনীক* পত্রিকার কথা জানি। ঢাকায় এই পত্রিকার কিছু কপি হয়ত হাতে হাতে আসতো, সব সংখ্যা না দেখলেও কিছু সংখ্যা দেখেছি, আগ্রহ বোধ করেছি। স্কুল পার হতে হতে, আগ্রহের জায়গা বদলে আমি যখন নানাদেশের সমাজবিপ্লব নিয়ে বই-পত্রপত্রিকা খুঁজি, বুঝতে চেষ্টা করি, তখনই *অনীক*-এর দেখা পাই। পরিচয় এবং একরকম স্থায়ী সম্পর্ক। সেই পত্রিকার সম্পাদক দীপংকরদার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে তখন আমি বিপ্লবী রাজনীতির একটি ধারার সঙ্গে সক্রিয়ভাবেই যুক্ত। মনে আছে, প্রথম পরিচয়ের দিন *অনীক* পত্রিকা যাতে বাংলাদেশে নিয়মিত আসে তার ব্যবস্থা করবার নানা দিক নিয়েও আমরা কথা বলেছিলাম।

এই পরিস্থিতি আমরা সবসময়েই দেখি যে, বাংলাদেশের বাজার ভারতের আইনি-বেআইনি পণ্যে ভর্তি। রাস্তায় ভারতের গাড়ি, ঘরে ঘরে ভারতের সব টিভি চ্যানেল। কিন্তু কিছু বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা ছাড়া প্রয়োজনীয় বই পত্র-পত্রিকা এখানে আনার ব্যাপারে বহু জটিলতা। এমনকি চিঠিপত্র আদান প্রদানও খুবই সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। কয়েক বছর আগে সৌমিত্র তাই যখন একবার সীমান্তে যোগাযোগ কেন্দ্র করবার কথা বলেছিলেন তা তখন আমার খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল।

বাংলাদেশের মতো ভারত রাষ্ট্রও তার দেশের মানুষকে নানাভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল প্রায় সামরিক শাসনে চলছে। কিন্তু ভারতের মুক্তিকামী নারীপুরুষ ঠিকই নানাস্থানে লড়াই করছেন। রক্তক্ষয়ী লড়াইয়েরও জন্ম হচ্ছে। ভারতের এত এত টিভি চ্যানেল, কিন্তু এসব লড়াই, মানুষের ভিন্ন চিন্তার খবর সেগুলোতে পাওয়া যায় না। যেসব পত্রিকা এসব চিন্তা ও খবরের উপর গুরুত্ব দেয়, সেগুলো আবার এদেশে পাওয়া কঠিন। বাংলাভাষায় *অনীক* সেই জনগণের জীবন ও লড়াইয়ের ভাষ্য উপস্থিত করে আমাদের সামনে। সেজন্য এই পত্রিকা এই দেশের মানুষের লড়াইয়ের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের তিনদিকে কাঁটাতার দিয়ে দুই দেশের শাসকদের মধ্যে বন্ধুত্বের নতুন দিগন্ত খুলে পুরো দেশে ভারতের বৃহৎ পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধির আয়োজন চলছে। পাশাপাশি দুই দেশের শাসকরাই দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধির পথে সবরকম বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে সবসময় সক্রিয়। গণতান্ত্রিক শক্তির মতো চিন্তার যোগাযোগ যাতে যতটা সম্ভব কম থাকে নানাভাবে সেই চেষ্টা আছে বরাবার। বাংলাদেশ ভারতের যতটা ভারতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রাম ও চিন্তাভাবনার খবর আরও কম।

ভারতের প্রধান প্রচারমাধ্যম বাংলাদেশকে 'মৌলবাদ আক্রান্ত একটি দেশ' হিসেবে উপস্থাপন করতে যতটা আগ্রহী, এদেশের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও শোষণ-আধিপত্য থেকে মুক্তির লড়াইয়ের খবর দিতে ততটাই অনাগ্রহী। এসব নিয়ে দীপংকরদার সাথে আমাদের অনেক কথা হয়েছে, আমরা এই অচলায়তন ভাঙার জন্য করণীয় নিয়ে অনেক কথা বলেছি। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভারতের অনীক পত্রিকার পাঠকদের বাংলাদেশের চিন্তা ও লড়াইয়ের খবর পৌঁছে দিতে চাইতেন। সেজন্য লেখার বিষয়ে বরাবর চাপ দিতেন।

এর পর ৮৬ পৃষ্ঠায়

**স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী**

# আমার আজীবন বন্ধু— মরণের পরেও প্রেরণা

**মীরা চক্রবর্তী**

আমার বয়স যখন আট তখন আমার বড়দার বিয়ে হয় বহরমপুর শহরের 'বৌদি'র সাথে। বৌদির ভাই ন' বছরের দীপুর সাথে আলাপ হয় তখনই। পরের বছর, ১৯৫১ সালে প্রথম নির্বাচনের সময় বহরমপুরে আমার দিদিমার বাড়িতে এসে থাকি প্রায় দু মাস। আজন্ম কলকাতার বেলেঘাটায় বাস আমার, বহরমপুর শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গা, দুপাশে গাছের সারি, পাখির ডাক প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। দীপু, আমি আর দীপুর ছোট বোন মিনু রোজ বিকেলে বেড়াতাম গঙ্গার ধারে। সেখানে কোকিলের ডাক নকল করে ডাকাডাকি ছিল একটা মজার খেলা। একদিন আমরা বেলগাছে ঢিল ছুঁড়ছিলাম, ঢিলটা গিয়ে পড়েছিল গাছের পেছনদিকে একটা কুঁড়েঘরের চালে। ফেরার পথে দীপুদের বাড়িতে গিয়ে দেখি ওরা বৌদির কাছে নালিশ জানাতে এসেছে। পেছনে তাকিয়ে দেখি আমি একা। বৌদি কিন্তু কিছুই বলেনি আমাকে, বাড়ি ফেরার পর নীলডাউন হতে হয় দীপুকেই। প্রবল ভেংচি কেটেছিলাম আমি আর মিনু, এখনো মনে আছে দীপুর অভিমানভরা রাগত চোখ...।

দীপু আইএসসি পাশ করে কলকাতায় পড়তে এল। থাকত হস্টেলে। ঝকঝকে চোখ, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এক তরুণ, দিদির বাড়িতে প্রায়ই আসত। আমরা খেলা করতাম, কবিতার কাটাকুটি খেলতাম। সেই কাটাকুটির খাতা দেখে আমার মা একবার অন্যরকম ভাবায় জোরগলায় মাকে বলেছিলাম যে আমরা বন্ধুই— অন্যরকম হবেনা কখনো। সেই কথা শেষ পর্যন্ত আর রাখা যায় নি! আমাকে বেশ কয়েকটা বাংলা ও ইংরাজি রচনা লিখে দিয়েছিল, সেগুলো ঝাড়া মুখস্ত করে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত চালিয়েছিলাম। দীপুর টিউশনি দরকার ছিল, আমার বন্ধু প্রতিমাকে ঠিক করে দিয়েছিলাম। খুব শিগগিরই প্রতিমা একদিন এসে কেঁদে পড়ল— ও সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেছে দীপুর, কিন্তু দীপু বলেছে তা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে দীপুর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার আগেই ওর কাছ থেকে এল এক দীর্ঘ প্রেমপত্র। অপ্রত্যাশিত! তার আগেও ভাবিও নি এভাবে। কিন্তু ঐ চৌম্বক ব্যক্তিত্ব এড়িয়ে যাওয়ার উপায়-ই ছিল না। শুরু হলো একসঙ্গে পথ চলা। আমি ষোলো, দীপু সতেরো।

ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে বামপন্থী আবহাওয়া ছিল দাদার সুবাদে। দাদা আরএসপি করতেন। দেবব্রত ব্যানার্জী দাদার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু বামপন্থী পড়াশোনা বেশি করা হয় নি। দীপু আমায় বই পড়তে দিত। ১৯৬১ সালে ও এমএ পড়তে ভর্তি হলো। আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু দীপুর সংস্পর্শে এসে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা শুরু করায় অর্থনীতি নিয়ে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজ যাওয়া-আসার সময় নিয়মিত সাক্ষাৎ চলতে লাগল। এর কিছুদিন পর বাড়িতে জানাজানি— প্রাথমিক বিরোধিতা। ১৯৬৬ সালে আমরা বাড়ির অজান্তে রেজিস্ট্রি বিয়ে করলাম। সাক্ষী ছিল ভোলা, মণিময়, পাপিয়া, হাসি। দীপুকে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল, মুখে কিছুটা নার্ভাস হাসি। তখন মার্চ মাস। এরপর জুনের ২৯ তারিখে আমাদের সামাজিক বিয়ে হয়। আমি দীপুর কাছে বহরমপুরে আসি।

তখন 'পুনশ্চ' বেরোচ্ছে। 'পুনশ্চ'-র পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় যুব উৎসবের। বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়। ভীষণ ব্যস্ত দীপু। এই সময় আমরা সংস্পর্শে আসি একজনের— কলকাতার পাইকপাড়ায়। নতুন করে মার্কসবাদের পঠনপাঠন শুরু হয়। রতন খাসনবিশ, প্রদীপ বক্সী, সুমিতা চক্রবর্তী, মণিময় ইত্যাদি এরাও ছিল। একসাথে সবাই থাকা, একসাথে পড়াশোনা চলতে থাকে। নেতৃত্বের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে হতাশা/ ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। এরপর নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের সময় দলটা ভেঙে যায়। 'অনীক' নামে পত্রিকা বেরোতে শুরু করে। আগেই বলেছি, আমি পড়াশুনার বাইরে খুব যে বই পড়েছিলাম তা নয়। দীপু আমাকে বেশ কিছু বই পড়তে দিয়েছিল এই সময়। মার্কসবাদ চর্চার স্টাডি ক্লাসগুলো আর এই বইগুলো নিঃসন্দেহে আমার বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে দাগ কেটেছিল 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' আর গুরেভের 'মানব সভ্যতার ইতিহাস'। এটা খুব বিস্ময়ের যে আমাকে কিছু করা বা না করার জন্য দীপু কখনো জোর করেনি। শুধু ঐ বইগুলো পড়েই আমি আমাদের প্রচলিত অনেক সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পেরেছিলাম। নিজে থেকেই বাদ দিয়েছিলাম সিঁদুর পরা, শাঁখা পরা।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের এক মাঝরাত্তিরে পুলিশ এল আমাদের বাড়িতে। তার আগেই এমারজেন্সি ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে। তখন আমরা ১ নং কুলদা রায় লেনের ভাড়া বাড়িতে থাকি। এটা সেটা ঘাঁটাঘাঁটির পর *অনীক*-এর সিকিম সংখ্যা আর কিছু বই তুলে নিল ওরা, তারপর দীপুকে বলল, "আমাদের সঙ্গে একটু চলুন, জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে"। চলে গেল। আমাকে শুধু বলে গেল ওর ছোড়দার সাথে যোগাযোগ করতে। ভাবিনি এই যাওয়া প্রায় দু-বছরের জন্য। ওর সাথে সুকান্তকেও ধরেছিল। আমাদের মেয়ের বয়স তখন পাঁচ, আর ছেলের দেড়। বোঝার বয়স হয়নি কারো। তারপর প্রতিদিন খালি আশা আর প্রতীক্ষা— কবে ছাড়া পাবে। আমার মা তার সংসার ফেলে রেখে পুরো সময়টা আমার কাছে ছিলেন। কোর্টে যাওয়া, জেলে যাওয়া, নিজের স্কুলের চাকরি, ছোট বাচ্চারা— এক অসহনীয় অবস্থা। ওর কলেজ থেকে কিছু টাকাপয়সা পাওয়া গেছিল প্রাথমিকভাবে সহকর্মীদের তৎপরতায়। দীপু তো কখনো একা থাকত না, ওকে ঘিরে থাকত বন্ধু-ছাত্রের দল। সোমনাথ, প্রতাপ, অসিত, কলেজের সহকর্মীরা আরো অনেকে আসত,

আমার কাছে খোঁজ খবর নিত। আত্মীয়স্বজনরা ছিল। প্রথম দিকে ভালো করে দেখা করতে দিলেও জেলে বন্দী পালানোর ঘটনার পর থেকে ওদের রাখত ছোট্ট সেলে। ছটফটে প্রাণবন্ত মানুষটা স্থির থাকতে পারত না, কাজ ছাড়া থাকতে পারত না। সে কীভাবে দিনের পর দিন ঐ সেলে দিন-রাত কাটাচ্ছে ভাবতে আমার চোখ ফেটে জল আসত। ছেলেমেয়েরা বাবার কথা বলত। ছেলে তো খুব ছোট। মেয়েটা চুপচাপ হয়ে গেছিল। ও তো বাবার কাছাকাছি বেশি থাকত। এই সময় এক ঘনিষ্ঠ মানুষ বলেন তিনি কিছু টাকা ঘুস দিয়ে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে। কবে ছাড়বে— কোনো আশার আলো নেই। সংকটে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমি মা-র সাথে আলোচনা করি। তিনি সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'দীপু ফিরে এলে তুই ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবি'— এক কথায় আমার চোখ খুলে যায়। বুঝতে পারি কী ভীষণ অসম্ভব কথা ভাবছিলাম। আমাদের বিয়ের আগে আমার মা-র দীপুকে নিয়ে আপত্তি ছিল। পরে দীপুর সততা-সারল্যে মুগ্ধ মা-র সবচেয়ে প্রিয়পাত্র এই দীপুই ছিল। তিনি কিন্তু তাঁর 'ছেলে'-কে চিনতে ভুল করেননি।

জেলে দীপুর গলায় একটা নডিউল হয়। চিকিৎসার জন্য যায় আলিপুর জেলে। তার আগে পর্যন্ত বহরমপুর জেলেই ছিল। ১৯৭৭ সালে দীপু ছাড়া পেল। নতুন উদ্যমে লেগে পড়ল নানা কাজে। মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা, এপিডিআর, সাংবাদিক সঙ্ঘ। 'অনীক' তো আছেই। সদা ব্যস্ত। আমি মাঝে মাঝে রাগ করতাম, এত কিছু একসঙ্গে করার কী দরকার! যে কোনো একটা করলেই হয়। শুনে হাসত।

এর মধ্যে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছিল। ওদেরকে সময় দেওয়া, ওদের নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার-বেড়াতে যাওয়া— এসব চলত। ওদের পড়াশোনা নিয়ে ওদের স্বাধীন মতকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। কোনো বিষয়েই কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না দীপু। ওদের ভালো বই পড়ানো, ভালো সিনেমা দেখানোর পক্ষপাতী ছিল। ফিল্ম সোসাইটির ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ওরা ভালো বিদেশি ছবি দেখত। দীপু বলত, ওদের রুচিটা তৈরি হলে ওরা নিজেই খারাপটাকে চিনতে পারবে— বর্জন করতে পারবে।

বাংলাদেশের প্রতি দীপুর ছিল প্রায় নাড়ির টানের মতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাতবিরেতে অনেকে আসত গোপন আশ্রয়ের জন্য। বাংলাদেশে যাওয়ার খুব আগ্রহ ছিল। বহরমপুরে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালন করা হত দীপুর আগ্রহে। বাংলাদেশে গেলে ইলিশ আনতে ভুলত না। কলকাতা যাতায়াত ছিল নিয়মিত। স্কুল-কলেজে চাকরির সূত্রে বছরে দুবার বড় ছুটি পেতাম আমরা, তখন কলকাতায় থাকতাম। বহরমপুরে নানা প্রোগ্রামে বহু মানুষের আনাগোনা ঘটত আমাদের বাড়িতে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, দিলীপ বাগচি, প্রতুল মুখোপাধ্যায়— এদের গান রাত জেগে শোনা হত, টেপ করা হত। মহাশ্বেতাদির বাড়িতে আলকাপের আসরে যেতাম দল বেঁধে। বহরমপুরে বাড়ি বিক্রির পর মহাশ্বেতাদি আমাদের বাড়ি এসে থাকতেন। খুব ভালোবাসেন আমাদের। আমাদের সংসারে 'অনীক' টিম ছিল অনিবার্য সদস্য। ওরা বহরমপুরে নিয়মিত কাজ ছাড়াও আসত। কলকাতায় আসার পর এ সম্পর্ক আরো জোরালো হয়। দীপু ভীষণ সিস্টেম্যাটিক হলেও ঘরের চেহারা সবসময় ঝোড়ো। ঐ বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যেই দীপু এক নিমেষে বার করে ফেলত দরকারি বই, কাগজপত্র। ঝোড়ো ঘরকে ছিমছাম রূপ দিতে সুমিতা-শুভাশিসের ছিল নিরলস প্রচেষ্টা।

আমার অবাক লাগত ওর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে। সেই যুব উৎসব থেকে শুরু করে বহরমপুর বইমেলা, ফিল্ম সোসাইটি— কত ধরনের কত মানুষকে এক জায়গায় করার ক্ষমতা ছিল। ওর ব্যক্তিত্ব, সহজ ব্যবহার, সদাহাস্যময়তা কেউ এড়িয়ে যেতে পারত না। স্পষ্টবাদিতার জন্য শত্রুতা করেছে অনেকে অনেক সময়, কিন্তু বেশিদিন পারে নি। মতানৈক্য হলেও সেই মানুষের সঙ্গে হেসে স্বাভাবিক আচরণ করার ক্ষমতা ছিল দীপুর। এমনকি জেলে থাকাকালীনও সান্ত্রীদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক করেছিল যে তারা বাড়িতে এসে চিঠি পৌঁছে দিত। পরে আমাদের সংসারে ছেলের বৌ, জামাইয়ের সঙ্গেও ছিল সেই সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

রিটায়ারমেন্টের পর কলকাতায় চলে এলাম পাকাপাকিভাবে। এখানে এসে ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল নানা কাজে। এর আগেই ওর বাইপাস সার্জারি হয়েছে হার্টের। বহরমপুরে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিল রাস্তায়। আমি খবর পাই পরে— তখন হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। তার আগে পর্যন্ত ওকে অসীম পরিশ্রম করতে দেখে বোধ হয় অসীম ক্ষমতাধরই ভাবতাম। অসুস্থতার পর থেকে আমারও ভয় হলো। বেশি পরিশ্রম করলে বকাবকি করতাম। কিন্তু এতে দমিয়ে রাখা যায়নি।

অবাক হয়ে যাই যখন ভাবি, এত বই পড়া, এত রকম কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেও মানুষটা কী করে এত প্রাণবন্ত থাকত। বাড়ির অজস্র কাজের দায়িত্বও ছিল ওর। ও খুব অসুস্থ না থাকলে কখনো বাজারে গেছি মনে পড়ে না। এত ব্যস্ত থেকেও বাড়ির লোককে এত সময় দিত। গান-গল্প-মজা— বাড়ির সবাইকে মাতিয়ে রাখত। নাতনিদের নিয়ে খুব খুশি থাকত। তাদের জন্য ছড়া, গান, ছবি সংগ্রহেও প্রবল উদ্যম। আমার সঙ্গে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দিয়ে শুরু হয়েছিল ৬৩ বছরের চেনায় সে বন্ধুত্বে কখনো ছেদ পড়েনি। পারস্পরিক বোঝাপড়ায়, শ্রদ্ধায় কোনো খাদ ছিল না। আমি ওকে বুঝতাম। সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতাম একসঙ্গে। বেশিদিন কলকাতার বাইরে না গেলে হাঁফিয়ে উঠত। বছরে দু-তিন বার সমুদ্রের ধারে বা কোথাও অবশ্যই যেতাম। এই মানুষটা সব শূন্য করে বড় তাড়াতাড়ি চলে গেল। আর কিছুদিন কি থাকতে পারত না!

দীপুর শোক মিছিলে সবাই যখন গলা ছেড়ে ইন্টারন্যাশনাল গাইছিল, বুকটা ভরে উঠছিল, মনে হচ্ছিল আমার 'সাথী'র সাথে পথচলা শেষ হওয়ার নয়। এত মানুষের স্মরণে-মননে তার উপস্থিতি আমায় সঙ্গ দেবে। আমি আমার পথ চলার শক্তি পাবো।

**(অনুলিখন: শাশ্বতী চক্রবর্তী)**

# মাও সেতুঙের কবিতা : দীপংকর চক্রবর্তী-র অনুবাদ

## চিংকাংশান

পাহাড়ের নীচে হাওয়ায় উড়ছে নিশান এবং ফেস্টুন,
পাহাড় চূড়ায় প্রতিধ্বনি— আমাদের ড্রাম-বিউগল্।
হাজার হাজার শত্রু সৈন্য যদিও ঘিরেছে চারদিকে—
তবুও আমরা অনড়, অটল, সুদৃঢ় এবং অচঞ্চল।

আমরা তুলেছি শক্ত দেয়াল— দুর্বার প্রতিরোধ,
দৃঢ়-সংকল্পতায় গড়েছি দুর্ভেদ্য দুর্গ-ই
হুয়াংইয়াংচিয়েতে বাজছে কামানের গর্জন—
শত্রুসৈন্য ভীত পলায়িত গভীর রাত্রেই।

## আবার চিংকাংশানে আরোহণের পর

দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আমার
মেঘের রাজ্যে পাড়ি দেবার,
তাই আরোহণ চিংকাংশানে পুনর্বার।

এসেছি আবার আমি বহুদূর থেকে
পুরোনো স্মৃতি চিহ্নিত ঘাঁটি দর্শনে :
পরিবর্তিত পুরোনো দৃশ্য
গান গেয়ে যায় সোনালী পাখী
সোয়ালো পাখিরা ওড়ে ঘুরে ঘুরে
কুলু কুলু বয় পাহাড়ী নদী।

পথ চলে গেছে আকাশের দিকে,
পেরিয়ে গেলেই হুয়াংইয়াংচিয়ে
বিপদে ভরা স্থান নেই কোনো
ফিরে তাকানোর মতো।

গর্জে বাতাস ও বজ্র আজকে সেখানেই
মানুষেরা আছে যেখানেই
পতাকারা আর ফেস্টুন ওড়ে আকাশে।
আঙুল মট্‌কে মট্‌কেই যেন আটত্রিশ বছর গেলো কেটে।
চাঁদকেও পারি দখল করতে আমরা নবম স্বর্গ থেকে
পাকড়াতে পারি কাছিমগুলোও পাঁচ সমুদ্র গভীর হতে :
আসব আমরা আসব আবার আমরা আসব ফিরে
গেয়ে গেয়ে যত বিজয়ের গান হেসে হেসে।
কঠিন কিছুই নয় এই দুনিয়ায়—
সাহস যদি বা থাকে দুর্গম পথযাত্রায়।

## আমাদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য

ছোটো এই পৃথিবীতে
দেয়ালে মাথা কুটে মরছে কয়েকটা মাছি,
অবিশ্রান্ত গুঞ্জন তাদের—
কখনো দম্ভে ভরা সুতীব্র চিৎকার,
করুণ আর্তধ্বনি কখনও বা।
লোকাষ্ট গাছের উইপোকাগুলো
বিরাট দেশটাকে দখল করার স্বপ্ন দেখছে,
আর দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড গাছটাকে উপড়ে ফেলার জন্য
খেলার ভান ক'রে
চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে গুবরে পোকাগুলো।
চংগনের ওপর পাতা ঝরিয়ে চলেছে পশ্চিমের বাতাস,
জেগে উঠছে ধনুকে টংকার—
তীরগুলো শন্‌শন্ ছুটছে।

কত কাজ যে করা বাকী—
আর সবগুলিই জরুরী।
গড়িয়ে চলেছে পৃথিবী,
চেপে ধরছে সময়—
দশ হাজার বছর সময়টা খুবই দীর্ঘ।
প্রতিটি দিনকে দখল করো,
দখল কর প্রতিটি মুহূর্ত।
চার সমুদ্র জাগছে,
ফুঁসে উঠছে মেঘ আর তরংগ,
পাঁচ মহাদেশ দুলছে,
গর্জে উঠছে বাতাস আর বজ্র।
ধ্বংস করতে হবেই সব কীট-পতঙ্গ।
আমাদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য।

**মূল বানান অপরিবর্তিত**

# শেষ ভাষণ : দীপংকর চক্রবর্তী

(*Marxism and the Indian Left* পুস্তক প্রকাশনা উপলক্ষে ৫ জানুয়ারি ২০১৩ পূর্বালোক পাবলিকেশন আয়োজিত স্টুডেন্টস হল-এর সভায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি। তাঁর আগের বক্তারা ছিলেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র ও গৌতম নাভলাখা। আলোচনার বিষয়বস্তু : মার্কসবাদ ও ভারতবর্ষে বামপন্থা)

আমি যতটুকু বুঝি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মতো, মার্কসবাদ প্রশ্ন করতে শেখায় মানুষকে। কারণ মার্কসবাদ গড়েই উঠেছে আগের পুঁজিবাদী ব্যাবস্থকে প্রশ্ন করে চ্যালেঞ্জ করে। মার্কসবাদ কোনো আপ্ত-বাক্য নয়, ফর্মুলা নয়, কোন্ দেশে কীভাবে বিপ্লব হবে তা কেউ বলে দিতে পারেনা। মার্কসবাদ একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে, দেখতে শেখায়, এবং সেই দেখার ভিত্তিতে বাস্তবকে বিচার-বিশ্লেষণ করে কী নীতি, কী রণনীতি কী রণকৌশল নিতে হবে, এইটা শেখায়। মানুষের এই দেখার মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে। দেখার সমতা থাকলেও কীভাবে তা সমাধান করা যায়, তা নিয়ে পার্থক্য থাকতেই পারে। যা নিয়ে মার্কসবাদে বিতর্ক, যেটাকে আমরা স্বাগত জানাই। এবং এই যে প্রশ্ন করার কথা বললাম, সুমন্ত ব্যানার্জির বই-এর বিশেষ গুণ আমি মনে করি, আজকের বাম আন্দোলনে যা জরুরি, এই প্রশ্ন করার সাহস করাটা। সুমন্ত ব্যানার্জির বইটাতে দুটো ভাগ আছে। প্রথম ভাগের প্রথম লেখাতেই সুমন্ত ব্যানার্জি প্রশ্ন তুলেছেন, এই যে চীন বিপ্লব হলো রুশ বিপ্লব হলো, এত রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে, এত আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ালো? দুই দেশের এমন কিছু বিচ্যুতি দেখা দিল, যেজন্য সমাজতন্ত্র টিকলো না। এই প্রশ্নটা তুলে সুমন্ত ব্যানার্জির বইটা শুরু হয়েছে। আশ্চর্য সমাপতন দেখুন, আজ থেকে মাস ছয়েক আগে মাওবাদী দলের একজন পলিটব্যুরো সদস্য, যিনি তিহার জেলে আটক রয়েছেন, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা বাতিল হয়ে গেলেও যাকে আটকে রাখা হয়েছে, তাঁকে আমাদের পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যার জন্য একটা লেখা পাঠাবার অনুরোধ পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার একটা চমৎকার উত্তর পাঠিয়েছিলেন— যেহেতু তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেখানে তিনি লেখার জন্য সবকিছু তথ্য পাচ্ছেন না, প্রয়োজনীয় বই-পত্র পাচ্ছেন না, কাজেই তিনি একটা চিঠি দিয়ে এই লেখা লিখতে অপারগতা জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই যে এত আত্মত্যাগ এত মানুষের তিতিক্ষা এত বলিষ্ঠ লড়াই, কেন তা থেকে শেষ পর্যন্ত একটা authoritarian, কর্তৃত্ববাদী জায়গা তৈরি হয়? রাশিয়ায় হয়েছে, চীনে হয়েছে, এবং তাঁর চিঠির ভাষা থেকে স্পষ্ট যে, তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকেও এর অন্তর্ভুক্ত করছেন। খেয়াল করুন, যে প্রশ্ন সুমন্ত ব্যানার্জি তাঁর প্রথম প্রবন্ধে তুলেছেন, মাওবাদী দলের সর্বোচ্চ স্তরের একজন নেতাও তাঁর চিঠিতে সেই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। এটাকেই আমি বলছি প্রশ্ন করা, প্রশ্ন প্রচার করতে শেখা, প্রশ্ন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সংসদীয় পথে যারা বিশ্বাস করে, যাকে মূল ধারার রাজনীতি বলা হয়, সুমন্তবাবু সেই রাজনীতিকে, সিপিআই(এম) দলকে বামপন্থীদের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে পার্টিগতভাবে স্থান দিতে রাজি হন নি । তিনি বললেন, এই পার্টির মধ্যে সৎ, এখনো চিন্তা করেন, বিপ্লব-আকাঙ্ক্ষী তাদের বাদ দিচ্ছেন না, কিন্তু পার্টিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি এখন প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই পার্টিকে এই ঐক্যের মধ্যে আনছেন না। আমি সুমন্ত ব্যানার্জির সাথে সহমত পোষণ করি। এই যে ঐক্যের প্রশ্ন উঠেছে, আমার মনে হয় তার উৎসে আমাদের যেতে হবে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি কোনদিন সেভাবে প্রশ্ন করেনি। কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টাও করেনি। ১৯২১ সালে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছিল। চিনের পার্টি চোদ্দ বছরের মধ্যে এমন জায়গায় চলে গেল যে চিয়াং কাই শেক-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আর ভারতবর্ষের পার্টি চোদ্দ বছর পরেও দেখা গেল, লেফট-রাইট লেফট-রাইট করছে, একবার বলছে, কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বাত্মক ঐক্য চাই, পরের দিনই ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙে দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে বিভাজন ডেকে আনছে। ভারতবর্ষে যে বিরাট বিরাট আন্দোলনগুলো বিরাট সম্ভাবনা তৈরি করেছিল, যেমন '৬৭ সালের নকশালবাড়ির আন্দোলন, পরবর্তীকালে দেখা গেল, তা ক্রমশ অনেক গ্রুপে পরিণত হয়েছে। আমরা বিভাজনে বিশ্বাস করি, ঐক্যে নয়। চিনের পার্টি ১৯৩১ সালে দশ বছর পর দেখা যাচ্ছে, পার্টিতে একের পর এক লাইন এসেছে, চেন তু সিউ লাইন, লি লি সান লাইন, ওয়াং মিং লাইন। মাও সেতুং সেসবের সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু মাও সে তুং আলাদা কোনো পার্টি তৈরি করেন নি। মাও সেতুং চিংকাং পাহাড়ে গিয়ে তাঁর মত অনুযায়ী যে পথ গ্রহণ করা উচিত, সেই অনুযায়ী কাজ করেছেন, বাস্তব কাজের মধ্যে তার সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে, গোটা পার্টি মাও সে তুং-এর লাইন গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশে ঐক্য প্রবণতা নেই, কারণ আমি বলছি, আমরা প্রথম থেকে প্রশ্ন করিনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনে একেবারে প্রথম দিকে, সুমন্তবাবুকে ধন্যবাদ তিনি এ প্রসঙ্গ তুলেছেন বলে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে উপযোগী লাইন খোঁজার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা যায়, পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন তা দেখা যায় নি। যেহেতু ভারতবর্ষ ব্রিটেনের উপনিবেশ তাই ব্রিটেনের পার্টি আন্তর্জাতিক সমর্থন নিয়ে ভারতের

পার্টিকে পরিচালনা করেছে। তখন একথা চালু হয়েছে যে, মস্কোয় বৃষ্টি হলে ভারতের কমিউনিস্টরা ছাতা খোলে। আবার ৬৭-পরবর্তী কালে আমরা সবাই ভেবে নিয়েছি, চীন যা বলে তাই ঠিক এবং চীন যেভাবে বলছে সেভাবেই চলতে হবে। তখন নতুন কথা এল, পিকিং-এ বৃষ্টি হলে আমরা ছাতা খুলি। মাও সে তুং যখন চীনে বিপ্লব করছেন, লেনিন যখন বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন, একথা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই আপনারা জানেন, বাস্তব পরিস্থিতি তখন অন্যরকম ছিল, অন্যরকম একটা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন মাও সে তুং দিয়েছিলেন। নকল করেননি,অনুকরণও করেননি। ১৯৪৫ সালে মাও সেতুং একটি কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ বলেছেন, মার্কসবাদের ভূমিকা হচ্ছে প্রত্যেক দেশের বাস্তব অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে সেই দেশের নীতি এবং কৌশল ঠিক করা। সেই দেশের কী অবস্থা সেটা বাইরে থেকে কেউ ঠিক করে দিতে পারে না। আমাদের ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল যে, রাশিয়ার গাইডেন্সে চলছি।...

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪২ সালে সুভাষ বোসকে তোজোর দালাল বললো, '৪২-এর আন্দোলন পার্টিগতভাবে বিরোধিতা করলো। একবিংশ শতাব্দীতে এসে জানতে পারছি, ১৯৫১ সালে স্তালিন কমিউনিস্ট পার্টির ডেলিগেশনকে জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা অত বিরাট একটা গণ-আন্দোলন, কী করে তোমরা তার থেকে আলাদা থাকলে, কী করে তার বিরোধিতা করলে? তেলেঙ্গানায় যখন বির্তক চলছে, পার্টি কোন লাইনে যাবে, সংসদীয় পথে ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা এই নিয়ে বিরোধ চলছে, তখন ১৯৫১ সালে পার্টি কংগ্রেসে একটা ডকুমেন্ট পেশ করা হলো, বলা হলো এটা স্তালিন লিখে দিয়েছেন। আমরা চিরকাল শুনে এসেছি, কিশোর বয়স থেকে শুনছি, এটা স্তালিন তৈরি করেছেন। এখন বাসবপুন্নাইয়া-এর কাছে জানতে পারছি, রাশিয়ার পার্টির কাছে ভারতের পার্টি উপদেশ চেয়েছিল, তেলেঙ্গানায় এই সমস্যায় কী করবো? স্তালিন এবং রাশিয়ার পার্টি তখন বলেছিলেন, আপনাদের দেশে আপনারা কীভাবে কী করবেন আমরা তা বলে দিতে পারিনা। আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা কিছু পরামর্শ দিতে পারি। আপনারা সেই পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন, বর্জন করতে পারেন, বা আপনাদের প্রয়োজনমতো মডিফাই করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি কখনো চাপিয়ে দিতে চাননি। কিন্তু পার্টির নেতারা আমাদের শিখিয়েছেন, রাশিয়া আমাদের পথ দেখিয়েছে। আমি বলতে চাইছি, ভারতের কমিউনিস্ট নেতারা প্রশ্ন করেননি সেই কুড়ির দশক থেকেই, যদিও এই দলে অনেক যোগ্য মানুষ ছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্ট হিসাবে যে প্রশ্ন করার অধিকার, প্রশ্ন করাটা যে আবশ্যিকতা তা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। এবং এখনো তারই ধারাবাহিকতা চলছে, এটা ঘটনা। সুমন্তবাবু তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তা দেখিয়েছেন,আমি তার মধ্যে যাচ্ছিনা। আমি সাধারণভাবে বলতে চাই, রাশিয়ায় কীভাবে বিপ্লব হবে চীনে নিশ্চয় আমরা তা ফলো করবো না। চীনে কীভাবে বিপ্লব হবে সেটাও কি আমরা ফলো করবো? চীন আর ভারতবর্ষ কি এক? কিউবা আর ভারতবর্ষ কি এক? ভারতবর্ষের মাটি, ভারতবর্ষের জমি, ভারতবর্ষের সমাজকে যদি আমি না বুঝি, তাহলে কী করে বলবো যে, কী করে এগোতে হয়?

আমরা সংসদীয় পথ কিংবা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে লড়াই চালাতে পারি। সংসদীয় পথের একটা লাইন চালাতে পারি। সংসদীয় পথের একটা লাইন আছে। যেসব বিপ্লবকে আমরা মহান বলি, মহান রুশ বিপ্লব, মহান চীন বিপ্লব, কেউই একটি মাত্র লাইন ফলো করে নি। কেউই এই মোহ ছড়ায় নি যে, সংসদীয় পথে পরিবর্তন আসবে। কেউ বলেন নি, (তবু) আমরা এটা নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছি অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে। সংসদীয় পথে (সমাজ) পাল্টানো যায় না। আবার শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের ওপর নির্ভর করেও পাল্টানো যায় না। আমার মনে আছে সেই '৬৭-৬৮-তে যখন নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হলো, তখন আমার বয়স কম, ২৬-২৭ বছর, সদ্য চাকরিতে জয়েন করেছি। আমার এক অত্যন্ত কট্টর নকশালবাদী বন্ধুকে আমি বলেছিলাম, তুমি তো কট্টর নকশালপন্থী, তোমাদের লাইন হলো, গ্রামে চলে যেতে হবে, তুমি যেতে পারছো না, তো শহরে যে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে, বদমায়েশি হচ্ছে, তাতে তোমাদের কী করণীয়? সে বলল, সে তো আইনি লড়াই হয়ে যাবে। ঠিক উত্তর দিতে পারেনি। আমি বলেছিলাম, তোমাদের এটা সুবিধাবাদী লাইন। অর্থাৎ যারা গ্রামে চলে গেল, বাকি যারা রইলো তাদের কিছু লিফলেট বিলি করা ছাড়া কোন কাজ নেই। রাশিয়া সেভাবে কাজ করেনি, চীন সেভাবে কাজ করেনি, এই শিক্ষাগুলো তো আমরা নিতে পারতাম।

কাশ্মীর, উত্তরপূর্ব ভারত, এসব জায়গায় সুমন্তবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন, ভারতের কমিউনিস্টরা নজর দেয়নি। আমি বলবো, তারা রাষ্ট্রীক দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করছেন। ভারত রাষ্ট্রের যে মূল দৃষ্টিভঙ্গি এই সমস্ত অঞ্চলগুলো দাবিয়ে রাখার জন্য, ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরাও মূলত সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। আজকে তাদের যখন প্রশ্ন উঠছে, এক সামগ্রিক সংকটের আমরা সম্মুখীন, তিরিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসন বামপন্থা সম্পর্কে মানুষকে বিমুখ করে দিয়েছে। এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। মনে আছে আমার ছোটবেলায়, একজন আন্দামান বন্দী যিনি সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি করতেন, পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন, আমরা দেখতাম, তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম, দেখতাম মানুষ, তাঁদের কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও তাঁকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন। তার পরবর্তী স্তরে দেখেছি, সামাজিক স্তরে যারা কমিউনিস্ট নেতা তাঁদের মত না মেনেও সাধারণ মানুষ তাঁদের সমর্থন করেন, শ্রদ্ধা করেন। অর্থাৎ বামপন্থীরা আগেকার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মতো মানুষের কাছে একটা শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছিলেন।...

১৯৮৭ সালে বামফ্রন্টের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল। তার অন্যতম বক্তা ছিলাম আমি, আরেকজন বক্তার নাম বললেই চিনবেন— বিমান বসু। আমি একটি প্রশ্ন তুলেছিলাম, যা এইমাত্র সুমন্তবাবু তুললেন। জ্যোতিবাবুকে আগে দেশদ্রোহী বলা হয়েছে, কিন্তু চোর বলার সাহস কেউ পায় নি। আর দশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর, জ্যোতিবাবু চুরি করেছেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু লোকে সেটা বলার সাহস পাচ্ছে। সেই সাহসটা এসেছে বামপন্থার বামফ্রন্টীয় অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে। সেই কারণেই বামফ্রন্ট সম্পর্কে বলেছিলাম, এটা বামপন্থাকে এগিয়ে না নিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে। সুমন্তবাবু সঠিকভাবেই আজকের বক্তৃতাতেও বলেছেন, তাঁর বই-এও লিখেছেন, এই সংকটকে বুঝতে হলে প্রশ্ন করতে হবে, অবস্থাটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে বললেই তো বোঝা যায় না, বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সেই বোঝার মধ্যে বিতর্ক থাকবে, মত-পার্থক্য থাকবে, কিন্তু না বুঝে আমি কোনো কাজ করতে পারি না। মাও সেতুং তাঁর কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁর 'চীন বিপ্লব ও চিনের কমিউনিস্ট পার্টি' বই-তে। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে কি এবং কেন এই প্রশ্ন করে জবাব নিতে হবে। পার্টির নেতা বলে দিলেই ঠিক, এটা তুমি যদি ভাব তাহলে তুমি কমিউনিস্ট নও। আজকে কিন্তু বামপন্থীদের সেই জায়গা এসেছে। আমি বামপন্থী কি না, আমি এই বক্তব্য সমর্থন করব কি করব না, সেটা কত বড় নেতা বলেছেন দেখে আমি বিচার করব না, আমি বাস্তব থেকে আমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মিলিয়ে দেখব বিচার করব। যদি গ্রহণযোগ্য হয় গ্রহণ করব, না হলে করবো না।...

আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, কেন? না সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের আন্দোলনের ফলে। সে আন্দোলন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন? না। সিঙ্গুরের আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি নেতৃত্ব দেয় নি। সেই আন্দোলনে আমরা বারবার সিঙ্গুরে গেছি, আমাদের এপিডিআর সেখানে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল, তৃণমূলের বেচারাম মান্না এবং কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিলেন, আরো অনেক রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, মানবাধিকার কর্মীরা ছিলেন, কারো একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে মমতা ব্যানার্জী আন্দোলনটিকে আত্মসাৎ করলেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের শুরুতে একজনও তৃণমূলপন্থী ছিলেন না। এবং কেমন আত্মসাৎ করলেন— অতি সম্প্রতি একজন লেখককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কেন, না তিনি নন্দীগ্রামের উপর একটি বই লিখেছিলেন। সেই বই-এ কী আছে? নন্দীগ্রাম আন্দোলনের বিবরণ আছে, সেই সাথে তিনি এও বলেছেন, সেই সময় যখন সিপিএম-এর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তখন মাওবাদীরা সেখানে একটা ভূমিকা নিয়েছিলেন। এটা একটা বাস্তব ঘটনা যা মমতা ব্যানার্জীও জানেন, শুভেন্দু অধিকারীরাও জানেন। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলা যাবে না, কারণ মমতা ব্যানার্জীদের সাথে মাওবাদীদের যে পুরনো সম্পর্ক সেটা ফাঁস হয়ে যাবে। তাই ওই লেখককে গ্রেপ্তার করা হল। বই-টা নিয়ে একটা ফিল্ম হয়েছিল, সেই ফিল্ম হওয়ার মুখে এই বার্তাটা দেওয়া হল। সেই ফিল্মটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ফিল্ম ফেস্টিভালে দেখানো হলেও পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম ফেস্টিভালে দেখানো হলো না। তাই সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের যে আন্দোলনের গল্প আমরা করি, তার কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করতে পারেন না। পস্কো-বিরোধী যে আন্দোলন চলছে, সেখানে নেতা সিপিআই-এর লোক কিন্তু সিপিআই তার নেতৃত্বে নেই। যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা কোন বিশেষ পার্টির লোক নন। এই যে নর্মদা আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের জমি আন্দোলন, এরকম নানান আন্দোলন তাবৎ ভারতবর্ষ, সম্ভবত শুধু ভারতবর্ষেই নয় গোটা পৃথিবীতেই— এই অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন— সর্বত্র (দেখা যাচ্ছে) বামপন্থীরা তাদের কৃতকর্মের ফলে অনেকাংশে মানুষের বিশ্বাস হারিয়েছেন। তাই যেভাবে পারছেন, মানুষ নিজেরাই উঠে দাড়াচ্ছেন। নিজেরাই আন্দোলন গড়ে তুলছেন। পরে কোন না কোন পার্টি তার কৃতিত্ব দখল করছেন। এই যে প্রবণতা, আমি মনে করি একজন মার্কসবাদীর, একজন বামপন্থীর, সব সময় স্বাগত জানানো উচিত। আজকের ভারতবর্ষে যারা বুক চিতিয়ে লড়ছেন, তাতে কোনও কোনও অঞ্চলে কোনও কোনও পার্টি থাকবে, যেমন আদিবাসী অঞ্চলে মাওবাদীদের কথা অবশ্যই বলতে হবে। ওরকম বিশেষ বিশেষ জায়গায় অন্যদের কথা বলতে হবে। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে তারা ভূমিকা নিলেও সমগ্র ভারতবর্ষে লড়ছেন কিন্তু মানুষ। মানুষের মধ্যে দু-চার জন লোক, তারাই রুখে দাড়াচ্ছেন, লড়ছেন, অন্যদের সমবেত করছেন। এককালে এ কাজটা কমিউনিস্টরা করত। কাজেই কমিউনিস্টদের উচিত এই আন্দোলনগুলোর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা। আন্দোলনকে কন্ট্রোল করার জন্য নয়, সেই লড়াই-এর স্পিরিটটাকে, মানুষের লড়াইএর প্রতি স্পৃহাকে অনুধাবন করার জন্য, যাতে তারা এগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে পারেন। সুমন্তবাবুর বই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমি শেষ করব এই বলে যে, সুমন্তবাবুর বইটি যদি আমাদের প্রশ্ন করতে, বাস্তবকে উপলব্ধি করতে, সব কিছুকে ধরে না নিয়ে তাকে প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে পারে, প্ররোচিত করতে পারে, যে যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, তবে সেটা বামপন্থী আন্দোলনে একটা ইতিবাচক কাজ হবে।

**দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা**

# ভারতের সিকিম গ্রাস

অবশেষে যা প্রত্যাশিত ছিলো, ঠিক সেটাই ঘটলো। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকচক্র 'আশ্রিত রাজ্য', 'সহযোগী রাজ্য' ইত্যাদির সাইনবোর্ডগুলোকে খুলে নিয়ে সিকিমের গলায় এবার ঝুলিয়ে দিলো 'অবিচ্ছেদ্য অংশ'-শীর্যক সাইনবোর্ডটি— আপাততঃ সাঙ্গ হলো ভারতের সিকিম-গ্রাস পালা!

হিমালয়ের বুকে ছোট্ট একটি দেশ সিকিম। গত শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সেটা ছিলো একটা স্বাধীন দেশ। গত শতকের মাঝামাঝি থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাণিজ্যিক তথা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সিকিমকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার চক্রান্ত শুরু করে, এবং অবশেষে ১৮৯০ সালে এক অসম চুক্তির ফাঁস গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে সিকিমকে নিজেদের 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত করে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারতের রাজনৈতিক শাসনের ভার ছেড়ে চলে যাবার পর 'সদ্য স্বাধীন দেশ' ভারত কিন্তু সিকিমকে স্বাধীনতা দেয়নি, বরং নেহরুর বিশাল ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে কার্যকরী করার একটি পদক্ষেপ হিসেবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'স্থিতাবস্থা' বজায় রেখে সিকিমকে 'আশ্রিত রাজ্য' হিসেবেই রেখে দেয়। তারপর ১৯৫০ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়েও বেশি অসম এক চুক্তিতে সিকিমকে আরো বেশি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে। ১৯৭৫ সালে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিলো, এবং সিকিমের সামন্ততান্ত্রিক শাসক চোগিয়াল থেকে শুরু করে দেশপ্রেমিক ছাত্র যুবক ও সচেতন মানুষেরা ক্রমশঃই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাচ্ছিলো। স্বভাতঃই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তাতে প্রমাদ গুণেছিলো এবং নতুনতর চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করেছিল। তারই পরিণতিতে ভিয়েতনামের দিয়েম-থিউর মতো, কাম্বোদিয়ার লন-নল সিরিক-মাতাকের মতো, বাংলাদেশের শেখ মুজিবর রহমানের মতো সিকিমেও গজিয়ে উঠেছিলো 'জনগণের প্রতিনিধি' কাজী লোলুপ দর্জি— ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নির্লজ্জ দালাল চক্র। নয়া দিল্লী-মার্কা মহান গণতান্ত্রিক দর্জি সম্পূর্ণ 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে নিজের দেশকে, দেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে ও স্বাধীনতাকে ভারতীয় প্রভুদের পায়ের তলায় সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিয়ে তার দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখালো— এবং সিকিমের 'জনগণের প্রতিনিধি' দর্জির অনুরোধে ভারত সরকার 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও' সিকিমকে আজ ভারতের 'অঙ্গরাজ্যে' পরিণত করতে চলেছে। পূর্বসূরী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যা পারেনি, পিতা জওহরলাল নেহরু পারেনি, ইন্দিরা গান্ধী আজ সেটাই সম্ভব করলো— ভারত সিকিমকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলল। ধন্য ইন্দিরা গান্ধী— ধন্য এশিয়ার মুক্তিসূর্য! দাবী উঠেছে, সিকিম নাকি চিরকালই ভারতের 'অংশ' ছিলো, তার নাকি কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না কোনদিন। ইতিহাস ধর্ষণের এমন নজির হিটলার-ডালেস-ব্রেজনেভরাও সম্ভবতঃ দিতে পারেনি। আর সিকিম বৃটিশ-ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল— এই জলদস্যুসুলভ যুক্তিকেই যদি মেনে নিতে হয়, তবে বার্মা-সিংহল-আফগানিস্তানকেও (পাকিস্তান-বাংলাদেশ তো বটেই!) কি ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' ব'লে দাবী করতে হয় না? অবশ্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা এই যুক্তিতে ওইসব দেশগুলিকেও 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' বানাবার চেষ্টা করলে অবাক হবার সত্যিই কিছু থাকবে না!

দাবী করা হচ্ছে, সিকিমের জনগণ 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে' ভারত ভুক্তির পক্ষে 'ব্যাপক সমর্থন' জানিয়েছে। ভারতবর্ষের গত কয়েকটি নির্বাচনে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি'-র যথেষ্ট প্রমাণ কি আমরা পাইনি? থিউর ভিয়েতনামে, লন নলের কাম্বোদিয়ায়, শেখ মুজিবের বাংলাদেশে কীভাবে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' কাজ করে, তা কি আমরা দেখিনি? সিকিমে সাড়ে তিন ব্যাটেলিয়ান সি-আর-পি মজুত রেখে, ভারতীয় চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে, সিকিমের দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকদের ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ-বিরোধী সমস্ত প্রচার ও বিক্ষোভের কণ্ঠরোধ করে গণতন্ত্রের যে হদ্দোমুদ্দো সেখানে দেখানো হয়েছে, তথাকথিত গণ-ভোটের তিনদিন আগে থেকে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়ে ভারতীয় গোয়েবলস্‌দের প্রচারের মহিমায় চারদিক আচ্ছন্ন করে দিয়ে যে খেলটা খেলানো হল— ন্যূনতম চেতনাসম্পন্ন মানুষ কি সুস্থ মস্তিষ্কে তা মেনে নিতে পারবে?

প্রশ্ন উঠতে পারে, অতোটুকু দেশ সিকিম দখল করে ভারতের কী লাভটা হবে? এ প্রশ্নেরও উত্তর মিলে যাবে ভারতের সিকিম-গ্রাসের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক তথা মদৎদার রুশ নয়া জারদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের কথা মনে রাখলেই। আজকের দুনিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিনীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ নয়া জাররা একই উদ্দেশ্যে মার্কিনীদের চীন-বিরোধী চক্রান্তের ব্লু-প্রিন্টটাকেই কার্যকরী করতে চাইছে। সেই কারণেই চীনের চারদিকের সমস্ত দেশগুলিকেই প্রত্যক্ষভাবে বা এই চীন-বিরোধী চক্রান্তে তাদের প্রধান ঘাঁটি ভারতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে চাইছে। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, সিকিম প্রভৃতি চীনকে ঘিরে ফেলার সেই জঘন্য চক্রান্তেরই এক একটা দাবার ঘুঁটি। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা রুশ নয়া জারদের প্রসাদপুষ্ট হয়ে সেই কুৎসিৎ চক্রান্তকেই ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে মাত্র।

**প্রথম প্রকাশ : অনীক, এপ্রিল-মে ১৯৭৫**

**Business Standard**
**February 09, 2013**

# The unsung revolutionary

**Sunanda K Datta-Ray**

**Dipankar Chakrabarti, founder- editor of socio-political magazine Aneek, condemned Sikkim's 'feudal' monarchy in his writing, langushed in jail for two years and recently died in Kolkata.**

A little- known hero of the Emergency died in Kolkata the other day. I was looking for Dipankar Chakrabarti, the 71- year- old founder- editor of Aneek, a socio - political magazine in West Bengal's Murshidabad district, when I was told he had just succumbed to cardiac arrest. This often happens to me– someone I am keen on meeting inconiderately chooses to bid adieu to life just then. But that's another story. What is saddening is that more people didn't know of Chakrabarti.

Someone at a meeting of the Association of Corporate Advisers and Executives asked me recently to recount what he called my newspaper's heroic deeds during the Emergency. The hall burst into applause when I replied that just as there were more dispossessed East Bengal *zamindars* in Kolkata than there were actual *zamindars* in pre-partition East Bengal, there were more Emergency heroes after the Emergency than existed then. Chakrabarti wasn't among then. Neither was he one of the glitterati who hold high positions and trot the globe while flaunting their supposedly radical ideology.

He neither sought nor received attention. But he and a colleague Sukanta Raha, whose name I learnt only this week, were arrested under the Defence of India Rules for an editorial titled "India's annexation of Sikkim" in Aneek's April- May 1975 special edition. They languished in jail for two years after Berhampore's additional sessions judge refused bail because the article "seems to be calculated to prejudice the minds of the people against the territorial integrity of the Union of India".

When I told my Sikkimese friend, Karma Topden, former Rajya Sabha member and India's one-time ambassador to Mongolia, he asked why Chakrabarti had been singled out for a distinction denied to B G Verghese and me. "Verghese's editorial, 'Kanchenjunga. Here we Come' in the Hindustan Times was very strong", Karma said, "And you made Sikkim an international issue with your reports in The Observer in London, and your book, *Smash and Grab: Annexation of Sikkim*!"

I told Karma, Marxists would probably attribute the different treatment to class justice... or injustice. I'd add class understanding. District officials are less sophisticated than their metropolitan counterparts who might have made allowance for revolutionary rhetoric. Although Chakrabarti thought Sikkim's monarchy "feudal and reactionary", it was "the sacred task of every progressive and socially conscious" Indian "to unite shoulder to shoulder with the freedom fighters of Sikkim, so as to take effective steps to defeat the common enemies of the people of these two countries". The enemy was the "expansionist Indian ruling clique".

Despite the cliches, one must respect someone, especially in the moffusil, who sustained for 48 years a magazine that covered, says a Bangaladeshi admirer. Farooque Chowdhury, many aspects of modern and ancient society, politics, economics, the Moscow-Beijing rift, China's Cultural Revolution, globalisation and the environment. Chakrabarti founded the People's Book Society and the Association for the Protection of Democratic Rights. He translated Chinese revolutionary opera and essays by Paul Sweezy, the Harvard economist who wrote *Demand Under Conditions of Oligopoly* in 1939. Teaching economics at Berhampore's Krishnanath College must have been one of many avocation.

So versatile a man had to be both Bangal (as East Bengalis are called) and Bolshie, Chakrabarti was born in Dhaka. He was so passionately involved in a Country he left when he was six only because having been politically baptised in the Students Federation and sailed close to Communism all his life, he regarded both Bengals as a single revolutionary entity. Not content with famously saddling Lenin with saying (which he didn't!) that the road to world revolution ran from Beijing to Paris via Kolkata, Bengali Leftists re- routed the road after 1971 to take in Dhaka.

I first heard of Chakrabarti in October 1984 after Smash and Grab was published. He wrote to *The Statesman* promising "support and sympathy" to "Mr. Namgyal" (Prince Wangchuck Namgyal of Sikkim) who had asked apropos of my book. "Who in the world's largest democracy will raise a voice for justice in Sikkim?" Chakrabarti replied, "It may interest him and others to know that our Bengali monthly magazine Aneek did precisely this." He assured Wangchuk "that many people in India still consider the annexation of Sikkim to have been a blatant act of expansionism".

He would have welcomed the revised edition of *Smash and Grab*, now being prepared under Tranquebar's Imprint. It will spare readers what Chomsky called "Manufactured Consent" and save them from a pirated edition. I owe that to someone who paid more dearly than Verghese or I for his commitment to Sikkim's freedom.

# ঝড় আসছে!

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে প্রচণ্ড এক ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। এদেশের কোটি কোটি মেহনতী জনতাকে শাসন ও শোষণ করবার ক্ষমতার অধিকার নিয়ে এদেশের শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা-থেকে-বঞ্চিত দুই অংশের মধ্যে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই, এবং যবনিকার আড়াল থেকে যে খেয়োখেয়িকে মদৎ দিয়ে চলছে দুটি বৃহৎ আধিপত্যবাদী শক্তি— সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তারই ফলশ্রুতিতে ক্রমশঃই ঘন হয়ে উঠছে কালো মেঘের পুঞ্জ, যে কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড বিভীষিকাময় এক ঝড়ের রূপ নিয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ ধরা পড়ছে। আজকের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার করতে গেলে ধরা পড়বে, আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হচ্ছে জনসংখ্যার বিচারে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। কী প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে, কী আন্তর্জাতিক পণ্যের বাজার হিসেবে, কী গণ-জাগরণের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের রণনীতিগত ঘাঁটি হিসেবে ভারতের গুরুত্ব অসাধারণ। একথা মনে রেখেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে তাদের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যের মধ্যমণি হিসেবে গণ্য করতো। শেষ পর্যন্ত বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণই থেকে যায়, এবং পরবর্তীকালে তাদের ক্রম- দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এশিয়ার বুকে তাদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে হাসিল করার জন্য ধূর্ত চক্রান্ত শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল ভারতীয় শাসকশ্রেণী নিজেদের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করবার তাগিদে গত পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে সক্রিয়ভাবেই তাদের সেই চক্রান্তের শরিক হয়েছিলো। কিন্তু বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মৌলিক নিয়মই হচ্ছে দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির মধ্যে পারস্পরিক খেয়োখেয়ি। এই নিয়মের ফলশ্রুতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও ভারতের ওপর বেশিদিন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি, অচিরেই এদেশে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ। স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করে সংশোধনবাদী চক্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো বুর্জোয়া একনায়কত্ব (যেহেতু সংশোধনবাদীদের শ্রেণীচরিত্র হচ্ছে বুর্জোয়া) ধীরে ধীরে ও সুপরিকল্পিতভাবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দিয়ে এবং মুনাফাকে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলো রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে, এবং পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা। এইভাবে লেনিন-স্তালিনের হাতে গড়া সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন রূপান্তরিত হয়েছিলো সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী (''মুখে সমাজতন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদ'') সোভিয়েত ইউনিয়নে। ষাটের দশকের শেষদিক থেকে মস্কোর এই সামাজিক- সাম্রাজ্যবাদী নয়া জার-রাই দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্টার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার প্রধান পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে। স্বভাবতঃই তারাও এশিয়ার বুকে তাদের প্রতিবিপ্লবী স্বার্থসিদ্ধির ঘাঁটি হিসেবে ভারতের বিশেষ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মতো একই পদ্ধতিতে প্রথমে অর্থনৈতিক এবং পরে রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়েই ভারতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক এক প্রচেষ্টা শুরু করে। এভাবেই সত্তরের দশক শুরু হবার আগে থেকেই ভারতের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে দুই বৃহৎ আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তিনটি দশক ধরে সমগ্র দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও শোষণ চালাতে গিয়ে জনগণের দুনিয়াজোড়া ব্যাপক ঘৃণা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড এক সার্বিক সংকটে জর্জরিত হয়ে পড়ে, তার ফলশ্রুতিতে তাকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সাময়িক ও আংশিকভাবে হলেও অনেকটা পিছু হটে আসতে হয়, এবং গত কয়েক বছর ধরে এদেশে অনেকাংশেই তার স্থান দখল করে নিয়েছে মস্কোর নয়াজার-রা। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন অংশের ওপর এ মুহূর্তে তাই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিয়ন্ত্রণই অনেক বেশি। তাদের এই নিয়ন্ত্রণ আজ প্রতিফলিত হচ্ছে শাসক কংগ্রেস দলের ক্ষমতাসীন অংশ এবং এদেশে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ট সিপিআই-এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও তার হারানো স্বর্গ পুনরুদ্ধারের আকাংখায় আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে, এবং তাদের এই ক্ষমতা দখলের লড়াই মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী শক্তি ও শাসক কংগ্রেস দলের 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। ইন্দিরা সরকারের 'গরীবী হটাও' স্লোগানের নির্লজ্জ ভাঁওতাটাও আজ যখন এদেশের ব্যাপক মেহনতী জনতার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, অনাহারে অর্ধাহারে শোষিত এবং ফ্যাসিবাদী দমননীতির নির্মম পেষণে নিপীড়িত জনগণ আজ যখন গুমরে গুমরে উঠছেন, বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছেন, কিন্তু সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন মার্কিন লবির এই সব শক্তিগুলিই জয়প্রকাশ নারায়ণকে সামনে রেখে এবং কংগ্রেসের 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠীর পরোক্ষ সহায়তায় জনগণের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, জনগণের সরকার-বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র হিসেবে জয়প্রকাশের আন্দোলন এদেশের বর্তমান দম-বন্ধ-করা

ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার যে সুযোগ করে দিয়েছে, বিভিন্ন সংসদীয় দল তো বটেই, এমন কি কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরাও, সঠিক যুক্তিতেই, সেই আন্দোলনে কম বেশি সামিল হয়েছে। এরই প্রমাণ বহন করেছে গত ৫ই জুন কলকাতার বুকে প্রায়-অভূতপূর্ব এক জনজোয়ারের ঢেউ, জয়প্রকাশকে সামনে রেখে প্রধানতঃ বামপন্থীরা এবং আংশিকভাবে হলেও কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা সেদিন বজ্রগর্জনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে, এবং জনতার সেই কল্লোলের পাশে ৭ই জুন শাসকদলের প্রায় ভাড়া-করা মিছিল, শাসকদলের পাণ্ডাদের বহু তর্জন-গর্জন সত্ত্বেও, নিতান্ত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এবং এসব কিছুই ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট গণ-বিক্ষোভের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

এই যখন অবস্থা, ঠিক সেই মুহূর্তে শাসকদলের পক্ষে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এবং বিরোধীদের পক্ষে মেঘ না চাইতেই জলের মতো ঘোষিত হয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়— দুর্নীতির অভিযোগে ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১ সালের নির্বাচনকে বাতিল করে দিয়ে। এতো বড়ো রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয়ের পর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম আস্থাসম্পন্ন ও ন্যূনতম আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তিই পদত্যাগ করতে বাধ্য হতো। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী পদত্যাগ তো করেনই নি, উপরন্তু যেন-তেন-প্রকারেণ লোক জড়ো করে তথাকথিত ''জনগণের রায়'' দিয়ে ''আদালতের রায়কে'' বানচাল করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে পদত্যাগের সামান্যতম ইঙ্গিতও তাঁর দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে একটা হাস্যকর ব্যাপার অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদরা কোনো দেশের বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রে বিচার ব্যবস্থাকে 'শ্রেণী উর্দ্ধ' একটা পবিত্র ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করবার চেষ্টা করলেও, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের এই ব্যাখ্যা কোনোক্রমেই স্বীকার করেন না, তারা বরং বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থাকেও মেহনতী জনতাকে শোষণ ও দমনের যন্ত্র, রাষ্ট্রযন্ত্রেরই একটি অঙ্গ হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু বর্তমান ভারতে ইতিহাসের একটা নির্মম রসিকতাই হচ্ছে এই যে, শাসক কংগ্রেস দলের মাতব্বর থেকে শুরু করে চুনো পুঁটিরা পর্যন্ত এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে মানতে অস্বীকার করছে, এবং একে ''প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত'' বলে হৈ-হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে। এবং এসব কিছুই শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলেছে। ফ্যাসিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ কোর্টের রায় সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত— এর বক্তব্যের পেছনে সমর্থন কম নেই! মস্কোর নয়া-জাররা এবং তস্য সিপিআই-নামধারী অনুচরবর্গ এবং তাদের সংজ্ঞা অনুসারে তথাকথিত 'প্রগতিশীল' কংগ্রেসীরা তো বটেই, এমন কি বিড়লা-সিংহানিয়া-জৈন-গোয়েংকা-চরতরাম প্রভৃতি বৃহৎ বুর্জোয়ারাও প্রকাশ্যেই ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সমবেত হয়েছে। আর সমস্ত সরকার-বিরোধী দল তো বটেই, এমন কি কংগ্রেসের মধ্যেকার 'বিদ্রোহীরাও' ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবী করছে। দেশের মোটামুটি রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিরাও ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে চলে গেছেন। এক কথায়, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতে তাদের অনুগামী তথা সমর্থকরা এবং বিড়লা প্রভৃতি বৃহৎ বুর্জোয়াদের এক বিরাট অংশ আজ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকে অপরিহার্য বলে দাবী করেছে এবং মার্কিনী লবীর দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি, সংসদীয় বামপন্থী দলগুলি এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবী করছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী কী করবেন? স্পষ্টতঃই তার সামনে দুটি মাত্র বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। প্রথমতঃ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাধারণ রীতিনীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইন্দিরা গান্ধী শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে পারেন। বস্তুতঃ শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যেকার মস্কো-বিরোধী লোকজনেরা প্রকাশ্যে বা পরোক্ষভাবে সেটাকেই সঠিক অবস্থান বলে মনে করছে। কিন্তু এই পন্থা গ্রহণ করার পথে ঝুঁকি রয়ে গেছে অনেক। যদিও প্রায় প্রতিটি সাধারণ লোকই একথা বিশ্বাস করে যে, সুপ্রিম কোর্টে গত বছর সমস্ত প্রচলিত রীতি-নীতি উপেক্ষা করে যেভাবে 'কমিটেড' বিচারকের প্রধান পদে বসানো হয়েছে, তার ফলশ্রুতিতে এলাহাবাদ কোর্ট আজ যে রায়ই দিক না কেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় অবশ্যই ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে যাবে— তবুও, সুপ্রিম কোর্টের ছুটিকালীন বিচারক যেভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে নিঃশর্তভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালাতে দিতে অস্বীকার করেছেন, তার পরে এব্যাপারে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে কিছুটা অনিশ্চিতি দেখা দিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় পর্যন্ত অন্ততঃ ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন, তবে শাসকদলের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য যে শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে চলে যাবে, তা বলা মুস্কিল। এটা সবারই জানা যে, জগজীবন রাম প্রমুখরা প্রকাশ্যতঃই মস্কো-বিরোধী, এবং মূল ক্ষমতা যার হাতে, তার সমর্থকও শাসকদলের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই বাড়তে থাকে— ১৯৬৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ইণ্ডিকেট বনাম সিণ্ডিকেটের লড়াই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে গেছে। কাজেই, ইন্দিরা গান্ধী এক সপ্তাহ বা একমাসের জন্যও বিচারব্যবস্থার প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে ক্ষমতা জগজীবন রামের হাতে তুলে দেন, তবে স্বভাবতঃই কংগ্রেস দলের মধ্যেকার মস্কো-বিরোধী লোকেরা একটা সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যাবে এবং মস্কোপন্থিদের কোণঠাসা করে দেবার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। তার ফলশ্রুতিতে ইন্দিরা গান্ধীর তথা মস্কো-পন্থীদের পক্ষে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসাটা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। আর সুপ্রিম কোর্ট যদি শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে রায় দেয়, তাহলে তো কথাই নেই, ছ'বছর ইন্দিরা গান্ধী আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না— অর্থাৎ তার রাজনৈতিক অবসর গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়বে। কাজেই, সাময়িকভাবে হলেও পদত্যাগ করে মুখ বাঁচানোর এই প্রথম বিকল্প পথটি ইন্দিরা গান্ধী তথা মস্কোপন্থী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে প্রচণ্ড

বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে— এবং সেকারণেই এ পথ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের কোনো উদ্যোগ বা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

এবং এর বিপরীত যে দ্বিতীয় বিকল্প পথটি খোলা রয়েছে— অর্থাৎ গায়ের জোরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত আবরণকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে খেলোখুলি ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরশিপ জারি করার পথ— সেদিকেই মনে হচ্ছে, ইন্দিরাপন্থী তথা মস্কোপন্থীরা ঝুঁকে পড়ছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বের হবার পর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লীর জনজীবন বিপর্যস্ত করে দিয়ে হাজার হাজার ইন্দিরাপন্থীদের সমবেত করার যে পথ তারা গ্রহণ করছে, প্রকাশ্যেই 'জনগণের রায়' দিয়ে 'আদালতের রায়কে' নস্যাৎ করে দেবার যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, ২০শে জুনের বাংলা বনধকে বানচাল করবার জন্য অভূতপুর্ব যে পাশব শক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, প্রতিদিন সারা দেশে অসংখ্য বক্তৃতা-মিছিল ও আকাশবাণীর মাইনে করা প্রচারকদের মাধ্যমে ''জাতীয় স্বার্থে'' ইন্দিরা গান্ধীর 'নেতৃত্বের অনিবার্যতা' নিয়ে যে হুংকার ছাড়া হচ্ছে, সমস্ত বিরোধী দলগুলির ইন্দিরা-সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে যেভাবে ''ফ্যাসিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত'' বলে গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচার চলছে— সে সব কিছুই ইন্দিরাপন্থীদের সেদিকে যাবার ইঙ্গিতকেই সুস্পষ্ট করে তুলছে।

এ প্রসংগেই স্মরণীয় মস্কোর নয়া-জার ব্রেজনেভের মুখনিঃসৃত সেই 'মহান' বাণী, যেটা সে গত ১৯৭৩ সালে দিল্লীতে এসে বলেছিলো, 'ভারতে কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্বের কোনো যুক্তিই আমি খুঁজে পাইনা।' এ বছরেরই গোড়ার দিকে বাংলাদেশে শেখ মুজিব যখন ব্রেজনভের সেই 'মহান বাণী'কেই কার্যকরী রূপ দিয়ে সমস্ত বিরোধী দলকে বেআইনী করে দিয়ে এবং একচ্ছত্র একনায়কত্ব কায়েম করে বাংলাদেশের ''দ্বিতীয় বিপ্লব'' সম্পন্ন করেছিলো, তখন মস্কোর নয়া-জার এবং ভারতের ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যেই তার সে ফ্যাসিবাদী পদসঞ্চারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলো। তখন আমাদের দেশের অনেকেই একটু অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীও শেখ মুজিবের পথ নেবেন কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা চলেছিলো। আজ মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আর বিশেষ বিতর্কের অবকাশ থাকছে না, ঘটনার গতি সুস্পষ্টভাবে সেদিকেই যাচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে ইন্দিরা গান্ধীরা বিদেশী আক্রমণের জুজু-বুড়ির ভয় দেখিয়ে এ দেশের বর্তমান ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতিকে জিইয়ে রাখতে চাইছেন। তারপর আবার ইন্দিরা-বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলির দ্রুত পুনর্বিন্যাস ও অগ্রগতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের ওপর তাদের সুস্পষ্ট প্রভাববৃদ্ধির বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানার জন্য ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যদি ''প্রতিক্রিয়শীল ফ্যাসিষ্ট চক্রান্তের'' অজুহাত তুলে দেশের সমস্ত বিরোধী শক্তিকেই ''জাতি ও গণতন্ত্রের শত্রু'' হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের ওপর পুলিশ-মিলিটারি-মাস্তান দিয়ে তীব্রতর হামলা শুরু করে, তাদেরকে এবং কংগ্রেসের মধ্যেকার মস্কো-বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজনদেরও কারারুদ্ধ করে, শেখ মুজিবের কায়দায় সমস্ত রকম বিরোধী অভিমতের কণ্ঠরুদ্ধ করে এবং এভাবে মহামতি ব্রেজনেভ-নির্দেশিত পথে শেখ মুজিব কায়দায় আমাদের দেশেও নোতুন কোনো 'বিপ্লব' সংঘটিত করে বসে— তবে সেটা খুব স্বাভাবিক ঘটনাই হবে! এবং স্বভাবতঃই তখন মস্কোর নয়া-জাররা ও তাদের ভারতীয় অনুচররা এবং বিড়লা-জৈন প্রভৃতি বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাকে ''গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ'' বলে দুহাত তুলে অভিনন্দন জানাবে—এবং এভাবে ভারত মস্কোর নয়া-জারদের ফর্মুলা অনসারে দ্রুত 'সমাজতন্ত্রের' দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করবে।

এই মুহূর্তে ভারতের আকাশে-বাতাসে সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিতই ধরা পড়ছে— আঘাত আসছে! এ আঘাত এ মুহূর্তে প্রাথমিকভাবে ভারতে ক্ষমতার অধিকার নিয়ে সোভিয়েত ও মার্কিন দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নিয়ে এলেও বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি ও বিপ্লবীরাও এ আঘাত থেকে রেহাই পাবেন না, রেহাই পাবেন না গণতান্ত্রিক মানুষেরা, দেশের কোটি কোটি মেহনতী জনতা। ফ্যাসিবাদ যে অজুহাত খাড়া করে, যে রূপ নিয়ে এবং যে স্লোগান নিয়েই আবির্ভূত হোক না কেন— হিটলারের ও শেখ মুজিবের ''এক জাতি এক দল ও এক নেতা''র স্লোগানের সঙ্গে ইন্দিরাপন্থীদের ''ভারতই ইন্দিরা, ইন্দিরাই ভারত'' শ্লোগানের মুলগত কোনো পার্থক্যই নেই— ফ্যাসিবাদী উন্মত্ততার সামনে কারও রেহাই নেই। এ আঘাত যদি আসে, তবে এ মুহূর্তে তার প্রধান লক্ষ্য মার্কিন লবীর নেতৃবৃন্দ স্বভাবতঃই অকেজো হয়ে পড়বেন। এমনকি বিভিন্ন সংসদীয় দলগুলিও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে— এবং বল্গাহীনভাবে এগিয়ে চলবে ফ্যাসিবাদের কালো ঘোড়া, তীব্রতর শোষণ ও নিপীড়নের ফাঁদে নিষ্পেষিত হবেন ভারতের কোটি কোটি জনতা। তাই, এই সুস্পষ্ট সম্ভবনাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতেই হবে, মূল শত্রুর বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে অবশ্যই ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুতে হবে, এবং নির্ভীকভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ফ্যাসিবাদী আঘাত নেমে আসছেই, নেমে আসবেই। এ আঘাত একদিকে যেমন এদেশের সর্বহারাশ্রেণী তথা বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্বলতার ফলশ্রুতি, সংসদীয় বামপন্থী দলগুলির বিপ্লবের প্রতি ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতি। ঠিক একইভাবে তা আবার শাসকশক্তিরও মৌলিক দুর্বলতার ফলশ্রুতি— গণতন্ত্রের ভাঁওতাটাকে তারা আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না, নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থেই তারা আজ এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক আবরণটাকে সশব্দে খুলে ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই এ আঘাত সুনিশ্চিতভাবেই জন্ম দেবে প্রত্যাঘাতের, এবং তারই ফলশ্রুতিতে উঠবে ঝড়, ভয়াল ভয়ংকর ঝড়। ঝড় আসছে! ইতিহাস সাক্ষী দেবে, এই ঝড়ের পটভূমিকায় কে কোন ভূমিকা গ্রহণ করছে— ইতিহাসের কাঠগড়ায় প্রত্যেককেই জবাবদিহি করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।।

**প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৫**

# 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যখন বেশ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রকাশের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে, ঠিক তখনই সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক এবং ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ একটি ঢিল ছুঁড়েছেন। তিনি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন : 'আনন্দমঠ' নিয়ে এতো হৈ-চৈ-এর কোনো যুক্তি নেই, কেননা প্রকৃত বিচারে 'আনন্দমঠ'-কে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস' হিসেবে স্বীকার করা যায় না, বিশেষত যখন এই উপন্যাসে এই দেশের বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। সরোজবাবুর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে স্বভাবতঃই বিরাট বিতর্কের ঝড় উঠেছে, অ্যাকাডেমিক মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত তাতে সামিল হয়েছে, এবং বঙ্গীয় প্রগতিশীলতা তথা সংস্কৃতির স্ব-ঘোষিত ধারক ও বাহক আনন্দবাজারগোষ্ঠী বিপুল বিক্রমে 'আনন্দমঠ'-এর পক্ষে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। পুরোনো বিশ্বাস বা ধ্যানধারণার প্রতি অন্ধ ও অচলা ভক্তি এবং ভাবাবেগের বন্যায় ভেসে না গিয়ে তাই আমাদের উচিত হবে বাস্তব তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে এই বিতর্ক প্রসঙ্গে একটি সঠিক অবস্থানে উপনীত হবার চেষ্টা করা।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৮৮০-৮১ সালে, আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। সে সময় ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিলে অগ্নিগর্ভ। তৎকালীন বড়োলাট লর্ড লিটনের কৃষি-সচিব (এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা) অ্যালাম হিউম পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, সমগ্র দেশ তখন একটা ভয়ংকর অভ্যুত্থানের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, দেশের বেশির ভাগ নিম্নবর্গের মানুষ (অর্থাৎ কৃষকেরা) প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে, এবং এই অবস্থায় তারা একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা পর্যন্ত ভাবতে শুরু করেছে [A.O. Hume : 'Life of Sir William Waderburn', P 81]। এই অগ্নিগর্ভ সামাজিক পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'আনন্দমঠ'— এবং এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখা হলো: "সমাজ-বিপ্লব সকল সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।" বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন মোটেই ছিল না সমাজ বিপ্লবের প্রতি— বরং তিনি তাঁর বিরুদ্ধ মানসিকতার পক্ষেই কথা বলেছেন।

এই মানসিকতা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস— যার পটভূমি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। বস্তুত এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিলো বাংলা ও বিহারের কৃষকদেরই বিদ্রোহ। একে ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু করে বৃটিশ অনুরক্ত ঐতিহাসিকগণ (যেমন, যামিনীমোহন ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) সাধারণভাবে বহিরাগত ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী ও দস্যুদের আক্রমণ ও উৎপাত বলে বর্ণনা করলেও, ভারতের সরকারী ইতিহাস ও 'গেজেটিয়ার' প্রণেতা উইলিয়াম হাণ্টার, এল. এম. এস ও'ম্যালি এবং পরবর্তীকালে লেস্টার হাচিনসন প্রভৃতি বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ অজস্র তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, এই বিদ্রোহীরা ছিলো মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণ, জমিহারা ও গৃহহারা বুভুক্ষু কৃষকের দল, এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী চাষবাস মারফৎ কৃষকে রূপান্তরিত সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল। তারা বিদ্রোহ করেছিলো কৃষক হিসেবে শোষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং সন্ন্যাসী ও ফকির হিসেবে তাদের ধর্মানুষ্ঠান ও প্রচলিত অধিকারের ওপর বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে তারা তুলে ধরেছিলো ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ, প্রেরণা জুগিয়েছিলো বিদেশী বৃটিশ শাসকদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য।

এটা ঘটনা যে বিহার ও বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ১৭৬৩ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ চললেও একটি কেন্দ্রীভূত ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও সংগঠন, একটি বাহিনী, একটি উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে এই বিদ্রোহ চলেনি— বস্তুত তখনকার বাস্তব পরিস্থিতিতে তা সম্ভবও ছিলো না। কিন্তু এটাও আবার বাস্তব সত্য যে, ব্যাপক গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্নভাবে এই বিদ্রোহকে সমর্থন ও সাহায্য করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। এবং বিদ্রোহীরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি লুট ও তাদের ওপর অত্যাচার যাতে না হয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রেখেছেন— সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা অত্যাচারের তো প্রশ্নই ছিলো না। এমনকি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বৃটিশ সেনাপতি টমাসের সংগে বিদ্রোহীদের যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, ১৭৭২ সালে রংপুর শহরের নিকটবর্তী শ্যামগঞ্জের ময়দানে অনুষ্ঠিত সেই যুদ্ধেও গ্রামবাসী কৃষকেরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে এবং বৃটিশদের অধীন দেশীয় সিপাইরা দেশীয় কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, এবং ফলত টমাস পরাজিত ও নিহত হয়। এসব তথ্য সে সময়কার বিভিন্ন সরকারী দলিলপত্রে থেকেই পাওয়া যায় [দ্রষ্টব্য: সুপ্রকাশ রায়—'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃষ্ঠা ২০-৫০]।

আর বঙ্কিমচন্দ্র তার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে তুলে ধরলেন কী ভাবে? 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদল বিদ্রোহ করেছিলো মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে— বৃটিশদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদর্শ ছিলো হিন্দু সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তারা মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংগে সংগে অবাধ লুটতরাজ ও অত্যাচার করেছে গরীব মুসলমানদের ওপর, তারা মুসলমানদের মসজিদ ভেঙে গড়তে চেয়েছে হিন্দু দেবতা রাধামাধবের মন্দির, সবংশে নিধন করতে চেয়েছে ভগবান-বিদ্বেষী মুসলমানদের এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, তারা মুসলিম রাজত্ব ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে বৃটিশ রাজত্ব। তাই সন্তানদলের নায়ক সত্যানন্দের গুরুর মুখ দিয়ে ক্রমাগত বর্ষিত হয়েছে বৃটিশ-অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন : (১) "ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই", (২) "ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড়ো সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব"; (৩) "ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে"; (৪) "ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে, নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে"; (৫) "ইংরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে"; (৬) "শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর-ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই" ['আনন্দমঠ' ঃ শেষ দুই পৃষ্ঠা]। কাজেই, উপন্যাসের উপক্রমণিকায় বঙ্কিম যে লিখবেন ঃ "সমাজ বিপ্লব সব সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী"—তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই, এবং নেই কোনো পরস্পর-বিরোধিতাও।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অভিযোগটি তোলা যায়, তা হচ্ছে এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করে তুলে ধরেছেন— বৃটিশ বিরোধী একটি ব্যাপক ও মহান গণ অভ্যুত্থানকে চিত্রিত করেছেন বৃটিশ-সমর্থক একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে। এ যুগের বঙ্কিম-ভক্তরা বর্তমান 'আনন্দমঠ' বিতর্কে বিভিন্নভাবে বঙ্কিমের হয়ে ওকালতি করলেও, এই অভিযোগের কোনো তথ্যপূর্ণ উত্তর তারা দিতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিতর্কের সূত্রপাত যিনি করেছেন, সেই সরোজবাবুও কিন্তু এই অভিযোগটি উত্থাপন করেননি।

অবশ্য সাম্প্রতিক বঙ্কিম-অনুরাগী পণ্ডিতগণ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, 'আনন্দমঠ'-এর প্রথম সংস্করণে নাকি সন্তানদলের ইংরেজদের বিরুদ্ধেই রণধ্বনি ছিলো, কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিম বৃটিশদের অধীনে তার চাকরি ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে কৌশলগত কারণে 'ইংরেজদের মার'— এই রণধ্বনি পাল্টে 'নেড়েদের মার' রণধ্বনিটি অন্তর্ভুক্ত করেন। তাদের প্রদত্ত এই তথ্যটি সত্যি বলে মেনে নিলেও কিন্তু বঙ্কিম তথা 'আনন্দমঠ'-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আমাদের পূর্বোক্ত অভিযোগটির উত্তর মেলে না।

কারণ, প্রথমত, ইংরেজদের ভয়ে তথা নিজের চাকরীর মায়ায় বঙ্কিম যদি এই পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন, তবে সেটা 'স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস' হিসেবে বিজ্ঞাপিত উপন্যাসের রচয়িতার জীবনাদর্শ তথা স্বাধীনতার আকাঙ্খা তথা চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে মোটেই শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনা। কাজেই, এ সম্পর্কে যতো কম বলা যায়, ততোই বঙ্কিম-অনুরাগীদের খুশি হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, বক্তব্যের বিচারেও এই পরিবর্তনে আমাদের অভিযোগের কোনো হেরফের ঘটে না। কারণ উপন্যাসটির বর্তমান রূপেও দেখা যাচ্ছে, সত্যানন্দ বা ভবানন্দেরা আংশিকভাবে হলেও— মুসলিম সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শাসকদেরও বিরোধিতা করেছে— অর্থাৎ বঙ্কিমের দৃষ্টিতে তারা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। তাই, উপন্যাসের মধ্যেই বঙ্কিমকে মন্তব্য করতে হয়েছে : "ইংরেজ যে ভারতের উদ্ধার সাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানরা তাহা বুঝে নাই"। কিন্তু, আন্দোলনের সর্বোচ্চ মতাদর্শগত নেতা (সত্যানন্দের গুরু) এসে তাদের ভুল ভাঙিয়েছে— অর্থাৎ বঙ্কিমের দৃষ্টিতে তারা যথার্থ অর্থে সচেতন হয়ে উঠেছে, এবং বঙ্কিমের মতোই বৃটিশ-বিরোধী লড়াই থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে। কাজেই প্রথমে সত্যানন্দ-ভবানন্দেরা 'ইংরেজ মার' না বলে 'নেড়েদের মার' বললেও মূল বক্তব্যের কোনো হেরফের ঘটছে না। আর তাছাড়া, শুধু 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেই তো নয়, বঙ্কিমের বিভিন্ন লেখাপত্রে তার বৃটিশ অনুরাগের অজস্র নিদর্শন ধরা পড়ে। তাই, তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছেন ঃ "ইংরেজ ভারতের পরমোপকারী" ['ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?'], "আমরা পরাধীন জাতি, অনেক কাল পরাধীন থাকিব" ['ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা']। তাই পাবনার কৃষক-বিদ্রোহের পটভূমিকায় মীর মশারাফ হোসেন রচিত 'জমিদার দর্পণ' নাটকের প্রশংসা ক'রেও কৃষক-বিদ্রোহের "জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি" না দেওয়ার জন্য এই নাটকের বিক্রি ও বিতরণ বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন [বঙ্গদর্শন ঃ ভাদ্র, ১২৮০ ]। তাই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটককে "সমাজ সংস্কারণাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না"— এই যুক্তিতে আক্রমণ করেছেন [বঙ্গদর্শন ঃ ঐ ]। তাই বৃটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে "বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হিসেবে অভিহিত করেছেন, কেননা "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা

উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা'', কেননা তিনি ''সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক'' নন, কেননা এই বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটলে বৃটিশদের আশ্রিত জমিদারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হবে— এবং তাই নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করতে পেরেছেন : ''যেদিন ইংরেজদের অমঙ্গলাকাঙ্খী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্খী হইব, সেইদিন এই পরামর্শ (এই প্রথা বিলোপের— লেখক) দিব'' ['বঙ্গদেশের কৃষক' ]।

অবশ্য সেজন্য বঙ্কিমকে আলাদাভাবে দোষ দেবারও কোনো মানে হয় না। কেননা, বঙ্কিম উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের যে তথাকথিত রেনেসাঁসের ফসল, সেই রেনেসাঁসের প্রধান-অপ্রধান সমস্ত নায়কেরাই ভারতে বৃটিশ শাসনের পক্ষে ছিলেন। তার মূল কারণ ছিল এটাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর যে জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত স্তর এই 'রেনেসাঁসের' নেতৃত্ব দিয়েছিলো, জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কৃষকদের ওপর শোষণ এবং বৃটিশদের বেনিয়াগিরি বা তাদের অধীনে চাকরীই ছিলো তাদের আর্থিক সমৃদ্ধির বনিয়াদ— যার আবার মূল ভিত্তি ছিলো ভারতে বৃটিশ শাসন। তাই ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে ভাবধারা তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো, কখনোই তাকে তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যায় নি। তাদেরই অন্যতম হিসেবে বঙ্কিমও মূলত বৃটিশবিরোধী অবস্থান কখনও গ্রহণ করেননি। তাই 'আনন্দমঠ'-এর প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণগুলির পাঠভেদের মধ্যে দিয়েও বঙ্কিমকে বৃটিশ-বিরোধী এবং স্বাধীনতা মন্ত্রের উদগাতা হিসেবে দেখানোর সমস্ত প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত হাস্যকর পরস্পর-বিরোধিতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

তৃতীয়ত, 'আনন্দমঠ'-এর 'নেড়েদের মার' বাক্যাংশের বদলে প্রথম সংস্করণে 'বৃটিশদের মার' পাঠান্তরেও বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আনীত ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগ বাতিল হয়ে যায় না। বঙ্গীয় 'রেনেসাঁস'-এর প্রথম পর্যায়ে ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রেরণার প্রাচীন শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যে জোয়ার দেখা গিয়েছিলো, বঙ্কিম খুব সচেতন ভাবেই তাকে প্রতিহত করে 'নবহিন্দুবাদ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই রক্ষণশীল ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। তাই, তার 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে হিন্দুসমাজের সেই রক্ষণশীলতা ও গোঁড়াটির মধ্যেই তিনি প্রাণপণে নোতুন প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করে গেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানধর্মের অন্যতম নেতা ভবানন্দের মুখে তারই প্রতিধ্বনি শুনি, ''এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে'' (প্রথম খণ্ড : দশম পরিচ্ছেদ); সত্যানন্দ বলেন, ''আমরা রাজ্য চাই না— কেবলমাত্র মুসলমানরা ভগবানবিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই'' (দ্বিতীয় খণ্ড : চতুর্থ পরিচ্ছেদ); তাই, সন্তানরা ''মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়, যেখানে মুসলমানদের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে'' (তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ); সন্তানদের অনুপ্রেরণায় ''গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়ে তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল'' (চতুর্থ খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ); ইংরেজ সেনার সংগে যুদ্ধ করতে করতেও মহেন্দ্র রণধ্বনি দেয় ঃ ''মুসলমানদের বুকে পিঠে চাপিয়া মার'' (চতুর্থ খণ্ড : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ); সত্যানন্দের গুরু শিক্ষা দেন, ''তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই'' (চতুর্থ খণ্ড : অষ্টম পরিচ্ছেদ)। এই সমস্ত উক্তি কি শুধুমাত্র চাকরী রক্ষার জন্য 'বৃটিশদের' বদলে 'মুসলমানদের' কথাটিকে কৌশলগত কারণে ব্যবহারের ফলশ্রুতি? না, মোটেই তা নয়, বরং এসবই হচ্ছে সন্তানধর্মের মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সুস্পষ্ট মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই প্রতিশ্রুতি। একটু খোলা মনে বিষয়টিকে বিবেচনা করলে অতিবড়ো বঙ্কিম-অনুরাগীর পক্ষেও একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না।

বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক মানসিকতা শুধু এতেই শেষ হয়নি— তার সাম্প্রদায়িকতার আরও স্পষ্টতর প্রতিফলন ধরা পড়ে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মধ্যেও। অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়কেরা দেশমাতার প্রতি বন্দনামূলক ধ্বনি হিসেবে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রটিকে গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতার আকাঙ্খার কারণেই— তার মধ্যে বঙ্কিমীয় সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কোনো চিহ্নমাত্র ছিলো না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করেই বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। অথচ বঙ্কিম 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই ধ্বনিটিকেই ব্যবহার করেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্তানদলের রণধ্বনি হিসাবে— পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। গানটির সূচনায় 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মা'-র ভাবমূর্তিটিতে বঙ্গদেশই হচ্ছে মাতৃকল্প-'মা' এখানে নৈর্ব্যক্তিক ও অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু তারপরেই ''বহুবলধারিণী : রিপুদলবারিণীং'' ও ''ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণধারিণীং'' হিসেবে উপস্থাপিত সেই ভাবমূর্তিটিতে হিন্দু ধর্মীয় দুর্গাকে মাতৃকল্প হিসেবে হাজির করা হয়েছে। এবং সবশেষে ''তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'' বলে স্পষ্টতই হিন্দুধর্মীয় পৌত্তলিকতাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। গানটির এই স্পষ্ট হিন্দুধর্মীয় সংকীর্ণ ভাবমূর্তিটি এমনকি রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিলো। তাই পরাধীন ভারতের বঙ্কিমের সমগ্র 'বন্দেমাতরম' গানটিকেই

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় সঙ্গীত করা নিয়ে একদল বাঙালী যখন এই শতকের ত্রিশের দশকে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন, তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত (যিনি নিজে ১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে এই গানে সুর দিয়ে গেয়েছিলেন) এর বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯.১০.৩৭ তারিখে সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন : ''বন্দেমাতরম গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব একথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে তর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলাদেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভূজা মূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না।... যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীনভাবে সংগত হতেই পারে না।'' এবং শেষ পর্যন্ত ২৮.১০.৩৭ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই বিতর্কে এই মর্মে একটি সমঝোতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মূল গানের শুধুমাত্র প্রথম দুটি কলি জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া যেতে পারে। গানের বাকী অংশ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিলো : তাতে ''এমন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং ধর্মবিষয়ক এমন ভাব বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যহীন। বন্দেমাতরম সঙ্গীতের কোনো কোনো অংশ সম্পর্কে মুসলমান বন্ধুগণ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন।'' এ প্রসঙ্গে ৩০.১০.৩৭ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বিবৃতিটি প্রকাশ হয়, তাতে তিনি বলেন : ''আমি অনায়াসে স্বীকার করি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি যদি উহার অন্যান্য ইতিহাসের সহিত পড়া যায় তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় যাহার ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিতে পারে।'' বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম' প্রসঙ্গে আজকের বিতর্কে সরোজ মুখার্জীর নিক্ষিপ্ত ঢিলটি নিয়ে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদের স্ব-ঘোষিত চ্যাম্পিয়ানরা হৈ-চৈ তুলেছেন, বোঝাই যাচ্ছে, তাদের সমস্ত গবেষণাই একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত— নাহলে, রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতো বিতর্কাতীত মার্কসবাদ-বিরোধীদের এইসব বক্তব্যকে তারা পাশ কাটিয়ে যেতেন না।

তাহলে সামগ্রিক বিচারে দেখা যাচ্ছে, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুবই সুপরিকল্পিতভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ-বিরোধী সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে বিস্তৃতভাবে রূপায়িত করেছেন এবং নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়েছেন। বস্তুত বিংশ শতাব্দীতে পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, কুখ্যাত ধর্ম-ভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল উদগাতা হিসেবে চিহ্নিত হলেও, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল বক্তব্য উনবিংশ শতাব্দীতে উপস্থাপিত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই।

তবুও এ প্রসঙ্গে একটা কথা থেকেই যায়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পেছনে বঙ্কিমের যে বিকৃত উপস্থাপনা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতাই কাজ করুক না কেন, একথা স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই যে, এই 'আনন্দমঠ' এবং এতে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম' বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, বিশেষতঃ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের, 'জীবন-বেদ' ও 'স্বাদেশিকতার মন্ত্র' হিসেবে কাজ করেছিলো। ১৯০৫ এবং তারপর থেকে অরবিন্দ প্রমুখ নেতারা 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদলের মডেলেই 'ভবানী মন্দির' গড়ে তোলার প্রচেষ্টা পেয়েছেন, ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জন করেছেন। এমনকি পরবর্তীকালে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময়েও এই 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি জনতার রণধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এসবই বাস্তব তথ্য— এসবকে অস্বীকার করার বা পাশ কাটিয়ে যাবার কোনো যুক্তি নেই।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েও 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কে তাদের ধারণা বা মূল্যায়নের সংগে একমত হতেই হবে— এরকমও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মহান দেশপ্রেম ও গৌরবময় আত্মদান সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের অভীষ্ট অর্জনে নিদারুণ ব্যর্থতা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসৃত পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটি সম্পর্কে নির্মমভাবে আমাদের সচেতন করে তোলে। তাদের এই মৌলিক ত্রুটির পেছনে যেসব ধ্যানধারণা ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, নিঃসন্দেহে তার অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হচ্ছে বঙ্কিমীয় হিন্দু পুনর্জাগরণের ধারণা, তাদের জাতীয়তার ধারণার ভিত্তিই ছিলো বঙ্কিমীয় হিন্দু জাতীয়তার ধারণা। এবং নিঃসন্দেহে এই হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ ভারতবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় ঐক্যের সহায়ক হয়নি। তাই অ্যাকাডেমিক গবেষককে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় যে, ''জাতীয়তা ও হিন্দুত্বকে সমার্থক করে ফেলার ফলে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ছাড়াও সুষ্ঠু রাজনৈতিক বিচারেও যে গুরুতর ক্ষতি হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। ...বাংলা তথা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস তাই যুবকদের অমিত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এত করুণ!'' [অসিত কুমার ভট্টাচার্য ঃ 'বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা', পৃঃ ৭৭-৭৮]। তাই অগ্নিযুগের সমগ্র ইতিহাসে মুসলিমদের অংশগ্রহণের প্রায় চিহ্নমাত্র নেই [বস্তুত মুসলিমদের মধ্যে বৃটিশনির্ভর

মাতব্বরেরাও হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার এই সমার্থকরণের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমদেরকে এই আন্দোলনের মূল ধারা থেকে প্রায় সম্পূর্ণতঃ বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পেরেছিলো]। তাই অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতির স্মৃতিচারণ থেকে ধরা পড়ে যে, মুসলিম গ্রামবাসীরা বহু সময়েই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংগে শত্রুতা বা বিরোধিতা করেছে। কাজেই, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাকে সমার্থক করে তোলার বঙ্কিমীয় মতাদর্শ স্বাধীনতা আন্দোলনে আপাতদৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করলেও, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে শেষ বিচারে ক্ষতিই করেছে বেশি।

তাই, 'আনন্দমঠ' পাঠ করে এবং 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাদের দেশের বিপ্লবীরা যে মহান আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তাঁদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানিয়েও তাদের ভুল পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে অন্যতম প্রধান কারণ 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম'-এর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা তথা ইতিহাস বিকৃতিকে সমর্থন করার কোনোই যুক্তি থাকতে পারে না।

কাজেই, সম্প্রতি বিনা পরিকল্পনাতেই সিপিএম নেতা সরোজ মুখার্জী এ প্রসঙ্গে যে ঢিলটি ছুঁড়েছেন, তার পেছনে অবশ্যই যুক্তি ও তথ্যগত সারবত্তা রয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এটাই যে, বঙ্কিমের অন্ধ অনুরাগীদের তো কথাই নেই, এমনকি সরোজবাবুর কমরেডরাও এই বিতর্কের পটভূমিকায় যুক্তিগত ধারাবাহিকতার পরিচয় দিতে পারেননি, এবং সেকারণেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, তথ্যমন্ত্রী প্রভাস ফাদিকার, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সরোজ মুখার্জীর সংগে পরস্পর-বিরোধী অবস্থান ধরা পড়েছে। ফলত, শেষ পর্যন্ত সরোজবাবুকেই এ প্রসঙ্গে বিতর্কের অবসান ঘটাবার জন্য তাড়াহুড়ো করে আহ্বান জানাতে হয়েছে। অথচ যে বিতর্কের সূচনা হয়েছিলো, তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে তাকে সঠিক পদ্ধতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বাংলার 'রেনেসাঁস' সম্পর্কে এবং রামমোহন-বঙ্কিম প্রভৃতি তার প্রাণপুরুষদের সম্পর্কে এদেশের বামপন্থীদের মধ্যে অসমালোচনামূলক ভাবে পুরনো বিশ্বাস ও ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে ধরার যে বস্তুবাদ-বিরোধী প্রবণতা রয়েছে, তার মূলে সম্ভবত কিছুটা কুঠারাঘাত করা যেতো। সরোজবাবু ঢিলটি ছুঁড়বার সাহস দেখালেও তাকে যুক্তিযুক্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলার পথে নিজেই আবার বাধা হয়ে দাঁড়ালেন— এটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডি।

**প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮৩**

**দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা**

# বর্গের লড়াই বনাম বর্ণের লড়াই

জাতপাত নিয়ে বিভেদ-বৈষম্য ও অত্যাচার নির্যাতনের ইতিহাস আমাদের দেশের একটি খুবই প্রাচীন 'ঐতিহ্য'— আর্য সভ্যতার সময় থেকেই এই 'ট্র্যাডিশন' চলেছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে তার প্রকাশ ঘটেছে। আজকের ভারতবর্ষে এ নিয়ে যে একটু বেশি হৈচৈ ও বিতর্ক শুরু হয়েছে, তার কারণ শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে 'নীচু' বর্ণের ও সংখ্যালঘু বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষেরা ক্রমশঃ বেশি শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে জাত-পাতগত বৈষম্য বিষয়ে তাদের চেতনা বাড়ছে। বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তারা বেশি বেশি এগিয়ে আসছেন, এবং এই পটভূমিকায় কায়েমী স্বার্থের প্রতিভুরা বিপন্ন বিস্ময়ে তাদের সনাতনী স্বার্থ ও প্রতিপত্তির দুর্গকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জীবন-মরণ পাল্টা লড়াইকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছে। আর যারা নিজেরা হয়তো এরকম 'নীচু' বর্ণের বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মানুষ নন, কিন্তু সমাজ-চেতনার আলোকে এ প্রসঙ্গে নির্যাতিতদের পক্ষ সমর্থন করছেন, সক্রিয়ভাবে তাদের পক্ষে লড়াইয়ে সামিল হতে চাইছেন, তারাও সবাই এই পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ও বিপ্লবী অবস্থানটি কী হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক তুলছেন, এবং (অন্তত এ দেশের) যথারীতি, এ বিষয়ে কোনো ঐক্যমত অবস্থান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। জাত-পাতের বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে গেলে এই পটভূমিকাটি মনে রাখা খুবই জরুরি।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে শ্রেণী-সম্পর্ক তথা শ্রেণীবিভেদ এবং বর্ণবিভেদ প্রায় সমার্থক ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের তুলনায় শ্রেণী-সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে যে অগ্রগতি ঘটেছিল, তার ফলে সেই শ্রেণী-সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্গের মানুষ কর্তৃক ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ফলকে আত্মসাৎ ক'রে নিজেদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার বাস্তব ভিত্তি তৈরী হয়েছিল, এবং সামাজিক এই বিভাজনই রূপ পেয়েছিল প্রাচীন কালের চতুবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে। এই পটভূমিকায় নীচুবর্ণের শূদ্ররা সর্বাত্মকভাবে এবং উঁচুবর্ণের অন্যতম বৈশ্যরা আংশিকভাবে ছিল নীচু বর্গের মানুষ, উঁচুবর্ণের প্রধান দুটি অংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা একই সঙ্গে আবার উঁচু বর্গের মানুষ হিসেবে তাদের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালাতো। শ্রেণীবিভেদের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বর্ণের মধ্যেও শ্রেণীবিভেদ দেখা দেয় ও তা বাড়তে থাকে, কিন্তু কখনই তা প্রধান ভূমিকা নিতে পারেনি। পরবর্তীকালে দাসসমাজ থেকে সামন্তসমাজে উত্তরণের পরেও এই বর্ণ-বিভেদ তথা বর্গ-বিভেদ মূলত অটুটই থেকে যায়, তবে এই সমাজের নতুন শ্রেণী-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপ স্বভাবতই অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। তার অন্যতম কারণ সম্ভবত ছিল এটাই যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেভাবে প্রধানত দাস বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে দাস সমাজ উন্নততর সামন্তসমাজে উত্তরিত হয়েছিল, ভারতবর্ষে দাস বিদ্রোহের ব্যাপকতা মোটেই তেমন ছিল না, এবং তার ফলে দাসযুগে ভারতীয় সভ্যতা উন্নতির যে চরম শিখরে অরোহণ করেছিল, সামন্তযুগে ভারত উন্নতির সেই শিখরে উন্নীত হতে পারেনি, বরং সমাজের অবক্ষয় প্রথম থেকে লক্ষণীয় ছিল। এবং এই পটভূমিকায় উচ্চ বর্গ তথা বর্ণের শাসন শোষণ প্রায় অব্যাহতই থাকতে পেরেছিল।

ভারতীয় সামন্তব্যবস্থা এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থার যে বিশেষ রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল, তার উৎপাদন-সম্পর্কের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী উৎপাদকদেরকে শুধু জমির এবং সামন্ত প্রভুদের বেগার খাটার কাজেই আবদ্ধ রাখেনি, উপরন্তু বংশপরম্পরায় তাদের জীবিকাও অনেকাংশে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিল। প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজে তারা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত ছিল, এবং প্রকৃত অর্থে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলেও মুষ্টিমেয় শাসকচক্র নীচুবর্গের মানুষদের দিয়ে জমিতে চাষ করাবার ব্যবস্থা করার মতো ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিল। এর সঙ্গে ছিল প্রায় অটুট জাত-পাতগত মতাদর্শ ও সংস্কার। ফলত, নীচু বর্ণের লোকদের 'জন্ম জন্মান্তরের' শোষিত শ্রেণীগত অবস্থান তো ছিলই, তাছাড়াও উদ্ভব ঘটেছিল তথাকথিত নীচু জীবিকার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অস্পৃশ্য বা হরিজনদের, বর্গ বা বর্ণ উভয় বিচারেই যাদের অবস্থান সমাজে ছিল সবচেয়ে নীচে। এবং এভাবে শোষিত মানুষদের মধ্যেও সৃষ্ট হয়েছিল প্রায় অনড় এক বিভেদের।

এই সামন্তসমাজেই নিজেদের স্বার্থে বৃটিশরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপনের পর গোঁজামিল দিয়ে পরিবর্তন এনেছিল। এদেশে পুঁজিবাদের স্বাধীন বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না, এবং সেটা তারা চায়ওনি, বরং তারা গাঁটছড়া বেঁধেছিল সামন্তব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থার শোষক সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে। ফলত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তিটারও মৌলিক পরিবর্তন তারা ঘটায়নি, এবং ফলে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের জাতপাত বিভেদের ওপরেও তেমন কোনো আঘাত তারা হানেনি। জমিকে তারা পণ্যে পরিণত করেছিল, দেশজুড়ে প্রশাসনকে বিস্তৃত ও সেজন্য শিক্ষাবিস্তার করেছিল, এবং এর ফলে এই নতুন পরিস্থিতিতে যারা বৃটিশদের সহযোগী মিত্র হিসেবে, উচ্চবর্গে আরোহণ করেছিল তারাও প্রধানত ছিল সেই উচ্চবর্গেরই লোক। এমনকি উপনিবেশিক আমলে কল-কারখানার বিকাশ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটল, গ্রামের সামন্ত-ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে তাদের আত্মিক ও বাস্তব যোগসূত্র এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, প্রাক্-পুঁজিবাদী জাত-পাত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা তারাও প্রধানত বর্জন করতে পারেনি। এমনকি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায়

যে নতুন ধরনের জীবিকা গড়ে উঠল, সেক্ষেত্রেও উঁচু ধরনের জীবিকাগুলিতে প্রাধান্য পেল সেই উচ্চবর্ণের লোকেরাই, নীচুবর্ণের লোকদের জন্য রইল নীচু পদগুলি, বাগিচা (Plantation) শ্রমের মতো সবচেয়ে শোষিত-নির্যাতিত অবস্থানগুলিই। ফলত এমনকি বিকাশমান শ্রমিকশ্রেণীও জাত-পাত বিভেদ থেকে সর্বাংশে মুক্ত হতে পারল না।

বৃটিশ শাসনে এদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটা সত্ত্বেও যে ভারতীয় সমাজের 'ঐতিহ্যগত' জাত-পাত ব্যবস্থাটির বিলোপ মূলত ঘটল না, তার কারণ তাই আমাদের খুঁজতে হবে এ ঘটনার মধ্যেই যে, আমাদের দেশে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা গাঁটছড়া বেঁধেছিল সেই প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে যাদের অস্তিত্ব ও শোষণের বনিয়াদ মতাদর্শগতভাবে অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল এই জাত-পাত ব্যবস্থার মধ্যে। একদিকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এই সামন্তশ্রেণী এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর এই শ্রেণী সমঝোতা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতেও যেহেতু মূলত অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে, এদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোতেও যেহেতু আজ পর্যন্ত মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, সেহেতু এদেশে জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তিটাও মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। অর্থাৎ, এক কথায় এদেশের মূলত সামন্ত বা আধা-সামন্ত ভূমিব্যবস্থা, এবং তারই সামাজিক ও জাত-পাতগত ভিত্তির ওপরে নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের ফলশ্রুতিতেই আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত জাত-পাত ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়ে গেছে।

অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা দরকার যে, বিশেষত স্বাধীনতা-পরবর্তী সামাজিক অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে জাত-পাত ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে আগের তুলনায় দুর্বল হয়ে গেছে। বিভিন্ন জাত-পাতের মধ্যেই যে শ্রেণী বিভেদ অনেক বেশি তীব্র, এবং ফলত জাত-পাতগত স্বাতন্ত্র্য অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে, গত তিন দশকের অসংখ্য সামাজিক ও জাত-পাতগত সমীক্ষা থেকে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও শ্রেণীভিত্তিক বিভাজন এদেশে এখনও পর্যন্ত এমন নির্দিষ্টতা অর্জন করতে পারেনি যে, জাত-পাতগত বিভাজনের মূল ভিত্তিটাকে তা অপসারণ করতে পারে। সে কারণেই, শ্রেণী বিভেদের পটভূমিকাতেই জাত-পাতগত বিভেদের বিশ্লেষণ আবশ্যিক হলেও, জাত-পাতবিরোধী লড়াইকে সবিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালিত হলে জাত-পাত ব্যবস্থার বিলুপ্তির নিশ্চয়তা তৈরী হতে পারবে না।

**দুই**

আবার অন্যদিকে শ্রেণী-সংগ্রামের পটভূমিকাটি বাদ দিয়ে জাত-পাতের বিরুদ্ধে লড়াই যে সমস্ত লড়াইকে শেষ পর্যন্ত কানাগলিতে ঠেলে দিতে বাধ্য, অতীত অভিজ্ঞতাই তার অজস্র প্রমাণ বহন করছে। বস্তুত বৃটিশ আমল থেকেই বর্ণগত তথা বর্গগত শোষণের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে অনেক আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে গড়েই উঠেছে জাত-পাতের ভিত্তিতে, নীচু বর্ণের মানুষ কর্তৃক উঁচুবর্ণের মানুষদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ ধরনের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এই উপলব্ধিতে কখনোই পৌঁছতে পারেনি যে, বর্ণগত বিভেদের ভিত্তিটাই রয়ে গেছে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, বৃটিশ আমলেও যা মোটামুটি অটুটই ছিল। এই উপলব্ধির অভাবের ফলে এ সব আন্দোলন জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তিতে, অর্থাৎ সেই প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ওপর আঘাত হানতে, এবং তার ধারক ও বাহক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বা বর্তমান ভারতীয় শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণের বর্শামুখ শেষ পর্যন্ত ও ধারাবাহিকভাবে নিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মহারাষ্ট্রের সত্যসাধক আন্দোলন, আম্বেদকারের লেবার পার্টি বা তামিলনাড়ুতে পেরিয়ারের জাস্টিস পার্টি প্রভৃতির করুণ পরিণতি এ কথারই প্রমাণ বহন করে।

অন্যদিকে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রমবিকাশমান জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বও, যাদের প্রায় সবাই-ই ছিলেন উচ্চবর্ণের লোক, কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম কর্মসূচী অনুসরণ ক'রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেই আগ্রহী থেকেছেন, এবং এজন্য জনসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে নীচু বর্গ তথা নীচু বর্ণের জনসাধারণকেও জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তারাও জমিদারী স্বার্থের বিরুদ্ধে কখনোই যাননি, বস্তুত শ্রেণীগত বিচারে তাদের যাওয়াটা সম্ভবও ছিল না, সেহেতু জাত-পাত বিভেদের মূলে আঘাত করার প্রশ্নটি প্রায় একেবারেই ওঠেনি। ফলত, অস্পৃশ্যতা বা জাত-পাত বিভেদের বিরুদ্ধে তারা সদিচ্ছামূলক অনেক বক্তৃতা দিলেও বা কর্মসূচি নিলেও, সাবেকী সমাজের জাত-পাত গত অবস্থানকে মৌলিকভাবে পরিবর্তনের কোনো কর্মসূচী জাতীয় আন্দোলন থেকে কখনোই দেওয়া হয়নি। বরং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাত-পাত ভিত্তিক প্রাচীন ভারতের মডেলটিকে তুলে ধরার পুনরুজ্জীবনবাদী ঝোঁক বারবার তারা দেখিয়েছেন। গান্ধী তো প্রকাশ্যেই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রতি তাঁর সর্বাত্মক সমর্থনের কথা অক্লান্তভাবে প্রচার করেছেন। তাই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জোয়ারে নীচু বর্ণের লোকেরা অনেকে এলেও, জাত-পাত বিভেদের মূল উৎপাটনে জাতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা ও বাস্তব সক্রিয়তার অভাব অনেক সময়েই তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এমনকি অনেক সময় নিজেদের জাত-পাতগত নিপীড়নজনিত বিক্ষোভের কারণে তারা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কাজেই, জাতীয় আন্দোলন বলতে যদি আমরা জাত-পাত-বর্ণ-বর্গ নির্বিশেষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বুঝি, ভারতের জাতীয় আন্দোলন কখনোই সেই চরিত্র প্রকৃতপক্ষে অর্জন করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী আন্দোলনের অতীত ভূমিকার কথাও আলোচনা করা দরকার। বস্তুত কমিউনিস্টরাই

প্রথম এই সঠিক সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেন যে, জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তি নিহিত রয়েছে প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে। কৃষিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার বিলুপ্তি ঘটিয়েই কেবল জাত-পাত-ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব। আজ পর্যন্ত ভারতে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের সবচেয়ে সফল মডেলটি কমিউনিস্টরা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন চল্লিশের দশকে তেলেঙ্গানায়, এবং সেখানেই কেবল তাদের এই সঠিক সিদ্ধান্তটির কার্যকরী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাছাড়া ভারতের যেসব রাজ্যে বিশেষত কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্টরা বেশি শক্তি অর্জন করতে পেরেছিলেন, সেসব রাজ্যেই জাত-পাত ব্যবস্থার ভিত্তির ওপরে সবচেয়ে বেশি আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তবুও কমিউনিস্টরা সারা দেশব্যাপী একটি নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, প্রথমত সারা ভারতের খুব সামান্য অংশেই কমিউনিস্টরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ত (এবং প্রধানত), সঠিক উপলব্ধি সত্ত্বেও, তাদের এ-সম্পর্কিত কর্মসূচীর মধ্যে কিছু মৌলিক ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, এবং এখনও আছে। কমিউনিস্টরা শ্রেণী-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গত ৫০/৬০ বছর ধরে গ্রহণ করে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যথোচিত মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াই ব্যাপকভাবে তারা চালাননি। শ্রমিকের আন্দোলন এখনও পর্যন্ত মূলত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে অর্থনীতিবাদের গণ্ডির মধ্যে— তাদের মধ্যে জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াই না চালানোর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জাত-পাতের প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হতে পারেননি। এবং তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাত-পাত-ভিত্তিক আন্দোলনের নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে নীচু বর্ণের শ্রমজীবী মানুষকে কমিউনিস্টদের প্রভাব থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের সংকীর্ণ আন্দোলনের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা। এমনকি কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টরা অনেকাংশে এ দুর্বলতা কাটাতে পারেননি। জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত রাজনৈতিক লড়াই গড়ে তুলতে অবহেলা তো করা হয়েইছে, উপরন্তু 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই স্লোগানের ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে মর্মবস্তুর বিচারে বুর্জোয়া বিপ্লবের সীমিত গণ্ডি তারা অনেকাংশেই ছাড়াতে পারেননি। এই স্লোগান কার্যকরী করতে গিয়ে সবচেয়ে নীচু বর্গ তথা বর্ণের দলিত কৃষক মজুরদের প্রতি দায়িত্ব অনেকাংশেই তারা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ সর্বাত্মক কৃষিবিপ্লবের সঠিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকরী করতে পারলে সবচেয়ে নীচু বর্গ তথা বর্ণের কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থও সিদ্ধ করা যায়। এবং এভাবে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেকার বিভিন্ন বিভেদকে উৎপাটন করা যায়। রুশ ও চীন বিপ্লব তার প্রমাণ দিয়েছে, এমনকি ভারতেও তেলেঙ্গানায় তার প্রমাণ মিলেছে। বস্তুত ভারতের কৃষক আন্দোলন এখনও পর্যন্ত প্রধানত মধ্য ও গরীব কৃষকদেরকেই সবচেয়ে বেশি সংগঠিত করতে পেরেছে— বর্ণগত বিচারে যারা জাত হিন্দু। নেতৃত্ব প্রায় কোনোখানেই নিঃস্ব কৃষক বা কৃষিমজুরদের মধ্য থেকে উঠে আসেনি— নাহলে, এটা কি ভাবতে বিস্ময় লাগে না যে, গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করার প্রায় দু'দশক পরে ১৯৪৫ সালেই প্রথম কমিউনিস্টদের পরিচালিত কিষাণসভা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

**তিন**

জাত-পাত-বিষয়ে আজকের বিতর্ক প্রসঙ্গে কিছু বলবার আগে আর আরেকটি প্রবণতার উল্লেখ করা দরকার। বিগত পঞ্চাশের দশক থেকে বিশেষত মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদদের প্রভাবে ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদরা ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রেণীর বদলে জাতের ভূমিকাকে অধিকতর প্রাধান্য দেবার একটি বিপজ্জনক, এবং স্বভাবতই মার্কসবাদ-বিরোধী, প্রবণতার জন্ম দিয়েছেন। এরা ভারতীয় সমাজকে সেই গ্রাম-সমাজের যুগ থেকেই মূলতঃ শ্রেণীবিভাজনের ওপর নয়, বরং জাত-পাত-বিভাজনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে মনে করেন। তাদের মতে, শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, বরং জাত-পাত-গত সমন্বয় বা সংগ্রামের মধ্যেই ভারতের প্রগতির পথ নিহিত রয়েছে। কাজেই, জাত-পাত-ভিত্তিক আন্দোলনগুলিকেই এরা শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বভিত্তিক আন্দোলনের বিকল্প মডেল হিসেবে সমর্থন করেন এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সমাজে বর্ণ-বিভেদ তথা জাত-পাত-বিভেদের মূলে যে রয়েছে শ্রেণী বিভেদ, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রের শ্রেণী-বিভাজনই যে বর্ণ-বিভাজনে রূপ পেয়েছিল— এই বাস্তব সত্যটিকেই তারা আসলে গুলিয়ে দিতে চান। স্বভাবতই, অতীত ও বর্তমান শাসকশ্রেণীর স্বার্থই এসব তত্ত্ব সুকৌশলে সিদ্ধ করছে। কোটি কোটি মেহনতী মানুষের শ্রেণী-চেতনা গুলিয়ে দিয়ে জাত-পাত-বিভেদের মধ্যে যদি আবদ্ধ রাখা যায়, তবে উৎপাদনের উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই শাসকশ্রেণী তাদের সঙ্গে যে উৎপাদন-সম্পর্কে আবদ্ধ, যেভাবে তারা প্রকৃত উৎপাদক মেহনতী মানুষদের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ ক'রে এক চিরস্থায়ী শোষণের জোয়ালে তাদের বেঁধে রাখে— সে সব কিছুই গুলিয়ে দেওয়া যায়, এবং শাসকশ্রেণীর স্বার্থই সুরক্ষিত হয়। ভারতীয় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কিন প্রভাবিত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিষয়ক এই চক্রান্তমূলক তত্ত্ব মূলত প্রত্যাখ্যাত হলেও, নতুন তত্ত্বের নামে সেই পুরনো বক্তব্যই ফিরে আসছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

**চার**

ভারতীয় সমাজে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শুধু জাত-পাত-গতই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে জাতিসত্তাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি যে বিভেদের বীজ দীর্ঘদিন ধরে কাজ ক'রে চলেছে, 'স্বাধীনতা' বা 'সমাজতন্ত্র' বা 'একুশ শতকের দিকে যাত্রা' প্রভৃতি যে শ্লোগানই মুখে দিক না, শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থেই এগুলোকে জিইয়ে রাখতে চায়, আজও চাইছে। শ্রমজীবী মানুষকে বিভক্ত ক'রে রাখার এই 'ঐতিহ্যগত' চক্রান্তের সামনে বিপ্লবীরা কোন

অবস্থান গ্রহণ করবেন? তারা কি অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতো, এই সব বিভেদের মূল উৎস সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও, শ্রেণী সংগ্রামের জোয়ারে এই সব বিভেদ ধুয়ে মুছে যাবে ব'লে আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন? না, জাত-পাত, বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর এবং তার মাধ্যমে এ সবের ভিত্তিতে চলতে থাকা শোষণ নির্যাতনের অবসান ঘটাবার কর্মসূচিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মৌলিক শ্রেণী সংগ্রামের গুরুত্বকে গৌণ স্থানে ঠেলে দেবেন? এটাই আজকে বিপ্লবীদের সামনে প্রধান প্রশ্ন।

প্রথম লাইনটি অনুসরণ করার ফল কী হয়েছে, অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনই তার সাক্ষ্য বহন করছে। এর পরিণতিতে দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে জাত-পাতগত বা অন্যান্য বিভেদ কিছুটা সীমিত হলেও তার অবসান ঘটেনি, অদূর ভবিষ্যতে তা ঘটার লক্ষণও পড়ছে না। আর দ্বিতীয় লাইনটিও কি তার চেয়ে কিছু ভালো ফল দেখতে পেরেছে? মূলত জাত-পাত-ভিত্তিক অতীত আন্দোলনগুলির পরিণতিও আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। সাধারণভাবে শ্রেণী সংগ্রামের পটভূমিকার কথা ব'লে বা এসব বিভেদের মূল উৎস প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে সাধারণ স্লোগান তুলে জাত-পাত বা জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুললেও তার পরিণতি মূলত অন্যরকম কিছু হবে বলে মনে করার কারণ নেই। এর ফলে সেই সব জাত-পাত বা ধর্মীয় গোষ্ঠী বা জাতিসত্তার কিছু মানুষের বাড়তি সমর্থন হয়তো মিলছে, বা মিলবেও, কিন্তু সমাজ বদলের মূল কর্মসূচীকে তারা একই সঙ্গে মেনে নেবেন বা তাকে কার্যকরী করতে এগিয়ে যাবেন, এমন প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। এই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২-তে এরকম এক সংখ্যালঘু জাতিসত্তা-ভিত্তিক মোর্চার সমর্থন নিয়ে নির্বাচন প্রার্থী জনৈক কমিউনিস্ট বিপ্লবীর নির্বাচনী প্রচারপত্রে তাই কৃষি বিপ্লবের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত করা যায় না, এটা আমরা দেখেছি। অতিসম্প্রতি উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল একটি পত্রিকায় তাই বড়ো বড়ো অক্ষরে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে' কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতার জেহাদ ছাপা হলেও, শ্রেণী সংগ্রামের উল্লেখমাত্র তাতে করা হয় না। এবং এ সব কিছুই সোচ্চার প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে : নিপীড়িত বর্ণ বা জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং কার্যত শ্রেণী-সংগ্রামকে গৌণ ভূমিকায় সরিয়ে দিয়ে এ দেশের শোষণ-ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিকে কি আদৌ বিধ্বস্ত করা যায়?

এ প্রসঙ্গে 'পিছিয়ে-পড়া' বর্ণ বা জাতিসত্তার লোকদের জন্য চাকরী-শিক্ষায়তনে আসন প্রভৃতি সংরক্ষণের প্রশ্নটিও এসে পড়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষিত-নিপীড়িত পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য এই সংরক্ষণের দাবীটি নিঃসন্দেহে একটি ন্যায়সঙ্গত দাবী। কিন্তু এদেশের শাসকশ্রেণী এবং তাদের মদৎপুষ্ট রংবেরঙের রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে এই সংরক্ষণের প্রশ্নটিকে শাঁখের করাতের মতো ব্যবহার করছে, তাতে একদিকে আইন অনুসারে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে না, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত উচ্চতর বর্ণের মানুষেরা ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সব মিলিয়ে জাত-পাতগত বিভেদের তীব্রতাই অনেক বেড়েছে— যেমনটি ঘটেছে সাম্প্রতিকালে বিহার মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে— এবং এসবের ফলে শ্রেণীগত বিভাজন সম্পর্কিত চেতনাই হয়ে পড়ছে বিভ্রান্তির শিকার। অনেক বেশি সন্তর্পণে এবং শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে শাসকশ্রেণীর এই চক্রান্তের মোকাবিলা করাটা যখন জরুরি হয়ে পড়েছে, তখন এদিকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সংরক্ষণের দাবীর পক্ষে সোচ্চার হলে, এমনকি নতুন নতুন জাত-পাত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য অধিকতর সংরক্ষণের জন্য লড়াই শুরু করলে, সেটা পরোক্ষভাবে শাসকশ্রেণীর সেই চক্রান্তকেই সিদ্ধ করছে কিনা, তা গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে।

তার মানে আবার কখনোই এই নয় যে, জাত-পাত বা জাতিসত্তাগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগত শোষণ-নির্যাতনের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব আওড়ালেই সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হবে। সেকথা আগেও বলেছি। এই সব বিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে, কিন্তু সে লড়াইকে গড়ে তুলতে হলে সামগ্রিক শ্রেণী-লাইনের পটভূমিকায় সঙ্গতিপূর্ণভাবে। প্রশ্নটি সামাজিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাত-পাত ইত্যাদির ভূমিকা অস্বীকার করার মধ্যে নিহিত নেই— নিহিত রয়েছে সামগ্রিক শ্রেণী-সংগ্রাম ভিত্তিক বৈপ্লবিক রণনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এর অবস্থান ও ভূমিকার স্বীকৃতি, উপলব্ধি এবং তার অবসানের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে। বস্তুত, অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এ প্রসঙ্গে যে বিভ্রান্তি ছিল, সেই বিভ্রান্তির উৎসে যেতে হবে, শ্রমজীবী শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে অগ্রণী অংশকে দায়িত্ব নিতে ও নেতৃত্ব দিতে হবে, যাতে একদিকে কলে-কারখানায়, মাঠে-ময়দানে, অফিস-কাছারী-স্কুল-কলেজে তথাকথিত উচ্চবর্ণের বা জাতিসত্তার বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর শ্রমজীবী মানুষেরাই সামাজিক ক্ষেত্রে জাত-পাত বা জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগত সমস্ত বিভেদ, কুসংস্কার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে এগিয়ে আসেন; এবং অন্যদিকে পিছিয়ে-পড়া জাত-পাত-জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে সংকীর্ণ জাত-পাত বা অন্যান্য গোষ্ঠীর শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গেই শুধু নয়, উপরন্তু সমস্ত জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গেই শ্রেণী-সংহতি গড়ে তুলতে পারেন। এবং এই বিভিন্নমুখী অথচ সুসমন্বিত যৌথ আক্রমণের মধ্যে দিয়েই কেবল বিকশিত হতে পারে আমাদের দেশে শ্রেণীগত এবং একই সঙ্গে বর্ণ-জাতিসত্তা-ধর্মীয় গোষ্ঠীগত সমস্ত ধরনের শোষণ-নির্যাতনের জোয়াল থেকে মানুষের মুক্তির জন্য প্রকৃত সংগ্রামী মোর্চা।

**প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৬**

দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা

# কৃষ্ণনাথ কলেজ : স্মৃতিতে মননে, চেতনায়

*রক্তে শুনি পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে ......*
*ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-বাটে বাগানে বাগানে—*
*জল দাও আমার শিকড়ে।।*

আমার প্রায় ৬২-বছরের জীবনে কৃষ্ণনাথ কলেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক প্রায় ৪৫ বছরের। চার বছর প্রাক্-ছাত্রাবস্থায়, দু-বছর ছাত্র হিসেবে, আর প্রায় উনচল্লিশ বছর শিক্ষক হিসেবে। ফলত এই কলেজ সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু লিখতে যাওয়া মানে আত্মজীবনীর একটা বড়ো অধ্যায় লিখে ফেলা। সেটা যে কার্যত অসম্ভব ব্যাপার, আশা, সেকথা সবাই স্বীকার করবেন।

আসলে কী বলব বা লিখব, সেটা ঠিক করাটাই সমস্যা। বহরমপুরের প্রতিটি, বিশেষত মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর যেমন ছোটোবেলায় গঙ্গায় স্নান করতে করতে দূর থেকে কৃষ্ণনাথ কলেজের টাওয়ারের চূড়া দেখে সেখানে পড়ার স্বপ্ন দেখে, বিদেশী ধ্রুপদী স্থাপত্য-প্রভাবিত কলেজ ভবনের স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হয়, আমি তা দেখতাম বা হতাম, এতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু তার চেয়েও আমাকে অনেক বেশি টানত কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। সে-সময় আমার দাদাও কলেজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ সক্রিয় ছিল। আমি যখন স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি (১৯৫৪), তখন থেকেই সেই সূত্রে আমার প্রথম কলেজে যাতায়াত। সে-বছরই কলেজ ও স্কুলের (আমি কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে পড়তাম) সম্মিলিত শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে, বিশেষত কলেজে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উপস্থিতি কলেজের প্রতি আমার আকর্ষণকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি নিজেও ছোটোবেলা থেকে বিতর্ক চর্চা শুরু করি। সে-সময় থেকেই ১৯৬১-তে শেষ বছর পর্যন্ত প্রতিবার ওই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমি উপস্থিত থেকেছি— অমর্ত্য সেন থেকে শুরু করে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ, বিপ্লব দাশগুপ্তদের বিতর্ক শুনে মুগ্ধ হয়েছি, বোধ হয় ১৯৫৫-তে কলেজেরই উদয়নদা (ঘোষ) আর সত্যদা (চক্রবর্তী) যখন প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন হলেন, তখন কলেজের ছাত্রদের মতোই জোরে জোরে হাততালি দিয়েছি (অবশ্য হাততালি পেয়েওছিলাম, সেটা ১৯৫৯-এ, যখন আমি আর রজত সান্যাল কলেজকে ওই প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন করেছিলাম)। ওই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিবছর শুনেছি প্রধান বিচারক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের অনুপম ব্যাখ্যা। আর কলেজ সোস্যালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরীর বক্তৃতা; দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সাবুদা) গান। কলেজেরই ছাত্র আজকের ভারতবিখ্যাত উচ্চাঙ্গ কণ্ঠশিল্পী অরুণ ভাদুড়ী, বোধ হয় '৫৬-তে— মিহিকণ্ঠে গেয়েছিলেন 'ওরে ও মাঝি', স্পষ্ট মনে আছে। আমার সংস্কৃতি-মনস্কতা গড়ে দিয়েছে এই কলেজই, এমনকি কলেজে ঢোকার আগেই।

কলেজে আইএসসি ক্লাসে প্রথম বর্ষে ভরতি হয়েছিলাম ১৯৫৭ সালে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অনেক বেশি নম্বর পাবার 'অপরাধে', কাবলিবাবুর ধমকে (কলেজ স্কুলের সফলতম অঙ্ক শিক্ষক), আর বিজ্ঞান-পড়া বন্ধুদের চাপে বিজ্ঞান পড়লেও, তিন মাসের মধ্যেই বুঝে ফেলি, ভালো লাগছে না, কোনোক্রমে প্রথম বিভাগটা পেলেই হবে, স্নাতক ক্লাসে অর্থনীতি পড়বো। ফলে ক্লাসের প্রতি টান উধাও। দিনের পর দিন ক্লাস না করে আড্ডা, টেবলটেনিস আর ক্যারাম খেলা, ডিবেট, নাটক ইত্যাদি, আর সক্রিয় ছাত্র-রাজনীতি তো বটেই, চলত অন্তহীন। কিন্তু তাই বলে ফিজিকস্-এ অমূল্য গুহের ধীর-স্থির আর জিতেন্দ্র মুখার্জির চন্মনে, কেমিস্ট্রিতে হরেন ভট্টাচার্যের ব্যাঘ্রকণ্ঠের আর ধীরেন্দ্র রায়ের প্রায় অশ্রুত কণ্ঠের, ইংরেজিতে তারপদ দাসের (আমরা বলতাম— আশুতোষ মুখার্জি!) পাঞ্জাব মেল-সুলভ আর পশুপতি গাঙ্গুলির নাটকীয়, আর বটানিতে অধ্যক্ষ সত্যরঞ্জন সেনগুপ্তের কৌতুকে ভরা ক্লাসগুলি না করে উপায় ছিল না। কেননা তখন তো কেউ প্রাইভেট-ট্যুশন নিতো না, আর এঁদের ক্লাস করলে বই-পত্তর তেমন না পড়লেও চলত। আর একজনের কথা বলবো, তিনি অঙ্কের কৃতান্তকুমার বসু। আমি পরে কলকাতায় বি.এ.-তে অঙ্ক পড়েছি, এম.এ.-তে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছি, কিন্তু ওঁর চেয়ে ভালো অঙ্কের শিক্ষক আমি কোথাও পাইনি।

কিন্তু দু-বছর পড়াশুনার তুলনায় আমার স্মৃতিতে ওই দু-বছরের কলেজের উজ্জ্বল উপস্থিতি মূলত অন্য কারণে। স্কুল জীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতির এবং লেখালেখি-বিতর্ক-নাটক-আবৃত্তি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমার যে সংযোগ ঘটেছিল, কলেজ-জীবনেই তা আরও পরিণতি পায়। কলেজের ছাত্র রাজনীতির তখন প্রধানত দু-টি কেন্দ্র। আর.এস.পি.-র প্রভাবাধীন পি.এস.ইউ., এবং সি.পি.আই (অবিভক্ত)-র প্রভাবাধীন এস.এফ.। সমগ্র জেলায় তুলনামূলকভাবে তখন বেশি শক্তিশালী ছিল আর.এস.পি., ফলে পি.এস.ইউ.-র প্রভাবও ছিল বেশি। কলেজে দু-পক্ষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও তার মধ্যে অসুস্থতার প্রকাশ ছিল কম, দু-পক্ষের নেতা বা কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কও ছিল বন্ধুত্বমূলক। বিভিন্ন উপলক্ষে কলেজে অনুষ্ঠান হত এবং সেগুলির মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ মিলত। শুধু তাই নয়, অধ্যাপকরা, বিশেষত জহর সেন, সত্যেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণতররা, এ-সব ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন, ফলে প্রত্যক্ষ শিক্ষক না

হলেও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে উঠবার অসুবিধে ছিল না। ছাত্রীরা সর্বতোভাবে, অন্তত কলেজের মধ্যে, ছাত্রদের সঙ্গ পরিহার করে চলত। তারা ক্লাসে যেত অধ্যাপকদের পিছু-পিছু, ফিরতোও সেইভাবেই। আমাদের চলতি ঠাট্টা ছিল : "রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় ক্লাসে...!"

আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করত কলেজেরই পরিচালন সমিতি, ইংরেজি ও বাংলা দু-ভাষায় বিতর্ক হত, সারা বাংলার সবচেয়ে অগ্রণী বিতার্কিকরা আসতেন, আমাদের মতো কনিষ্ঠতররা তাদের বিতর্ক শুনে প্রাণিত হতাম। সমগ্র মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ বিতর্ক শুনতে আসতেন। সবার এ-রকম উপস্থিতি ঘটত বার্ষিক (সোস্যাল) অনুষ্ঠানেও। শিক্ষামূলক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে শহরের তো বটেই, এমনকি গ্রামের স্কুলগুলি থেকে পর্যন্ত মাস্টার মশাইরা দলবদ্ধভাবে ছাত্রদের নিয়ে আসতেন। তাছাড়া বিশেষত দ্বিজেন-তরুণ-শ্যামল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত কোনো না কোনো শিল্পী আসতেন, কলেজ প্রাঙ্গণ ভরে যেত গান শুনতে আসা মানুষের ভিড়ে। তাছাড়া একদিন আসতেন কোনো সাহিত্যিকও। দেয়ালপত্রিকা বেরত অনেকগুলি। এস.এফ. বের করত 'অভিযান', পি.এস.ইউ. 'স্ফুলিঙ্গ'। আলাদাভাবে আমরা একটা দেয়াল-পত্রিকা বের করতাম 'উদয়ন' নামে (আমার পরবর্তী সম্পাদনা-জীবনের হাতখড়ি!), তার বার্ষিক অনুষ্ঠানে সমরেশ বসুকে বক্তা হিসেবে নিয়ে এসেছিলাম। নাটকও হত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগীয় নিদান চালু ছিল— ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে অভিনয় করতে পারবে না। মনে আছে, আমরা পরশুরামের একটি মজার গল্প (রাতারাতি) মঞ্চস্থ করেছিলাম, তাতে জিগীষা দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করে আমাদের ক্লাসের বীরু (শক্তিরঞ্জন সেন) খুব হাততালি পেয়েছিল। আমি হয়েছিলাম বাঁটলো। তাছাড়াও হত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলার প্রতিযোগিতা, নকল বিধানসভা বা লোকসভা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে যে কোনো ছাত্রের মেধা-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মনন ও সংস্কৃতি চর্চার ছিল অফুরন্ত সুযোগ। এবং আমার মতো অনেকেই দু-হাত (ও সমগ্র চেতনা) ভরে সে-সুযোগ নিতে কসুর করেনি।

অবশ্য অনেকেই ছিল, আমিও তাদের একজন, যারা পড়াশুনা বা অন্যান্য কাজকর্মে 'ভালো' বলে বাহবা পেলেও, তাদের অতি বড়ো শত্রুও তাদের 'শান্ত ছেলে' বলে অপবাদ দিতে পারতো না। কোনো কোনো অধ্যাপকদের ক্লাসে একটু 'বিব্রত' করার জন্য আমাদের খ্যাতি থাকলেও, তা কখনও পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার গণ্ডি অতিক্রম করত না। সদ্য কলেজে যোগ দেওয়া নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য (বাংলা) আমাদের ক্লাসে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সমুদ্র দর্শন' পড়াতে গিয়ে নর্তকীর ছন্দের সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়ের তুলনা বোঝাতে বহরমপুর গার্লস কলেজে কর্মরতা মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য তাঁর দেখা দৌড়ের উদাহরণ দিয়েছিলেন। আমি নিরীহ মুখে জানতে চেয়েছিলাম — তিনি সেদিন ট্রেন ধরতে পেরেছিলেন কিনা। গোটা ক্লাসের বাঁধভাঙা অট্টহাসির প্রকাশ দেখে নৃপেনবাবু সেদিন, যদিও হাসিমুখেই, আর পড়াননি। তার পাঁচ বছর পরে কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেবার পর টিচার্স রুমে সবার সামনে আমি কত 'ডেঞ্জারাস' বোঝাতে গিয়ে সেই কাহিনী তিনি বিবৃত করেছিলেন।

আর একটা ঘটনা বলি। ১৯ নম্বর ঘরের ঠিক পাশে বারান্দা ঘেঁষে একটা কৃষ্ণচূড়া আর একটা রাধাচূড়া গাছ ছিল। দু-টো গাছই ছিল বিশাল, তাতে যখন ফুল ফুটত, একটাতে সবুজের পটভূমিকায় লাল টকটকে, আরেকটা উজ্জ্বল হলুদ, মাথা খারাপ হয়ে যেত। হঠাৎ, আমরা তখন ২য় বর্ষের ছাত্র, সেই গাছ দু-টো কাটার উদ্যোগ শুরু হতেই আমরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলাম। আমার নেতৃত্বে অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন, কিন্তু গাছ দু-টো বাঁচানো যায়নি। গাছের শিকড় কলেজভবনের নিচে চলে গেছিল, তাই উপায় ছিল না। আমরা খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।

১৯৫৯-এ আই.এসসি. পাশ করে কলেজ ছাড়ি, পাঁচ বছর পর আবার শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই। মধ্যবর্তী সময়েও কিন্তু কলেজের সঙ্গে যোগসূত্র পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। ১৯৬০-এ কলেজের সংসদ-সম্পাদক রজত সান্যালের অনুরোধে সে-বারের সোস্যালে অংশ নেবার জন্য আমাদের স্বপ্নের জগতের দুই সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ, কলকাতা থেকে বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া এবং আবার ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পড়েছিল তখন কলকাতায় পাঠরত আমারই ওপর। সেটা ছিল সারা জীবনের স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে গেঁথে রাখার মতো ঘটনা। তাছাড়া ১৯৬০-এ আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের (অধুনা মৌলানা আজাদ কলেজ) পক্ষ থেকে।

১৯৬৩-তে এম.এ. পরীক্ষা দিলেও ফল বেরলো '৬৪ এপ্রিলে, জুলাইতেই আমি কলেজে যোগ দিলাম অর্থনীতির কনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে। আমার সময়কার মাস্টারমশাই অধিকাংশই তখনও কর্মরত, ফলে প্রায় রাতারাতিই তাঁদের সহকর্মী হয়ে গেলাম। টিচার্সরুমের উঁচু জানালার দিকের চেয়ারগুলো তাঁদের জন্য 'সংরক্ষিত' থাকত। কিন্তু ঠিক ওই সময়েই ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন অধ্যাপক কলেজে যোগ দেওয়ায় তরুণরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়লাম, টিচার্স রুমের তারুণ্যের বাঁধভাঙা হাওয়া ক্রমশ জোরদার হতে শুরু করল। কলেজে তখন চলছে 'রামরাজত্ব'— ব্যঙ্গ করে নয়, পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাতেই সবাই তখনকার অধ্যক্ষ রামচন্দ্র পালের আমলকে এই নামে চিহ্নি করেছিল। প্রবাদপ্রতিম হুইলার সাহেবের পর এত সফল, সক্রিয় ও জনপ্রিয় অধ্যক্ষ কলেজ সম্ভবত পায়নি।

তখন অন্তত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে আজকের মতো বেকার সমস্যা তীব্র ছিল না। ভালোভাবে পাশ করলে চাকরি মিলে যেত। ফলে ছাত্রদের পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল। আবার অন্য

দিকে আমার মতো যারা অধ্যাপনা করতে আসতেন, তারা অনেকেই বেশি মাইনের সরকারি কিংবা অফিস বা ব্যাঙ্কের 'লোভনীয়' চাকরি না করে কম মাইনের জীবিকায় আসতেন (আমি ট্যুশন করে এম.এ. পড়ার খরচ চালাতাম— তিনটি ট্যুশনিতে মাসে পেতাম ২৫০ টাকা, আর কলেজে ঢুকেছিলাম ২৩৫ টাকা মাইনেতে!)। ফলে ফাঁকি দেবার প্রবণতা বিরল ছিল, পঠন-পাঠনে আন্তরিকতা ছিল দু-পক্ষেরই। আমার বিষয় অর্থনীতিতে আগে খুব কম ছাত্রই অনার্স পেত। বিভাগীয় প্রধান শ্যামল সেনের দক্ষ অধিনায়কত্বে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে অর্থনীতি বিভাগের সুনাম বাড়তে থাকে, অধিকাংশ ছাত্র অনার্স পেতে শুরু করে। পরবর্তীকালে তো কলকাতার দু-একটি কলেজের পরেই সবচেয়ে এগিয়ে থাকা বিভাগ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

আর ছাত্র হিসেবে সাংস্কৃতিক যে পরিমণ্ডল পেয়েছিলাম পাঁচ বছর আগে, সেটা তখনও অব্যাহত ছিল। বস্তুত সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমি নিজেও কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলাম। কলেজে ছাত্রদের বিতর্ক, নকল বিধানসভা বা লোকসভা (মনে আছে, একবার নকল রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনের উদ্যোগও নিয়েছিলাম)— আবৃত্তি, পত্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম বেশ ক-বছর। কলেজের বাইরের সাংস্কৃতিক জীবনে আমার বা আমাদের সবিশেষ সক্রিয়তার ('*পুনশ্চ*' নামে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং তার মুখপত্র হিসেবে প্রথম '*পুনশ্চ*' ও পরে '*অনীক*' পত্রিকা, যুব উৎসব, ফিল্‌ম সোসাইটি— পরবর্তীকালে বইমেলা, সাংবাদিক সংঘ ও মানবাধিকার আন্দোলন— তাছাড়া গণ-আন্দোলনের কর্মকাণ্ড তো ছিলই) অন্যতম সহযোগী ছিল কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরাই। সব মিলিয়ে সে-সময় পরিবেশটাই ছিল এমন যে প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে উঠতে কোনোরকম অসুবিধে ছিল না নানাবিধ পাঠ্য-বহির্ভূত কার্যক্রমের মাধ্যমে।

এ-সবের ফলও অবশ্য ফলেছিল। আমি 'কট্টর বামপন্থী' এবং ছাত্রদের 'মাথা খাচ্ছি'— এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়ে সরকার বাহাদুর আইনি-বেআইনি পন্থায় আমার চাকরি খাবার সমস্ত পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু কলেজ, প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্র পাল ও পরিচালন সমিতি এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষক সংসদ ও ছাত্ররা, পাশে দাঁড়ানোয় সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। এমনকি শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক সরকারি নির্দেশকে বাতিল করে দিয়ে আমাকে অনেক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত করার সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। সে-প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। শুধু একটা কথা বলার দরকার মনে করছি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কোনো অধ্যাপককে বরখাস্ত করার এ-ধরনের অন্যায় সরকারি হুকুম বা প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা যেত কিনা, তা নিয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

আমার ৩৯ বছরের কর্মজীবনে কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রধানত তিনটি স্বতন্ত্র পর্বের আমি সাক্ষী। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত সময়কালের পরিবেশ ছিল মূলত সুস্থ, যার কিছুটা ধারণা এ-লেখার আগের অংশে মিলবে। দ্বিতীয় পর্বে, ১৯৭০-৭২ থেকে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত সময়কালে এই স্বর্গরাজ্যে তুমুল ভারসাম্যহীনতার সূচনা, পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। '৬৭-তে ড. পাল কলেজ ছেড়ে চলে যাবার পর থেকেই তার প্রকাশ ধরা পড়তে থাকে। শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধতায় চিড় ধরতে থাকে নানা কারণে। দেশে তীব্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে ভয়াবহ হতে শুরু করে বেকার সমস্যা, হতাশা, দিক্‌নির্দেশহীনতা জন্ম নিতে শুরু করে ছাত্রদের মধ্যে। চিরাচরিত সংসদীয় রাজনীতির গণ্ডি ভেঙে সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতি নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষায়তনগুলিতেও প্রভাব ফেলতে থাকে প্রচণ্ডভাবে। একদিকে তা যেমন ছাত্র-শিক্ষকদের একাংশকে গণ-রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে প্রাণিত করে, অন্যদিকে তেমনি তার মধ্যে নিহিত নৈরাজ্যবাদী বিচ্যুতি তীব্র সংশয় ও শূন্যতার জন্ম দেয়। তার সুযোগে নিয়ে এক ধরনের সুবিধেবাদ, আদর্শহীনতা ও আত্মসর্বস্বতা, এমনকি অনৈতিকতা কালো ছায়া ফেলতে থাকে। ছাত্রদের একাংশের গণ-টোকাটুকি ও পেশীশক্তির আস্ফালন প্রকট হতে থাকে। কলেজের দীর্ঘকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ রায় সেই সংকটকালেও কলেজের হাল ধরেছিলেন চরম যোগ্যতার সঙ্গে (যদিও মহামান্য সরকার বাহাদুর তবু, শিক্ষক সংসদ ও পরিচালন সমিতির ঐকান্তিক অনুরোধ সত্ত্বেও, টেক্‌নিক্যাল অজুহাতে তাঁকে স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেননি)। তিনি এ-ব্যাপারে প্রধানত নির্ভর করেছিলেন অধ্যাপকদের ওপর। অধ্যাপকরাও নিজেদের মধ্যে দল-মত ইত্যাদির পার্থক্য ভুলে কলেজ ও শিক্ষার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষক সংসদের সেই সময়ের ইতিবাচক ভূমিকার কথা গর্বের সঙ্গে আমরা মনে রাখব। ১৯৬৯-এ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি যখন গঠিত হয়েছিল, তার সম্পাদক হিসেবে আমি এবং সভাপতি আমাদের কলেজেরই বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় সেই দল-নিরপেক্ষ অবস্থান থেকেই অধ্যাপক সমিতিকে আমাদের কলেজে এবং সমগ্র জেলায় সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলাম।

এই পর্বে স্বভাবতই নানাভাবে ও নানা কারণে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ও অর্থহীন করে তোলার প্রচেষ্টাকে শিক্ষকরা যথাসাধ্য প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। পড়াশুনায় প্রকৃত আগ্রহী বা সততার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও খুব কমে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঘটনা ছিল, রাজনীতির প্রতি ব্যাপক ছাত্রের, বিশেষত নীতিনিষ্ঠ ও মেধাবী ছাত্রদের আগ্রহ কমতে থাকে। ফলত ছাত্র রাজনীতির সার্বিক মানে অধঃপতনের পালা শুরু হয়। কলেজের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্রোতেও শুরু হয় ভাটার টান।

এই পটভূমিকাতেই ১৯৭৫-এর জুনে ইন্দিরা গান্ধী সরকার অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে। সরকার বাহাদুর আমাকে

ও আমার সম্পাদিত '*অনীক*' পত্রিকাকে '*রাষ্ট্রের প্রতি ঘোরতর বিপজ্জনক*' বলে গণ্য করে একুশ মাস বিনা বিচারে আটক করে রাখেন। গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে দুঃস্বপ্নের সেই সময়কালে কলেজ বা শিক্ষক সংসদ আমার মুক্তি দাবি করার মতো সাহস দেখাতে না পারলেও, জেলে যাতে আমি ভালোভাবে থাকতে পারি বা আমার কণ্ঠনালির অসুখের (ক্যান্সার নয়) যাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য শিক্ষকরা মন্ত্রী ও জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন।

জরুরি অবস্থা উঠে গেলে আমি মুক্তি পেয়ে কলেজে যোগ দিলাম। দেশে ও রাজ্যে সরকার পরিবর্তিত হল। গণতান্ত্রিক অধিকারের কিছুটা স্বীকৃতি মিলল। কিন্তু বছর তিনের মধ্যে এই আশাপ্রদ পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগল। পুরোনো শাসকদল আবার দেশের শাসনভার দখল করল। নকশালবাড়ি আন্দোলন তার আগেই গতি হারিয়েছে। বিপুল মানুষের মনে বিরাট প্রত্যাশা জাগিয়ে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। ক্রমশ তাদের সম্পর্কেও জনসাধারণের, বিশেষত তরুণ সম্প্রদায়ের আস্থা ও প্রত্যাশা দ্রুত কমতে শুরু করল। রাজনীতি সম্পর্কে ছাত্রদের সার্বিক অনীহার প্রক্রিয়া অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠতে থাকল। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের পরবর্তী এই সময়কালকেই আমি তৃতীয় পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করছি।

এই তৃতীয় পর্বেই কলেজে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে ছাত্রদের অনীহা এক চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ১৯৫৩-তে কলেজের শতবর্ষ পূর্ণ হবার পরবর্তী প্রথম ১৭ বছরে (১৯৫৩-৭০) ছাত্র সংসদ এক কি দু-বার বাদে ছিল পি এস ইউ বা এস এফ-এর, অর্থাৎ বামপন্থীদের দখলে। দ্বিতীয় পর্বের (১৯৭০-১৯৮৪) ১৪/১৫ বছরে সংসদে বেশি বার তাদের প্রতিপত্তি থাকলেও, অ-বামপন্থী অর্থাৎ কংগ্রেস-প্রভাবাধীন ছাত্র পরিষদের শক্তি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, ৫/৬ বার তারা সংসদ দখল করে। আর তৃতীয় পর্বের (১৯৮৫-২০০২) ১৮ বছরে বামপন্থীরা সম্ভবত ৪/৫ বারের বেশি সংসদের দখল পায়নি। আর অ-বামপন্থীরা বিগত অন্তত দশ বছর ছাত্র সমর্থন বা পেশী শক্তির সাহায্যে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েম রেখেছে। অন্যদিকে শিক্ষক সংসদের মূলত অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় থাকলেও, রাজ্যের নতুন সরকারের সমর্থকদের সক্রিয়তা বেড়েছে, এমনকি বার দুয়েক অধ্যাপকদের মধ্যে বিভিন্ন পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যেতেও তারা দ্বিধা দেখাননি। অধ্যাপকদের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠায় লক্ষণীয় ঘাটতি দেখা দিয়েছে, যদিও শিক্ষক সংসদ তা বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিরল-দৃষ্ট দাবি রেখেছে। ট্যুশনি-র রমরমা বেড়েছে, ছাত্ররা ক্লাস করতে ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহের পরিচয় দিয়েছে, শিক্ষকদের একাংশও ক্লাস না করতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকদের আন্তরিকতা এবং অন্তত কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রের পরিশ্রমে (এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর নম্বর দেবার প্রবণতায়) তাদের পরীক্ষার ফল অবশ্য অধিকাংশ সময়ে ভালোই হয়েছে। তবে সাধারণ ছাত্রদের পাশের হার কমেছে।

১৯৮৪-তে কলেজে বহুদিন পরে স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন শংকরকুমার ঘোষ। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি মূলত ১৯৬৯-৭৯ কাল-পর্বের মূলত সফল অধ্যক্ষ ধীরেনবাবুর অনুসরণে শিক্ষক সংসদের পরামর্শের ভিত্তিতে কলেজ চালিয়েছেন। মধ্যবর্তী সময়ে ভরতির সময় 'বিশেষ' কোটা প্রবর্তনের এক অনৈতিক প্রবণতার সূচনা দেখা গিয়েছিল, সরকারে ক্ষমতাসীনদের সৌজন্যে। শিক্ষক সংসদ তা বন্ধ করে মেধার ভিত্তিতে নতুন যে ভরতি পদ্ধতি প্রণয়ন করে, তা তিনি চালু করেন। এখনও পর্যন্ত নানারকম চাপ সত্ত্বেও তা বজায় রয়েছে। অশিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠনে ভাঙন ধরে এবং ক্ষমতাসীনরাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ওই বছরেই কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের সঙ্গে কলেজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। নতুন সরকারি নীতি অনুসারে গঠিত পরিচালন সমিতিতে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দলীয় কোটায় সদস্য মনোনয়ন পদ্ধতি চালু হয়।

১৯৮৪ থেকে চার বছর পরিচালন সমিতিতে আমি অন্যতম শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করি। শিক্ষক সংসদের দল-মত-নির্বিশেষ ঐক্যবদ্ধতার নীতিকে আমরা শিক্ষক প্রতিনিধিরা সযত্নে কার্যকরী করলেও, উপলব্ধি করি, ক্ষমতাসীনদের মনোনীত প্রার্থীরা অনেক সময়ে কলেজ বা শিক্ষার স্বার্থের চেয়ে নিজেদের দলীয় অবস্থানকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এই প্রবণতা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়ে।

আমি অবসর নিই ২০০২-এ। কলেজে আমার শেষ দশকটি সব মিলিয়ে খুব সুখকর তো ছিলই না, বরং নানা নেতিবাচক উপাদান সব মিলিয়ে কলেজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শুধু আমার নয়, আমার অনেক সহকর্মীর কাছেই হাজার রকম দুশ্চিন্তার জন্ম দিতে শুরু করে। একদিকে বিশেষত ছাত্রদের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ক্রমশ অন্তর্হিত হতে থাকে। মেধাবী ও রুচিশীল ছাত্ররা অধিকাংশই প্রত্যক্ষ ছাত্ররাজনীতি থেকে দূরে সরে যায়, পরিণতিতে ছাত্র রাজনীতিতে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে নীতি ও মতাদর্শ-বিহীনরা, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী প্রবণতাবিশিষ্ট সৌজন্যবোধহীন সুস্থ মূল্যবোধ-বর্জিত 'পেশাদাররা'। ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পেশীশক্তির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ কার্যত কলেজে একটি দলীয় গোষ্ঠীর স্বৈরতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ভালো হোক, মন্দ হোক, আগে তবু প্রধানত কলেজের ছাত্ররাই ছাত্র সংসদের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিত, তবে প্রাক্তন ছাত্রদেরও কিছুটা ভূমিকা থাকত। এই পর্বে ক্ষমতার রাশটা চলে যায় প্রথমে প্রাক্তন ছাত্রদের এবং পরে পুরোপুরি বহিরাগতদের ক্ষেত্রে। তাদের মতের বিরোধিতা করলে বা অন্য কোনো ছাত্রগোষ্ঠী নিজস্ব কোনো উদ্যোগ দেখালে, এমনকি তা ইতিবাচক হলেও, তাদের ওপর আক্রমণ নেমে আসতে থাকে। ফলত প্রতিবাদহীন কার্যত গণতন্ত্রহীন এক

পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে থাকে। এ-ব্যাপরে কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব ছিল। অবাঞ্ছিত অ-গণতান্ত্রিক পরিবেশের ভ্রূণাবস্থায় তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা না করে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণতিতে ক্রমশ যে ফ্র্যাংকেনস্টাইন জন্ম নেয়, কর্তৃপক্ষ কার্যত তার কাছে আত্মসমর্পণ করে 'শান্তি-শৃঙ্খলা' বজায় রাখার পথ অনুসরণ করে। এই পটভূমিকায় কলেজে ছাত্রছাত্রদের সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। রুটিন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা যান্ত্রিক গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়। আর বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের বা বাইরের সুস্থ রুচির অনুষ্ঠানের যে ঐতিহ্য পঞ্চাশ-ষাটের দশকে গড়ে উঠেছিল, তার বদলে ক্রমশ চরম কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রাধান্য বিস্তার করে।

অতীতে, বিশেষত সত্তরের দশকে, কলেজে নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপের বাড়াবাড়ির সময় শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পক্ষে কলেজ পরিচালনা করা সহজ হয়ে উঠেছিল। সে-রকম ভূমিকা নেবার ব্যাপারে শিক্ষকদের একাংশের অনীহা ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। অতীতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী শিক্ষকদের একের পর এক অবসর গ্রহণ ছাড়াও শিক্ষকতার বৃত্তিকে নীতিনিষ্ঠ সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণ না করে বাণিজ্যিক ও দিনগত পাপক্ষয় হিসেবে গণ্য করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সুবিধাবাদী অবস্থান তার কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষও শিক্ষক সংসদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাবার অতীত প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল, ফলে অধ্যক্ষ ও শিক্ষক সংসদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বাড়ছিল।

তবুও, এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও, ২০০০ সালে সরকার কর্তৃক বাস্তব কারণে কলেজ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠক্রম তুলে নেবার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বাইরের রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আধিপত্যকারী ছাত্র সংসদ ও বহিরাগত ছাত্র নেতারা কলেজে যে চরম নৈরাজ্যবাদী পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল, শিক্ষক সংসদের সময়োচিত ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ প্রতিরোধে তাকে প্রতিহত করা গিয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকদের এই উজ্জ্বল ভূমিকার ধারাবাহিকতা পরবর্তীকালে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

ফলত, ১৫০ বছর পূর্তির এই মুহূর্তে কলেজ প্রকৃতই এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক ভূমিকাকে অব্যাহত রাখা এবং অধ্যক্ষ-সহ কলেজ-কর্তৃপক্ষের নীতিনিষ্ঠ ও কার্যকরী এক ঋজু অবস্থানের ভিত্তিতে এখনও যে-সব গণতান্ত্রিক উপাদান কলেজে বর্তমান আছে, সেগুলিকে সমন্বিত করা এই মুহূর্তে তাই একান্ত জরুরি। দেড়শো বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে অনেক ঝলমলে অনুষ্ঠান হবে, অনেক জ্ঞানীগুণি ব্যক্তি আসবেন, অনেক ভালো ভালো কথা বলা হবে— কিন্তু উপরোক্ত প্রাথমিক শর্তগুলি পরিপূরিত না হলে উৎসবের উজ্জ্বল আলোর নিচে গভীরতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আশংকাও থেকে যাবে।

প্রায় ৪২ বছর কলেজের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমার ব্যক্তিত্ব এবং মনন ও চেতনার বিকাশে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। স্বভাবতই তাই আমি স্বপ্ন দেখি— আরও বহু মানুষের ক্ষেত্রে কলেজ আগামী দিনেও সে ভূমিকা নেবে। সত্যিই তা নেবে কিনা, সেটা নির্ভর করবে উৎসবের আলোর নিচে চাপা পড়ে-যাওয়া ঘনায়মান অন্ধকারকে প্রকৃত অর্থে দূর করার জন্য সবারই— ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং অতি অবশ্যই অধ্যক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের— কার্যকরী ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করার ওপর।

বিষয়টি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যখন, দেখি, রহস্যজনকভাবে একের পর এক আমলাতান্ত্রিক বাধা কৃষ্ণনাথ কলেজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮২-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের নেতৃত্বে একটি কমিশন তৈরি করেছিল। সেই কমিশনের রিপোর্টে কৃষ্ণনাথ কলেজকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়েছিল এবং এক স্বায়ত্তশাসিত কলেজে পরিণত করার সুপারিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এই সুচিন্তিত মতামতকে অজ্ঞাত কারণে সামান্যতম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ২০০০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে নিজ নিজ রাজ্যে 'সুবর্ণ জয়ন্তী' কলেজের তালিকা করতে বলেছিল। ঠিক হয়েছিল, সেই কলেজগুলির উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেসরকার প্রণীত এই তালিকায় ৫০টি কলেজ স্থান পেলেও কৃষ্ণনাথ কলেজের স্থান হয়নি। যদিও প্রাচীনতার বিচারে কলেজটির অবিভক্ত বাংলার পঞ্চম কলেজ এবং মানের বিচারে রাজ্যের সামনের সারির কলেজগুলির মধ্যে এর অবস্থান। সব শেষ আঘাতটি এসেছে ১৯৯৭-এ, যখন কলেজের শিক্ষক সংসদের আপত্তি সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে এনে যথোপযুক্ত পরিকাঠামোহীন একটি 'নাবালক' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কৃষ্ণনাথ কলেজকে যান্ত্রিকভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফল দাঁড়িয়েছে এটাই যে, বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার সুবিধে পাওয়ার প্রত্যাশায় দলে দলে মেধাবী ছাত্র কৃষ্ণনাথ কলেজ ছেড়ে সাম্প্রতিককালে কলকাতা চলে যাচ্ছে— কলেজের মান নেমে যাবার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে। এই পটভূমিকাতেও কি কলেজের সঙ্গে অতীতে বা বর্তমানে যুক্ত এবং কলেজের অগ্রগতি দেখতে আগ্রহীরা যথোপযুক্ত ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসবেন না?

ভবিষ্যৎ কিন্তু জানতে চাইবে— এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁরা কে কোন্ ভূমিকা নিয়েছিলেন, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কতটা সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন? তখন তার উত্তর আমরা দিতে পারব তো?

**প্রথম প্রকাশ : Krishnath College 150 Years Commemoration Volume, 2010**

# দীপংকর চক্রবর্তীর অনীক-এ প্রকাশিত লেখা : একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

দীপংকর চক্রবর্তী অনীক পত্রিকায় লিখেছেন নানা নামে। এখানে আমরা অনীক-এ প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলির একটি তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু এর বাইরেও অনেক লেখা থেকে গেছে, বিশেষত ছোট নিবন্ধ, ঘটনাপ্রবাহ, সম্পাদকীয়গুলি তো বটেই। কারণ অনেক লেখাই ঠিক কার লেখা ছিল এখন কারোর মনে নেই। এ বিষয়টি যিনি ভালো জানতেন অর্ধশতাব্দীর সেই সম্পাদক তো আর আমাদের মধ্যে নেই!

**গল্প / অনুদিত গল্প**

পরিশেষে (ফ্র্যাঙ্ক ও'কনর অবলম্বনে), এপ্রিল ১৯৬৪
পলাতক (জন স্টেইনবেক), এপ্রিল ১৯৬৪
ভুবনবাবু বাড়ি ছাড়লেন, মার্চ ১৯৬৬
মুখোশের অন্তরালে, জানুয়ারি ১৯৬৭

**নাটক**

অদ্ভুত আঁধার এক, অক্টোবর ১৯৬৫
বিশে জুলাইয়ের বিচার, এপ্রিল-মে, ১৯৭৫

**কবিতা / অনুদিত কবিতা**

ভালোবেসে, জানুয়ারি ১৯৬৫
লোরকার কবিতা, মার্চ ১৯৬৬
দুটি পাখি : একটি সংলাপ (মাও সেতুং), আগস্ট ১৯৭৭
তুমি আমাকে (এ সি জর্ডান), সে-অ-ন ১৯৭৭
পূব দিগন্তে নতুন দিন (কুয়ো মো-জো), সে-অ-ন ১৯৭৭
আমাদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য (মাও সেতুং), সে-অ-ন ১৯৭৭
অচিনানন্দন (অনুবাদ), জানুয়ারি ১৯৮১

**প্রবন্ধ**

ইতিহাস বলছি: শেখ মুজিবকে চিনুন, মে ১৯৭১
পূর্ব বাংলা কোন্ পথে? মে ১৯৭১
চীন মার্কিন সম্পর্ক প্রসঙ্গে, জুলাই-অক্টোবর ১৯৭১
ভারতে সোভিয়েত 'সাহায্য': শোষণের হাতিয়ার, জানু ১৯৭২
শিল্পসাহিত্যের দুই ধারা : চীন ও সোভিয়েত, এপ্রিল ১৯৭২
শিল্পসাহিত্যে বিপ্লবী ধারা ও চীন, আগস্ট ১৯৭২
বাংলাদেশে কী ঘটছে? আগস্ট-সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ১৯৭২
রাষ্ট্রসংঘে চীনের ভেটো, সেপ্টে-নভেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশে কী দেখে এলাম? ডিসেম্বর ১৯৭২
রামমোহন প্রসঙ্গে, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
ভারতের কৃষি : পুঁজিবাদী, না আধা-সামন্ত? মার্চ ১৯৭৩
ভারত ও চীন : দুই অর্থনীতি দুই পথ, সেপ্টে-নভে ১৯৭৩
সুন্দরাইয়া : রুশ নয়া জারদের নয়া উকিল? ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
সুন্দরাইয়া-র বিপ্লব-চর্চা, মার্চ ১৯৭৪
মার্কসবাদ ও পার্লামেন্টারি নির্বাচন, এপ্রিল ১৯৭৪
ভারতীয় পুঁজিবাদ : স্বাধীন? জুলাই-আগস্ট ১৯৭৪
চীন এবং সিপিএম, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪
আজকের চীন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ:অর্থনৈতিক অভিব্যক্তি, জুন-জুলাই ১৯৭৪
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ:সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, জুন-জুলাই ১৯৭৪
সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশের স্বরূপ, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
সোভিয়েত 'সমাজতন্ত্র'র স্বরূপ, এপ্রিল-মে ১৯৭৫
চীনের চার চক্রী প্রসঙ্গে, ডিসেম্বর ১৯৭৭
সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে, সেপ্টে-অক্টো-নভেম্বর ১৯৭৮
সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী সংগ্রাম, সেপ্টে-অক্টো-নভেম্বর ১৯৮০
সাম্প্রতিক ভাষা-বিতর্ক প্রসঙ্গে, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
লু সুন ও আমরা, ডিসেম্বর ১৯৮১
সিপিআই(এম)-এর একাদশ কংগ্রেস, এপ্রিল ১৯৮২
সাম্প্রতিক প্রগতি সাহিত্য, মে ১৯৮২
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস, সেপ্টে-অক্টো-নভে ১৯৮২
আনন্দমঠ প্রসঙ্গে, জানুয়ারি ১৯৮৩
বাংলার রেনেসাঁস: মূল্যায়ন ও ফলশ্রুতি, এপ্রিল-মে ১৯৮৩
তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৩
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
ভণ্ডদের মার্কসপূজা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৪
আগস্ট আন্দোলন, সিপিআই ও অরুণ শৌরির তত্ত্ব, আ-সে-অ '৮৪
প্রসঙ্গ ইন্দিরা গান্ধী, ডিসেম্বর ১৯৮৪
সিপিআইএম এবং নির্বাচনের কানাগলি, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
সাম্প্রতিক সন্ত্রাস দমন আইন, মে-জুন ১৯৮৫
প্রসঙ্গ জরুরি অবস্থা, জুলাই ১৯৮৫
সমকালের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, আগস্ট ১৯৮৫
কংগ্রেস ও ভারতীয় রাজনীতি, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৫
কংগ্রেস ও গান্ধী-নেহরু-সুভাষচন্দ্র, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৫
গণতান্ত্রিক অধিকার : বামফ্রন্ট স্টাইল, নভেম্বর ১৯৮৫
প্রসঙ্গ : প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা বিল, এপ্রিল ১৯৮৬
নারী মুক্তি আন্দোলন : কয়েকটি বিপজ্জনক দিক, জুলাই ১৯৮৬
বর্গের লড়াই বনাম বর্ণের লড়াই, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৬
বর্তমান চীন ও মার্কসবাদ, মার্চ ১৯৮৭
রবীন্দ্র মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, এপ্রিল-মে ১৯৮৭
বামফ্রন্ট সরকার : সংগ্রামের হাতিয়ার? সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৭
সম্পাদক সমর সেন, ডিসেম্বর ১৯৮৭
বামফ্রন্ট ও সংস্কৃতি, জানুয়ারি ১৯৮৮
প্রসঙ্গ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৮৮
মহাবিতর্কের আলোয় গর্বাচভের 'সমাজতন্ত্র', অক্টো-নভে ১৯৮৮

চীনের ঘটনাবলী : কমিউনিজম-এর সংকট? জুন ১৯৮৯
'ঐতিহাসিক' শীর্ষ সম্মেলন, জুন ১৯৮৯
সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ ও দেং শিয়াওপিং, জুলাই ১৯৮৯
সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৯
এবারের নির্বাচন, বিরোধীপক্ষ ও সিপিএম, ডিসেম্বর ১৯৮৯
বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯০
সাম্প্রদায়িকতা, ভারতীয় সমাজ ও সাম্প্রতিক রাজনীতি, সে-অক্টো '৯০
বাংলাদেশ কোন পথে? ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
সাম্রাজ্যবাদের ইরাকযুদ্ধ ও লেনিন, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯১
সিপিআই(এম)-এর ১১২নং ধারা ও সংসদীয় পথের কানাগলি, মে '৯১
আজকের ভারত এবং জাতীয়তার সমস্যা, অক্টো-নভে ১৯৯১
সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও শ্রেণী সংগ্রাম, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯২
৪২- এর আগস্ট আন্দোলন এবং কিছু প্রশ্ন, আগস্ট ১৯৯২
সংসদীয় বামপন্থা ও নকশালবাড়ির শিক্ষা, সেপ্টে-অক্টো ১৯৯২
৪২-এর আগস্ট আন্দোলন: স্বতঃস্ফূর্ত? নভেম্বর ১৯৯২
আজকের ভারত, সাম্প্রদায়িকতা ও আমরা, ডিসেম্বর ১৯৯২
ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পটভূমিকা এবং
দেশ বিভাগ, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৩
আন্তর্জাতিক মহাবিতর্ক ও মাওচিন্তা, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৩
১৯৯৪ গণনাট্য সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী, জানুয়ারি ১৯৯৪
মানবাধিকার আন্দোলনে দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, জুন ১৯৯৪
গণসংস্কৃতি : অন্ধ্র ও পশ্চিমবঙ্গ, জুন ১৯৯৪
কৃষক সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রাম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৪
পুঁজিবাদের সংকট ও সংস্কৃতির অবক্ষয়, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
পঁচিশ বছরে বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৯৬
মানবাধিকারের রাজনীতি, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৬
বাংলাদেশের নির্বাচন রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটাবে? জুন'৯৬
'কালো'র সাদা হবার খোয়াব, জানুয়ারি ১৯৯৭
প্রসঙ্গ : দেং শিয়াওপিং, মে ১৯৯৭
সাম্প্রদায়িকতা ও উপমহাদেশের রাজনীতি, সেপ্টে-অক্টো '৯৭
জৈন কমিশনের ব্যুমেরাং, ডিসেম্বর ১৯৯৭
সাম্প্রদায়িকতা, গৈরিক ফ্যাসিবাদ ও বামপন্থা, মার্চ-এপ্রিল ২০০০
সিপিআইএম কোন পথে? মার্চ-এপ্রিল ২০০১
পশ্চিমবঙ্গের ভোট : ২০০১, মে ২০০১
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আফগানিস্তান যুদ্ধ, ডিসেম্বর ২০০১
মার্কিন অর্থনীতি ও সংকট, এপ্রিল-মে ২০০২
বিজেপি-র দেশপ্রেম ও সাভারকার, জুন ২০০২
গণতন্ত্র : বামফ্রন্ট স্টাইল, জুলাই ২০০২
এবার ইরাক? আগস্ট ২০০২
মতাদর্শগত লড়াই : সিপিএম স্টাইল, আগস্ট ২০০২
পুঁজিপতি শ্রেণী ও কঃ পার্টি : চীনের কঃ পার্টি, সেপ্টে-অক্টো '০২
ভারতের জাতীয়তাবাদ ও উল্টোরথের পালা, সেপ্টে-অক্টো ২০০৩
ভালো থাকার বৃত্তান্ত, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং প্রশ্রয়ের ধারাবাহিকতা, জুন ২০০৪
চীন কোন পথে? ফেব্রুয়ারি ২০০৫
নেপালের বিপ্লবী লড়াই এবং সিপিআই(এম), মার্চ ২০০৫
নেপালের আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি, মে-জুন ২০০৫
জাত-পাত বিভেদ ও শ্রেণী-সংগ্রাম, অক্টেবর-নভেম্বর ২০০৫
কোন পথে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন? জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৬
ডলার যখন প্রভু, জুলাই ২০০৬
প্রতিরোধের বিশ্বায়ন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬
সিঙ্গুর নিয়ে গণশুনানি, নভেম্বর ২০০৬
মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু, ডিসেম্বর ২০০৬
উন্নয়ন ও সিপিএম-এর মার্কসবাদ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৭
দিলীপদাও চলে গেলেন, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৭
'তাঁহাদের' কথা! এপ্রিল ২০০৭
মৌলবাদের বিরুদ্ধে, আগস্ট ২০০৭
খাম্মাম থেকে নন্দীগ্রাম : ফিরে দেখা, সেপ্টেম্বর ২০০৭
বামপন্থী ধারা ও পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন, অক্টো-নভে ২০০৭
১৮৫৭-র বিদ্রোহ : দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, অক্টো-নভে ২০০৭
নাগরিক সমাজ প্রসঙ্গে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রসঙ্গ : তসলিমা নাসরিন, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৮
দ্বিচারিতার আর এক নাম..., মার্চ ২০০৮
তিব্বত, চীন এবং..., এপ্রিল ২০০৮
প্রসঙ্গ : নেপাল, মে ২০০৮
পুঁজিবাদ নির্মাণ ও পশ্চিমবঙ্গ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৮
মার্কসবাদের আলোকে পুঁজিবাদের বর্তমান সংকট, জানু-ফেব্রু '০৯
নির্বাচন ও সিপিআই(এম), জুন ২০০৯
সন্ত্রাস চারিদিকে, সন্ত্রাস..., ডিসেম্বর ২০০৯
পুঁজির আগ্রাসন, ... সন্ত্রাস? ডিসেম্বর ২০০৯
বার্লিন প্রাচীর, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সমস্যা, জানু-ফেব্রু '১০
প্রসঙ্গ : ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ, জুন ২০১০
সমাজ বদল, সশস্ত্র সংগ্রাম ও আজকের ভারত, জুলাই ২০১০
স্টালিন... বিরোধী কুৎসার বিরুদ্ধে,সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০
পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন: দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, জানু-ফেব্রু ২০১১
লাদেন ও সাম্রাজ্যবাদ, মে ২০১১
বন্দীমুক্তি আন্দোলন, জুলাই ২০১১
ভারতে 'মাওবাদ', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১
মার্কিন মুলুকেও সদর দপ্তরে কামান.., নভেম্বর ২০১১
ভারতে অধিকার আন্দোলনের দিশা, নভেম্বর ২০১১
লিবিয়া : আমেরিকার আফ্রিকা, ডিসেম্বর ২০১১
প্রসঙ্গ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রসঙ্গ : সুধী প্রধান, মার্চ ২০১২
'মা-মাটি-মানুষ'-এর গণতন্ত্র, এপ্রিল ২০১২
সিপিআই(এম)-এর মতাদর্শ, মে ২০১২
ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য, জা-ফে '১৩

**ঘটনাপ্রবাহ/ বিতর্ক-গ্রন্থ / সমালোচনা ইত্যাদি**


সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার... স্টেট লটারি, জুলাই ১৯৬৯
আবার ভিয়েতনাম, জানুয়ারি ১৯৭৩
আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ডিসেম্বর ১৯৭৩
নয়া জারের ভারত সফর, জানুয়ারি ১৯৭৪
কার্জন পার্কে ২০শে জুলাই, আগস্ট ১৯৭৪
রক্তাক্ত ২০শে জুলাই, আগস্ট ১৯৭৪
অনন্তদা স্মরণে, মার্চ ১৯৭৫
'সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত' প্রসঙ্গে, ফেব্রু '৭৫
'মার্কসবাদ ও নির্বাচন', এপ্রিল-মে ১৯৭৫
লং মার্চের কাহিনি, (গ্রন্থ সমালোচনা) ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
ভারত মহাসাগরে বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের নতুন ফন্দি, জানু ১৯৭৮
ঐক্যের পথে সিপিআই-সিপিআই(এম)? মে ১৯৭৮
চীন ভিয়েতনাম বিরোধ প্রসঙ্গে সিপিএম, আগস্ট ১৯৭৮
আফগানিস্থান প্রসঙ্গে, জানুয়ারি ১৯৮০
পোল্যাণ্ডে কিসের ইঙ্গিত? ডিসেম্বর ১৯৭৮
জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন প্রসঙ্গে, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
পোল্যান্ড, রুশ হুমকি ও সিপিএম, জুলাই ১৯৮১
সাম্প্রতিক ভাষা বিতর্ক, এপ্রিল ১৯৮১
ব্রেজনেভ স্মরণে, ডিসেম্বর ১৯৮২
দুরন্ত (গ্রন্থ সমালোচনা), জুন ১৯৮২
সপ্তম নির্জোট সম্মেলন প্রসঙ্গে, মার্চ ১৯৮৩
জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন, জুন ১৯৮৩
সর্বনেশে জুয়া খেলা, ডিসেম্বর ১৯৮৩
চীন ও মার্কসবাদ, এপ্রিল ১৯৮৫
ডাঃ বিজয় বসু স্মরণে, নভেম্বর ১৯৮৬
সমকালের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, ফেব্রুয়ারি- মার্চ ১৯৮৬
জ্যোতি বসুর 'বঙ্গ'দর্শন, জানুয়ারি ১৯৮৭
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী স্মরণে, ডিসেম্বর ১৯৮৮
সমকালীন প্রেক্ষাপট, সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও পেরেস্ত্রৈকা, মে '৯০
গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার, আগস্ট ১৯৯২
সমীরের চিঠির উত্তর দেওয়া হলো না, এপ্রিল-মে ১৯৯৪
সেকুলারিজম এবং ভারতের..., জানুয়ারি ১৯৯৮
বিজেপির রাজা হওয়ার খোয়াব, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
আণবিক বোমা ও বিজেপির রাজনীতি, জুন ১৯৯৮
চলচ্চিত্রের রাজনীতি এবং আইজেনস্টাইন, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৯
প্রায়-যুদ্ধ, ভোট-যুদ্ধ, জুলাই ১৯৯৮
চীন বিপ্লবের ৫০ বছর, নভেম্বর ১৯৯৯
মৃণাল সেনের 'আমার ভুবন', ডিসেম্বর ২০০২
লেখকের জবাব, জানুয়ারি ২০০৩
স্বাধীনতা সংগ্রামে অটলবিহারী, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪
পরিবর্তনশীল বামফ্রন্ট ও আমলাশোল, জুলাই ২০০৪
মাওয়ের চীন : ফিরে দেখা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০০৫
এবার বাংলাদেশ? সেপ্টেম্বর ২০০৫
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫
আস্তে আস্তে শ্লোগান দিন, অক্টোবর- নভেম্বর ২০০৫
নেপালে রাজতন্ত্র-বিরোধী জোট, ডিসেম্বর ২০০৫
ভোট ও গণতন্ত্র, এপ্রিল ২০০৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানব-অধিকার, এপ্রিল ২০০৬
নেপাল কোন্ পথে? মে ২০০৬
পাকিস্তান আফগানিস্তানের..., আগস্ট ২০০৭
বইমেলা : ২০০৮, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৮
জাতিদাঙ্গার পথে গোর্খাল্যান্ড, জুন ২০০৮
গৈরিক রাজনীতি ফণা তুলছে, নভেম্বর ২০০৮
মনে পড়ে, মাননীয় পুলিশমন্ত্রী, মে ২০০৯
সন্ত্রাস ও আমরা, আগস্ট ২০০৯
মনি গুহ প্রয়াত, আগস্ট ২০০৯
ইউএপিএ-র প্রথম শহীদ স্বপন দাশগুপ্ত, মার্চ ২০১০
স্মরণ : হাওয়ার্ড জিন, মার্চ ২০১০
খাদানে বিপন্ন আদিবাসীরা..., মে ২০১০
বামফ্রন্ট স্টাইল, ধৃতিমান চৌধুরী, মে ২০১০
কমরেডরা শুনুন, মে ২০১০
সিদ্ধার্থবাবু কিন্তু..., নভেম্বর ২০১০
মার্কিন মুলুকেও কায়রোর ছায়া, মার্চ ২০১১
মিশর : বিপ্লবের পটভূমি, মার্চ ২০১১
সাম্রাজ্যবাদ ও লিবিয়ার গণজাগরণ, মার্চ ২০১১
সাম্রাজ্যবাদ, লিবিয়া, এপ্রিল ২০১১
মুখ্যমন্ত্রী সত্যি কথা বলেন নি, এপ্রিল ২০১১
দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্না হাজারে, মে ২০১১
মিশর বিপ্লব কোন পথে? মে ২০১১
জন্ম শতবর্ষে ফয়েজ, মে ২০১১
মানবাধিকার আন্দোলন ও সরকার, জুন ২০১১
এম এফ হুসেন এবং তসলিমা, জুন ২০১১
খোলা চিঠি : হ্যালো নিরুপমবাবু, জুন ২০১১
লিবিয়া নিয়ে মিথ্যাচার চলছেই, আগস্ট ২০১১
মিশরে বিপ্লব পিছু হটছে? আগস্ট ২০১১
দশ বছর পরে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১
'অদৃশ্য হাত'..., এপ্রিল ২০১২
শতবর্ষে বিজয় বসু, মে ২০১২
মনমোহন-আলুওয়ালিয়ারা... জুন ২০১২
সাম্রাজ্যবাদের কুমীর কান্না... জুন ২০১২
সিপিআই(এম)-এর ঝুলি থেকে, জুলাই ২০১২
অনাগত, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২
দুই দেশ দুই নির্বাচন, নভেম্বর ২০১২